আত্মজীবনী

অগ্নিপক্ষ

এ পি জে

আবদুল কালাম

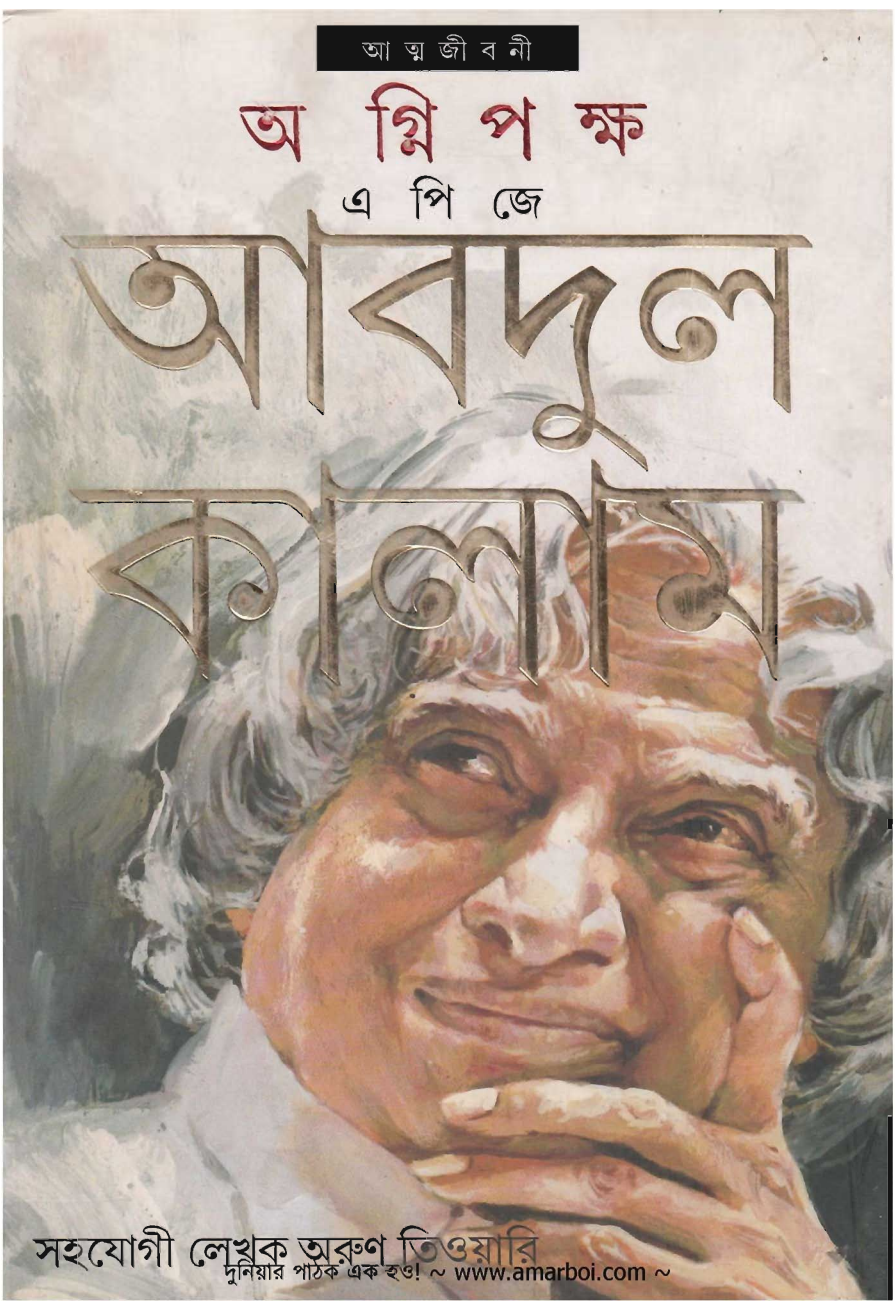

সহযোগী লেখক অরুণ তিওয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপক্ষ এমন একজন মানুষের জীবনকাহিনী, যাঁর নামের সঙ্গে আজ সারা পৃথিবী পরিচিত। এই গ্রন্থ হয়তো মানুষটির বর্ণময় জীবনের রূপরেখা মাত্র। তবু এই জীবনকথা এক তীর্থযাত্রা। সেই মানুষটির অন্তঃস্থিত 'ঐশ্বরিক অগ্নি'-র ডানা মেলে আকাশের বুকে উড়ে যাওয়ার আশ্চর্য বৃত্তান্ত। আবার এ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য ও দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নয়। যে-আধুনিক ভারত এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সামনের সারিতে স্থানলাভের জন্য সংগ্রাম করছে, তার নানা সফলতা এবং অসফলতার দলিলও এই বই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপক্ষ এমন একজন মানুষের জীবনকাহিনী, যাঁর নামের সঙ্গে আজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতের জনসাধারণ এবং পৃথিবীর তাবৎ নাগরিক পরিচিত। এই মানুষটির প্রাণশক্তি প্রচণ্ড, চিন্তার জগৎ বহুব্যাপ্ত। সব সময়েই যে তাঁর সব কথা সহজেই বোঝা যায় তা নয়, কিন্তু তাঁর কথা প্রতিনিয়ত সতেজ ও সজীব। প্রতি মুহূর্তে নবীন, উদ্দীপ্ত। আবার তা বিচিত্র, বহুবর্ণে বর্ণময়। ভারতবাসীর প্রতি এই মানুষটির ভালবাসা অপরিসীম। যাঁরা সবচেয়ে নীচের তলার মানুষ, সবচেয়ে সরলপ্রাণ, তাঁদের প্রতি এক স্বাভাবিক সাযুজ্য বোধ করেন তিনি। কেননা নিজেকে তিনি তাঁদেরই একজন মনে করেন। তবু নিজের জীবনকথা আপামর মানুষের কাছে বলবেন কিনা এ নিয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা, একটি ছোট্ট শহরের এক বালকের দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিঘ্ন, উত্তরণ, সাফল্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে মানুষ আগ্রহী হবে কেন? বিদ্যালয়-জীবনের দিনগুলিতে তীব্র আর্থিক অনটন, কলেজ-জীবনে অর্থাভাবে সেই মানুষটির নিরামিশাষীর জীবন বেছে নেওয়ার ইতিহাস জেনে মানুষের কী লাভ?

দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে অস্থির হয়েও সেই মানুষটির মনে হয়েছিল, কোনও ব্যক্তির জীবন এবং যে-সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে সে-জীবন বিধৃত—এই দুইকে আলাদা করে দেখা যায় না। এই সত্যটি উপলব্ধি করার পর তাঁর মনে হল, বাবার ইচ্ছানুযায়ী কালেকটর না হয়ে, বিমানবাহিনীর বিমানচালক না হয়ে, কী করে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র যন্ত্রবিদ্ হলেন, সেই জীবনের ইতিহাস মানুষকে হয়তো বলা যায়। বলা যায় তাঁদের কথাও, যাঁদের গভীর প্রভাবে ও প্রেরণায় গড়ে উঠেছে তাঁর জীবন, সফল হয়েছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা স্বপ্ন।

এই প্রত্যয়ে স্থিত হয়ে তিনি তাঁর জীবনের এক একটি পৃষ্ঠা মানুষের সামনে মেলে ধরলেন। হয়তো এই গ্রন্থ মানুষটির বর্ণময় জীবনের রূপরেখা মাত্র। তবু এই জীবনকথা এক তীর্থযাত্রা। তাঁর অন্তঃস্থিত 'ঐশ্বরিক অগ্নি'-র ডানা মেলে আকাশের বুকে উড়ে যাওয়ার আশ্চর্য বৃত্তান্ত। আবার এ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য ও দুঃখদুর্দশার কাহিনী নয়। যে-আধুনিক ভারত এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সামনের সারিতে স্থানলাভের জন্য সংগ্রাম করছে, তার নানা সফলতা এবং অসফলতার দলিলও এই বই।

.....
ISBN 81-7756-323-8
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবুল পাকির জইনুলআবেদিন আবদুল কালামের জন্ম ১৯৩১ সালে, তৎকালীন মাদ্রাজের (বর্তমানে তামিলনাড়ু) দ্বীপশহর রামেশ্বরমে, এক মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে। পিতা জইনুলআবেদিন, মা আশিয়াম্মা। প্রথাগত শিক্ষান্তে, ড. কালাম ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও প্রতিরক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী ও ক্ষেপণাস্ত্র যন্ত্রবিদ্ রূপে তাঁর খ্যাতি অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হয়।
অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশ, ত্রিশূল, নাগা ইত্যাদি ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে তাঁর অবদান ও কৃতিত্ব অপরিসীম। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'ভারতরত্ন'। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চায় তাঁর ভূমিকা বহুক্ষেত্রেই পথিকৃতের।

সহলেখক অরুণ তেওয়ারি একযুগের বেশি সময় ড. এ পি জে আবদুল কালামের অধীনে হায়দরাবাদের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরিতে (ডি আর ডি এল) কাজ করেছেন। শ্রীতিওয়ারি হায়দরাবাদের কার্ডিওভ্যাসকুলার টেকনোলজি ইন্সটিটিউটের অধিকর্তা।

.....

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিপক্ষ

আত্মজীবনী

এ পি জে আবদুল কালাম

সহযোগী লেখক : অরুণ তিওয়ারি

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত Wings of Fire, An Autobiography,
APJ Abdul Kalam with Arun Tiwari গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।
Universities Press (India) Private Limited-এর সঙ্গে ব্যবস্থানুক্রমে প্রকাশিত।
© Universities Press (India) Private Limited 1999

অনুবাদ: ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৩
পঞ্চম মুদ্রণ মে ২০১০

© বাংলা অনুবাদ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7756-323-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা-মা-র স্মৃতিতে

আমার মা

সমুদ্রের ঢেউ, সোনালি বালুকা, তীর্থযাত্রীর বিশ্বাস,
রামেশ্বরম মসজিদের রাস্তা, সব একাকার,
আমার মা!
তুমি আমার কাছে এসেছিলে স্বর্গের দুটি আদরের হাতের মতো।
যুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে
যখন জীবন ছিল কষ্টের, পরীক্ষার—
সূর্যোদয়ের আগে হেঁটে যেতে হত মাইলের পর মাইল
মন্দিরের কাছে আমার সাধু প্রকৃতির গুরুর কাছে পাঠ নেবার জন্যে।
বালির পাহাড় পার হয়ে রেলওয়ে স্টেশন রোডের পথে
মন্দির শহরের অধিবাসীদের জন্য সংবাদপত্র সংগ্রহ এবং বিলোতে বিলোতে
মাইল পথ পেরিয়ে আরবি শেখার স্কুলে পৌঁছনো,
সূর্যোদয়ের কয়েক ঘণ্টা পরে।
সন্ধ্যাবেলায় কাজ, তারপর রাত্রে পড়া।
ছোট ছেলেটির বড় কষ্ট
মা, সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদের জন্য
পাঁচবার নতজানু হয়ে মাথা নত করে
সন্তানেরা শক্তি সঞ্চয় করত
তোমার পুণ্যের শক্তি থেকে।
তোমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাদের সবচেয়ে প্রয়োজন তাদের দিতে।
ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেই তুমি দিতে।
মনে পড়ে দশ বছর বয়সে তোমার কোলে শুয়ে আছি
দাদা-দিদিরা হিংসে করছে
সেদিন পূর্ণিমা, আমি কেবল জানতাম তোমাকে মা, মা আমার।
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি চোখের জলে হাঁটু ভিজে গেছে
মা, তুমি জানতে তোমার সন্তানের ব্যথা।
তোমার দুটি হাতের যত্ন আমার ব্যথা মুছে দিত ধীরে ধীরে
তোমার ভালবাসা তোমার যত্ন এবং বিশ্বাস আমাকে শক্তি দিত
সে সর্বশক্তিমানের শক্তিতে নির্ভয়ে জগতের মুখোমুখি হতে।
শেষ কেয়ামতের দিন আবার আমাদের দেখা হবে, আমার মা!

এ পি জে আবদুল কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

মুখবন্ধ		৯
ঋণ স্বীকার		১১
ভূমিকা		১৩
প্রারম্ভ		১৭
সৃজন	...	৫১
স্বস্ত্যয়ন	...	১২৭
মনন	...	১৭৯
উপসংহার	...	২০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

আমি এক দশকের বেশি ড. এ. পি. জে. আবদুল কালামের অধীনে কাজ করেছি। মনে হতে পারে, সেই কারণেই তাঁর জীবনীকার হওয়ার উপযুক্ত লোক আমি নই। আর সে রকম কোনও উদ্দেশ্যও আমার কখনওই ছিল না। একদিন ওঁর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তরুণ ভারতীয়দের উদ্দেশে বলবার কথা কিছু কি তাঁর আছে? তিনি যে কথা বললেন, শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। পরে আমি সাহস করে একদিন তাঁকে তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলাম, যাতে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবার আগেই সে-সব কথা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পারি।

অনেক দিন ধরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত, এবং কখনও বা ভোর রাত্রি থেকে আমরা এক সঙ্গে বসেছি, ড. কালামের দৈনিক আঠারো ঘণ্টা কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তার জন্যে সময় চুরি করতে হয়েছে। তাঁর চিন্তা-ভাবনার গভীরতা ও ব্যাপ্তি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তাঁর প্রাণশক্তি প্রচণ্ড, চিন্তার জগৎ থেকে তিনি বিপুল আনন্দ আহরণ করেন। সব সময়েই যে তাঁর সব কথা সহজেই বোঝা যায়, তা নয়, কিন্তু তাঁর চিন্তা সব সময়েই সতেজ, নবীন, সব সময়েই মনে সজীবতার সঞ্চার করে। তাঁর কাহিনীতে অনেক জটিলতা, বিচিত্র উপাদানের মিশ্রণ, অনেক সূক্ষ্মতা, অনেক উপমা, অনেক উপকাহিনী। কিন্তু ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে দেখতে পাই একটি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত মন, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে এক ধারাবাহিক ইতিহাস।

প্রথম যখন এই বই লিখতে বসি, আমার মনে হয়েছিল, এ কাজের জন্যে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ে অধিক শক্তিমান কোনও লেখক প্রয়োজন, কিন্তু আমি এও উপলব্ধি করলাম যে, এ কাজ করা অত্যন্ত জরুরি এবং এ কাজ যে আমাকে করতে দেওয়া হল, সেটা আমার পক্ষে এক অনন্য সম্মান। আমার আকুল প্রার্থনা, সে-শক্তি, সে-সাহস যেন আমি পাই।

এ বই ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের জন্যে। তাঁদের জন্যে ড. কালামের মনে বিপুল ভালবাসা। তিনিও যে তাদেরই একজন। যারা সবচেয়ে নীচের তলার মানুষ, সবচেয়ে সরলপ্রাণ, তাদের প্রতি এক স্বাভাবিক সাযুজ্য তিনি বোধ করেন। এ তাঁর নিজের সরলতা ও সহজাত আধ্যাত্মিকতার পরিচয়।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, এই লেখা আমার কাছে ছিল যেন এক তীর্থযাত্রা। ড. কালামের সাহচর্যের ফলে আমার এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে যে, আমি উপলব্ধি করেছি জীবনের প্রকৃত আনন্দ একটিমাত্র উপায়েই লাভ করা যায়, নিজের মধ্যে যে খনি আছে লুকোনো জ্ঞানের, তার খোঁজ পেতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সেই খনি আছে, তাকে নিজেকেই তার সন্ধান করতে হবে। আপনাদের অনেকেরই হয়তো ড. কালামের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় কোনও দিন হবে না, কিন্তু আমার এই বইয়ের মধ্যে দিয়ে আপনারা তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করবেন। আপনাদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে।

যত ঘটনা ড. কালাম আমাকে বলেছেন তার কয়েকটি মাত্রকে এই বইয়ে আমি স্থান দিতে পেরেছি। প্রকৃতপক্ষে এ-বই ড. কালামের জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এমনও হতেই পারে যে, তাঁর জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অনবধানবশত বাদ পড়েছে, যে-সব প্রকল্পে ড. কালাম সমন্বয় সাধনের কাজ করেছেন তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কারও কারও অবদান হয়তো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ড. কালামের এবং আমার কর্মজীবনের মধ্যে ব্যবধান সিকি শতাব্দীর, সেই কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো বাদ পড়ে থাকতে পারে, কিংবা ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করাও হয়ে থাকতে পারে, এ-সব ত্রুটির জন্যে আমি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়, এবং এ সব ঘটেছে সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছাক্রমে।

অরুণ তিওয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণ স্বীকার

এই বই রচনায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বিশেষত শ্রী ওয়াই. এস. রাজন, শ্রী এ. শিবথানু পিল্লাই, শ্রী আর. এন. আগরওয়াল, শ্রী প্রহ্লাদ, শ্রী কে. ভি. এস. এস. প্রসাদ রাও এবং ড. এম. কে. সালওয়ানের প্রতি, যাঁরা অকাতরে তাঁদের সময় এবং তাঁদের জ্ঞান আমাকে দান করেছেন।

অধ্যাপক কে. এ. ভি. পাণ্ডালাই এবং শ্রী আর. স্বামীনাথনের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ বইটির সম্পর্কে তাঁদের মতামত আমাকে জানানোর জন্যে। এই প্রসঙ্গে ড. বি. সোমা রাজুকে আমি ধন্যবাদ জানাই তাঁর নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে কার্যকর সাহায্যের জন্য। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার স্ত্রী ড. অঞ্জুষা তিওয়ারিকে তাঁর প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্যে যদিও তিনি আমার সমালোচনায় কখনও ছেড়ে কথা বলেননি।

ইউনিভার্সিটিস প্রেস-এর সঙ্গে কাজ করা আনন্দদায়ক হয়েছে। তাদের সম্পাদকীয় এবং উৎপাদন-কর্মীদের সহযোগিতা খুবই প্রশংসাযোগ্য।

অনেক চমৎকার মানুষ ছিলেন যাঁরা আমাকে এবং এই বইকে সমৃদ্ধ করেছেন অপরিমেয় ভাবে, যেমন ফটোগ্রাফার শ্রী প্রভু, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দুই পুত্র অসীম এবং অমোলকে। এই গ্রন্থ রচনার সময়ে তারা মনের দিক থেকে আমাকে অবিরত সহায়তা যুগিয়ে গেছে। তা ছাড়াও তাদের কাছ থেকে জীবন সম্পর্কে সেই রকম মনোভাব প্রত্যাশা করি ড. কালাম যা ভালবাসতেন, যার প্রশংসা করতেন, এবং এই বইয়ে যার অভিব্যক্তি চেয়েছেন।

অরুণ তিওয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

এই বই এমন একটা সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে, যখন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের নানা প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য তার নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে তার নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা, তাকে নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই প্রশ্ন তুলতে আরম্ভ করেছেন। মানুষ যে চিরকাল নানা বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করেছে, সে-কথা ইতিহাসই বলে। প্রাগৈতিহাসিক কালে লড়াই হত খাদ্য এবং বাসস্থান নিয়ে। কালক্রমে যুদ্ধ হতে লাগল ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত ধ্যান-ধারণা নিয়ে, আর এখন উন্নত ধরনের আধুনিক যুদ্ধের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য। তার ফলে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত আধিপত্য আর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে কয়েকটি দেশ বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে প্রযুক্তিতে অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, তারাই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হস্তগত করেছে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে। তারাই এখন নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার স্ব-ঘোষিত মোড়ল। এ-রকম অবস্থায় ভারতের মতো একটি ১০০ কোটি মানুষের দেশ কী করবে? প্রযুক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই। কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত কী নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে? আমি জোর দিয়ে বলি, হ্যাঁ, পারবে। আমার নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমি আমার ওই উত্তর যে সঠিক তা প্রমাণ করব।

আমার যে-সব স্মৃতি এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম যখন তা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করি, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমার কোন কোন স্মৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনাযোগ্য, প্রাসঙ্গিক। আমার শৈশব আমার চোখে অতি মূল্যবান, কিন্তু অন্য কারও কি তাতে কোনও আগ্রহ থাকতে পারে? একটি ছোট্ট শহরের এক বালকের দুঃখকষ্ট, বাধা-বিঘ্ন, উত্তরণ, এ-সব জানার জন্যে সময় ব্যয় করা কি যুক্তিযুক্ত মনে হবে? বিদ্যালয়-জীবনের দিনগুলিতে আমার আর্থিক অনটন, ইস্কুলের বেতন দেওয়ার জন্যে আমাকে ছোটখাটো যে-সব কাজ করতে হয়েছে, এবং আমাকে যে নিরামিশাষী হতে হয়েছে কলেজ জীবনে খানিকটা আর্থিক অভাবের কারণেই, সে-সব জানতে অন্য মানুষের আগ্রহ হবে কেন? শেষ পর্যন্ত আমার মনে হল, এ-সবই প্রাসঙ্গিক। অন্য কিছুর জন্যে না হলেও, শুধু এই কারণে যে, আধুনিক ভারতের কথা আমরা এ-সব থেকেই জানতে পারি, কারণ ব্যক্তির জীবন এবং যে সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে সে-জীবন বিধৃত, এই দুইকে আলাদা করে দেখা যায় না। এই সত্যটি যখন আমি উপলব্ধি করলাম, তখন আমার মনে হল, কী করে আমার বাবার ইচ্ছানুযায়ী কালেকটর না হয়ে, বিমানবাহিনীর বিমানচালক হবার প্রচেষ্টা আমার ব্যর্থ হল, এবং আমি হলাম ক্ষেপণাস্ত্র-যন্ত্রবিদ্ (rocket engineer), সে কাহিনী এই বইয়ে বর্ণনা করা আবশ্যক।

শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম, আমার জীবনের ওপর যাঁদের প্রভাব গভীর, তাঁদের কথা বলব। এই বই আমার বাবা-মা-র প্রতি, নিকট আত্মীয়দের প্রতি, শিক্ষক এবং গুরু হিসাবে ছাত্র জীবনে এবং কর্মজীবনে যাঁদের পাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনও বটে। এবং আমার যে-সব তরুণ সহকর্মী আমাদের সকলের স্বপ্ন সাকার করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের অক্লান্ত আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার প্রতিও এই বই একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য। নিউটনের সেই বিখ্যাত উক্তি, যাতে তিনি অতিকায় দৈত্যদের কাঁধের ওপর দাঁড়াবার কথা বলেছেন, প্রত্যেক বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেই সে-কথাটি প্রযোজ্য, এবং আমার জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার জন্যে আমি বহুলাংশে ঋণী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এক অতি বিশিষ্ট পরম্পরার কাছে, যাঁদের মধ্যে নাম করা যায় বিক্রম সারাভাই, সতীশ ধাওয়ান এবং ব্রহ্মপ্রকাশের। এঁরা প্রত্যেকেই আমার জীবনে এবং অবশ্যই ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন।

১৫ অক্টোবর ১৯৯১ আমি ষাট বছর বয়স পূর্ণ করি। আমি ভেবেছিলাম আমার অবসর-জীবন নিয়োজিত করব সমাজ-সেবায় আমার যা কর্তব্য বলে মনে করি সেই কাজে। তার বদলে দুটি ঘটনা ঘটল একই সঙ্গে। প্রথম, আরও তিন বছর সরকারি চাকরি করতে আমি সম্মত হলাম, এবং দ্বিতীয়, এক তরুণ সহকর্মী অরুণ তিওয়ারি অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে বসে আমার স্মৃতিচারণ করতে, যাতে তিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-সব কথা লিখে রাখতে পারেন। ১৯৮২ থেকে তিনি আমার গবেষণাগারে কাজ করেছেন, কিন্তু আমি প্রথম তাঁকে ভালভাবে চিনলাম ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারিতে, হায়দ্রাবাদের নিজামস ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট-এ যখন তাঁকে দেখতে যাই। তখন তাঁর বয়স মোটে ৩২ বছর, কিন্তু প্রবল বিক্রমে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। তাঁকে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি? তিনি বললেন, "আমাকে আশীর্বাদ করুন স্যার, যেন আমি আরও কিছু দিন বাঁচি, অন্তত আপনার একটা প্রজেক্ট যেন সম্পূর্ণ করতে পারি।"

যুবকের আত্মনিবেদন আমার অন্তর স্পর্শ করল, তাঁর আরোগ্যর জন্য আমি সারারাত প্রার্থনা করলাম। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন, এক মাসের মধ্যে তিওয়ারি তাঁর কাজে ফিরে গেলেন। "আকাশ" ক্ষেপণাস্ত্রের কাঠামোর (airframe) কাজ যে শূন্য থেকে শুরু করে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হল, তাতে তিনি চমৎকার কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি আমার কাহিনী লিপিবদ্ধ করার কাজ হাতে নিলেন। বিগত এক বছর ধরে তিনি ধৈর্য সহকারে টুকরো-টুকরো স্মৃতিকথা লিখে নিয়েছেন, সেগুলোকে এক স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত কাহিনীর রূপ দিয়েছেন। তিনি যত্ন সহকারে আমার নিজের গ্রন্থাগারে কী কী বই আছে দেখেছেন। নানা কবিতার যে-যে অংশ আমি পড়বার সময়ে চিহ্নিত করেছি সেগুলিকে বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

AMARBOI.COM

আশা করি, এই বই শুধু আমার ব্যক্তিগত সাফল্য ও দুঃখকষ্টের কাহিনী নয়। যে আধুনিক ভারত এখন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সামনের সারিতে স্থানলাভের জন্যে সংগ্রাম করছে, তার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংগঠনের নানা সাফল্য ও অসাফল্যের কাহিনীরও দলিল এই বই। এ কাহিনী জাতীয় উচ্চাশার ও সংযুক্ত প্রচেষ্টার। আর ভারত যে এখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতা ও প্রযুক্তিতে সক্ষমতা অর্জনের প্রয়াসী, অন্তত আমি যেভাবে দেখি, আমাদের কালের তা এক তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীও বটে।

এই গ্রহের প্রত্যেকটি জীব ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এক একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্যে। আমি জীবনে যা কিছু করতে পেরেছি, তাঁরই আনুকূল্যে, তাঁরই ইচ্ছাকে রূপদান করবার জন্যে। তাঁর করুণা তিনি আমার ওপর বর্ষণ করেছেন কতিপয় অনন্য সাধারণ শিক্ষক ও সহকর্মীর মধ্যে দিয়ে, এবং তাঁদেরকে আমি যখন শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সে তাঁরই জয়গান করা। এই রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র এ সবই তাঁরই কাজ, কালাম নামক একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির হাত দিয়ে সম্পাদিত। তার উদ্দেশ্য ভারতের কয়েক কোটি অধিবাসীকে বলা, নিজেদেরকে কখনও তুচ্ছ, অসহায় মনে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে। আমরা প্রত্যেকেই জন্মেছি আমাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক অগ্নি নিয়ে। আমাদের প্রচেষ্টা যেন হয় সেই অগ্নিকে ডানা দিতে, তার মঙ্গল-আভায় এই পৃথিবীকে পূর্ণ করতে।

ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

এ পি জে আবদুল কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

প্রারম্ভ

[১৯৩১ - ১৯৬৩]

এই পৃথিবী তাঁর, এই অসীম আকাশ তাঁর, দুই সমুদ্র তাঁর মধ্যে বিরাজমান। অথচ ওই ক্ষুদ্র-জলাশয়ে তিনি শয়ান।

অথর্ববেদ
৪র্থ মণ্ডল, ১৬শ সূক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

আমার জন্ম মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বীপশহর রামেশ্বরমের এক মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে। আমার পিতা জইনুল আবেদিনের না ছিল বিশেষ প্রথাগত শিক্ষা, না বিশেষ ধনসম্পদও। কিন্তু এ-সবের অভাব থাকলেও তাঁর ছিল সহজাত প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের প্রকৃত মহানুভবতা। আমার মা আশিয়াম্মার মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন এক আদর্শ সহায়িকা। ঠিক কতজনকে আমার মা প্রত্যহ অন্ন যোগাতেন আমার মনে নেই, তবে আমরা পরিবারের সকলে মিলে যত জন ছিলাম, বাইরের লোক যারা আমাদের সঙ্গে আহার করত তাদের সংখ্যা যে তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তাতে আমার সন্দেহ নেই।

বহু লোকের চোখে আমার বাবা-মা ছিলেন এক আদর্শ দম্পতি। আমার মায়ের বংশমর্যাদা অপেক্ষাকৃত বেশি বলে মনে করা হত। তাঁর এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

আমি ছিলাম অনেক সন্তানের এক জন, মাথায় ছোট, সাধারণ চেহারা। আমার বাবা-মা ছিলেন দীর্ঘকায়, সুদর্শন। আমরা থাকতাম আমাদের পৈতৃক বাড়িতে, ১৯শ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। বেশ বড়-সড় পাকা বাড়িটি ছিল ইট ও চুনাপাথরে গাঁথা, রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে (Mosque Street)। আমার বাবা কঠোর সংযম পালন করতেন, সমস্ত রকম বিলাসব্যসন পরিহার করতেন। তবে খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, ইত্যাদি যা প্রয়োজন সে-সবেরই ব্যবস্থা ছিল। আসলে আমার শৈশবে নিরাপত্তা বোধের কোনও অভাব ছিল না, বাহ্যিক উপকরণে কিংবা মানসিক দিক থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণত আমি মায়ের সঙ্গে খেতাম, রান্নাঘরের মেঝেতে বসে আমার সামনে মা একটি কলাপাতা বিছিয়ে দিয়ে তাতে ভাত এবং সুগন্ধী সম্বর ঢেলে দিতেন, আর দিতেন ঘরে তৈরি এক ধরনের ঝাল আচার এবং খানিকটা নারকোলের চাটনি।

যে বিখ্যাত শিবমন্দিরের কল্যাণে তীর্থযাত্রীদের কাছে রামেশ্বরমের এত মাহাত্ম্য সেটি আমাদের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটের পথ। আমাদের পাড়া ছিল প্রধানত মুসলিম-অধ্যুষিত, কিন্তু বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবারও সেখানে থাকত, এবং মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাবই ছিল তাদের। আমাদের পাড়ায় একটি অতি প্রাচীন মসজিদ ছিল। আমার বাবা সেখানে আমাকে সন্ধ্যায় নমাজের জন্যে নিয়ে যেতেন। আরবি ভাষায় উচ্চারিত সে-প্রার্থনার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি বুঝতাম না, কিন্তু নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতাম যে সে-প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছত। বাবা যখন নমাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন, বিভিন্ন ধর্মের অনেক লোক বাইরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করত। তাদের মধ্যে অনেকে বাটিতে করে তাঁর সামনে জল ধরত, তিনি তাঁর আঙুলের ডগা জলে একটু ডুবিয়ে দিয়ে কিছু প্রার্থনা করতেন। সে জল তারা নিয়ে বাড়ি যেত রোগীদের জন্যে। আমার এখনও মনে পড়ে, অসুখ সেরে গেলে, লোকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আমাদের বাড়ি আসত, আর বাবা মৃদু হেসে তাদের বলতেন, আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দাও, যিনি দয়াল, যিনি ক্ষমাশীল।

রামেশ্বরম মন্দিরের বড় পুরোহিত পক্ষী লক্ষণ শাস্ত্রী বাবার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। যে-সব স্মৃতি আমার মনে খুবই স্পষ্ট হয়ে আছে, তার মধ্যে একটি, এই দুজন মানুষ—দুজনেরই বেশবাস প্রথা অনুযায়ী, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনায় রত। প্রশ্ন করবার মতো বয়স হলে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নমাজ পড়ে কী হয়? বাবা বলতেন নমাজের মধ্যে রহস্য কিছু নেই। নমাজ বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগ সাধন করে। তিনি বলতেন, "নমাজের সময়ে নিজের শরীরকে অতিক্রম করে মানুষ বিশ্বজগতের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেখানে ধনী-দরিদ্রের, বয়সের, জাতির, ধর্মের কোনও ভেদ নেই।"

খুব সরল, খুব ঘরোয়া তামিলে বাবা জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোঝাতে পারতেন। তিনি এক দিন আমায় বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি মানুষ, তার নিজের কালে নিজের স্থানে যা হয়েছে, যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তাতে সে সমগ্র ঐশ্বরিক সত্তার এক বিশিষ্ট অংশ। তাই বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা এলে ভয় পাবে কেন? দুঃখ-কষ্ট এলে তোমার দুঃখ-কষ্টের প্রয়োজনীয়তা বুঝবার চেষ্টা কর। দুঃসময় এলেই সুযোগ আসে আত্মসমীক্ষার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কাছে যারা সাহায্যের জন্যে, পরামর্শের জন্যে আসে তাদেরকে এ-সব কথা বলেন না কেন?" বাবা আমার কাঁধের ওপর দু-হাত রেখে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ কিছুই বললেন না, যেন বিচার করে দেখছেন, তাঁর কথা বুঝবার ক্ষমতা আমার আছে কি না। তারপর অনুচ্চ গভীর স্বরে তিনি আমার কথার উত্তর দিলেন:

> যখনই মানুষ দেখে সে একা, প্রথমেই সে সঙ্গী খুঁজতে আরম্ভ করে। যখনই সে বিপদে পড়ে সে এমন কাউকে খোঁজে যে তাকে সাহায্য করতে পারে। যখনই সে দেখে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, সে খোঁজে এমন একজনকে যে তাকে পথ দেখাতে পারে। যখনই যন্ত্রণা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা আসে তখনই আসে তার জন্যে বিশেষ সাহায্যকর্তা। দুঃখ-কষ্টে পড়ে আমার কাছে যারা আসে, অতিপ্রাকৃত যে সমস্ত শক্তিকে তারা প্রার্থনার সাহায্যে, অর্ঘ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চায় আমি হই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম। এ আদৌ সঠিক পন্থা নয় এবং এই পন্থা অনুসরণ করাও উচিত নয়। আমাদের অদৃষ্টে কী আছে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে কথা চিন্তা করা এক জিনিস, আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা-পূর্তির পথ রোধ করেছে যে শত্রু, আমাদের নিজেদের মধ্যেই তাকে অনুসন্ধান করার মতো দৃষ্টি লাভ করা, এ অন্য জিনিস।

মনে পড়ে, বাবার দিন শুরু হত ভোরের আলো ফুটবার আগে, ঠিক ৪টের সময় নমাজ পড়ে। নমাজের পর তিনি বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে আমাদের একটা নারকেল-কুঞ্জ ছিল, সেখানে হেঁটে যেতেন। ফিরে আসতেন ডজন-খানেক নারকেল কাঁধে ঝুলিয়ে। তারপর তিনি সকালবেলাকার খাবার খেতেন। ষাটের ঘরে বয়সের শেষ দিক পর্যন্ত এই ছিল তাঁর দৈনিক নিয়ম।

আমার নিজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে সারা জীবন আমি আমার বাবাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি। আমার বাবা যে সমস্ত গভীর সত্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, সে-সব আমি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি; আমি অনুভব করবার চেষ্টা করেছি এক ঐশ্বরিক শক্তি আছে যা ভ্রান্তি থেকে, দুঃখ থেকে, বেদনা থেকে, ব্যর্থতা থেকে মানুষকে তুলে তার যথার্থ স্থানে তাকে নিয়ে যেতে পারে। একবার যদি কেউ তার চিত্তবৃত্তিসমূহের, তার দেহের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, স্বাধীনতার, সুখের, শান্তির পথ তার সামনে খুলে যায়।

আমার যখন বছর ছয়েক বয়স, আমার বাবা একটি কাঠের নৌকো নির্মাণের কাজে হাত দিলেন, রামেশ্বরম থেকে ধনুষ্কোডি (যার আরেক নাম সেতুক্কারাই) তীর্থযাত্রী নিয়ে যাবার এবং তাদের ফেরত আনবার জন্যে। আমেদ জালালুদ্দিন নামে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়, যিনি পরে আমার বোন জোহ্‌রাকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর সহায়তায়, সমুদ্রের তটে তিনি সেই নৌকো তৈরির কাজ করতেন। আমি দেখতাম কীভাবে ধীরে ধীরে একটি নৌকোর আকৃতি গড়ে উঠছে। নৌকার বিভিন্ন অংশের কাঠ কাঠের আগুনে তাতিয়ে পোক্ত করা হত। আমার বাবা নৌকার ব্যবসা ভালই করেছিলেন যখন এক দিন ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে এক সাইক্লোন এসে আমাদের নৌকা উড়িয়ে নিয়ে গেল, তার সঙ্গে গেল সেতুক্কারাইয়ের খানিকটা ভূ-ভাগ। পাম্বান সেতু ভেঙে পড়ল, যাত্রী-বোঝাই একটি ট্রেন সমেত। এতদিন আমি সমুদ্রের সৌন্দর্যই দেখেছিলাম, এবার তার দুর্দমনীয় শক্তি আমার দৃষ্টিতে উন্মোচিত হল।

যত দিনে অকালে নৌকার মৃত্যু ঘটেছে, তার মধ্যে জালালুদ্দিন হয়ে উঠেছেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের বয়সের তফাত সত্ত্বেও। তিনি বয়সে আমার চেয়ে বছর পনেরোর বড় ছিলেন, আমায় ডাকতেন আজাদ বলে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা পায়ে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে যেতাম। মস্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে আমরা দ্বীপের বালুকাময় বেলাভূমির দিকে যখন এগোতাম জালালুদ্দিন এবং আমি কথা বলতাম, প্রধানত আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে। অবশ্য রামেশ্বরম, যেখানে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসত, সেই রকম কথাবার্তার উপযুক্ত জায়গাই ছিল বটে। আমরা প্রথমে থামতাম শিবমন্দিরে। দেশের দূর দূরান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের মতো একই রকম সম্ভ্রম-সহকারে আমরা যখন মন্দির প্রদক্ষিণ করতাম, অনুভব করতাম একটি শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে।

জালালুদ্দিন এমনভাবে ঈশ্বরের কথা বলতেন, যেন ঈশ্বর তাঁর কাজকর্মের সঙ্গী। নিজের সমস্ত দ্বিধা-সংশয় তিনি ঈশ্বরের কাছে তুলে ধরতেন যেন তিনি পাশেই আছেন সে-সবের নিরসন করবার জন্যে। আমি জালালুদ্দিনকে দেখতাম, আর মন্দিরের চারপাশে যত তীর্থযাত্রী, তাদের দেখতাম। তারা সমুদ্রে পুণ্যস্নান করছে, পূজার্চনা করছে সেই একই জ্ঞানাতীতের, যাঁকে আমরা মনে করি নিরাকার সর্বশক্তিমান। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ কখনও ছিল না যে, মন্দিরের প্রার্থনা যেখানে যায়, মসজিদে আমাদের প্রার্থনাও সেখানেই যায়। আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, ঈশ্বরের সঙ্গে জালালুদ্দিনের কি বিশেষ ধরনের কোনও সম্পর্ক আছে? বিদ্যালয়ের শিক্ষা জালালুদ্দিনের বেশি দূর এগোয়নি, প্রধানত তাঁদের পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্যে। বোধহয় সেই জন্যেই তিনি পড়াশোনায় ভাল হওয়ার জন্যে আমায় এত উৎসাহ দিতেন এবং আমার সাফল্য, তাঁর নিজের না হলেও তাঁকে এত আনন্দ দিত। তিনি যে বঞ্চিত, সে-জন্যে, বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কি উষ্মা আমি তাঁর মধ্যে দেখিনি। বরং, জীবন যা কিছু তাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছে তার জন্যে তিনি সর্বদা কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলি, যখনকার কথা বলছি তখন সারা দ্বীপে তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইংরেজি লিখতে পারতেন। দরকারে প্রায় প্রত্যেকেরই চিঠিপত্র তিনি লিখে দিতেন, তা সে দরখাস্তই হোক আর অন্য কিছুই হোক। জালালুদ্দিনের মতো শিক্ষা-দীক্ষা কিংবা বাইরের জগতের সঙ্গে যোগযোগ আমার পরিচিত কারও ছিল না, না আমাদের পরিবারে, না প্রতিবেশীদের মধ্যে। জালালুদ্দিন সব সময়ে আমাকে শিক্ষিত লোকেদের কথা বলতেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, সমসাময়িক সাহিত্যের কথা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিবিধ সাফল্যের কথা বলতেন। আমাদের পরিচিত জগতের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে যে "চমকপ্রদ, সাহসী নতুন পৃথিবী" তার বিষয়ে তিনি আমাকে অবহিত করেছিলেন।

সমাজের নিচু তলার যে পরিবেশে আমি বাল্যকাল অতিবাহিত করেছি, সেখানে বই নামক বস্তুটি বিরল ছিল। সেই হিসাবে এস. টি. আর মণিক্কমের ব্যক্তিগত সংগ্রহটিকে ভালই বলতে হবে। এক কালে তিনি 'বিপ্লবী', কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনিই আমাকে উৎসাহ দিতেন, আর বলতেন, যত পার পড়ো। আমি বই ধার করতে প্রায়ই তাঁর বাড়ি যেতাম।

আমার বাল্যকালে আরেকজনের প্রভাব প্রবল ছিল তিনি সামসুদ্দিন, সম্পর্কে ছিলেন আমার ভাই। রামেশ্বরমে তিনি একমাত্র সংবাদ পরিবেশক ছিলেন। পাম্বান থেকে সকালের ট্রেনে খবরের কাগজ রামেশ্বরম স্টেশনে পৌঁছত। যারা পড়তে পারে, রামেশ্বরমের সেই ১০০০ অধিবাসীর কাছে খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়ার যে এজেন্সি তার একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন সামসুদ্দিন। সে-সব খবরের কাগজ লোকে কিনত জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরাখবর রাখবার জন্যে, জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী জানবার জন্যে এবং মাদ্রাজের বাজারের সেদিনের দরের ওঠা-পড়ার ওপর নজর রাখবার জন্যে। কয়েকজন পাঠক, যাদের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রসারিত ছিল, তারা হিটলার, মহাত্মা গান্ধী এবং জিন্নার কথা আলোচনা করত। সব আলোচনাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছত পেরিয়ার ই. ভি. রামস্বামীর বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিশাল রাজনৈতিক স্রোতধারায়। *দিনমণি* ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা। তাতে যা ছাপা হত সে-সব যেহেতু আমার বোধগম্য ছিল না, সামসুদ্দিন পত্রিকাগুলিকে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগে তার ছবিগুলো দেখেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল ১৯৩৯ সালে, তখন আমার বয়স আট বছর। কী কারণে আমি আজ পর্যন্ত জানি না, বাজারে হঠাৎ তেঁতুল-বিচির বিপুল চাহিদা দেখা দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিচি জোগাড় করে মস্ক স্ট্রিটে একটা দোকানে বিক্রি করতাম। এক দিনের সংগ্রহ থেকে আমার আয় হত বড় কম নয়, পুরো এক আনা! জালালুদ্দিন আমাকে যুদ্ধের গল্প শোনাতেন, পরে আবার আমি দেখতাম *দিনমণি* খবরের কাগজের প্রধান প্রধান সংবাদে সে-সব থাকে কি না। আমাদের অঞ্চলটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন, যুদ্ধের কোনও প্রভাবই তার ওপর পড়েনি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভারতকে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিতে হল, এবং জরুরি অবস্থার মতো একটা জারি হল। তার প্রথম কোপে রামেশ্বরমে ট্রেন থামা বন্ধ হয়ে গেল। খবরের কাগজের বাণ্ডিলগুলো রামেশ্বরম ও ধনুষ্কোডির মধ্যে রামেশ্বরম রোডে চলন্ত ট্রেন থেকে তখন ফেলে দিতে হত। সামসুদ্দিনকে একজনের খোঁজ করতে হল সেই বাণ্ডিলগুলো ধরে নেওয়ার জন্যে। যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই পদটি পূর্ণ করলাম আমি। সামসুদ্দিনের কল্যাণে আমি জীবনে প্রথম বেতন পেলাম। অর্ধ শতাব্দী পরে এখনও আমি অনুভব করি, গর্বে আমার বুক কেমন ফুলে উঠেছিল প্রথম নিজে টাকা রোজগার করে।

প্রত্যেকটি শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক এবং মানসিক পরিবেশের মধ্যে জন্মায়, এবং যেমন যেমন বড় হয়, গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হয়। আমার পিতার কাছ থেকে আমি লাভ করেছি সাধুতা ও আত্মসংযম, মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি যা-ভাল তাতে বিশ্বাস এবং গভীর সংবেদনশীলতা। বলা বাহুল্য, আমার তিন ভাই বোনও তা পেয়েছেন। কিন্তু যে সময় আমি ব্যয় করেছি জালালুদ্দিন এবং সামসুদ্দিনের সঙ্গে, আমার শৈশব এবং বাল্যকালের অনন্য-সাধারণত্বের জন্যে আমি বোধ করি তাঁদের কাছেই সর্বাধিক ঋণী। আমার পরবর্তী জীবনও বিপুলভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জালালুদ্দিন এবং সামসুদ্দিনের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তাঁদের যে প্রজ্ঞা তা এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, মুখের কথা ছাড়াই হাব-ভাবের ভাষা তাঁদের মধ্যে এমন সাড়া জাগাতে পারত যে, আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আমার পরবর্তী জীবনের সৃষ্টিশীলতার জন্যে বাল্যে তাঁদের সান্নিধ্যের কাছে আমি ঋণী।

বাল্যে আমার তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, রামনাথ শাস্ত্রী, অরবিন্দন এবং শিবপ্রকাশন। এই তিনটি বালকই ছিল রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের। বলতে কী, রামনাথ শাস্ত্রী ছিল রামেশ্বরম মন্দিরের বড় পুরোহিত পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর পুত্র। ছেলেবেলায় আমাদের ধর্ম আলাদা বলে কিংবা আলাদা-আলাদাভাবে আমরা বড় হয়েছি বলে কখনওই আমরা পরস্পরের থেকে আলাদা বলে বোধ করতাম না। পরবর্তী কালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামনাথ পিতার হাত থেকে পৌরোহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অরবিন্দন সমাগত তীর্থযাত্রীদের জন্যে যানবাহনের ব্যবসা আরম্ভ করেন, এবং শিবপ্রকাশন দক্ষিণ রেল-এর যাত্রীদের খাদ্যপানীয় সরবরাহের ঠিকাদারি করেন।

শ্রী সীতারাম কল্যাণমের বার্ষিক উৎসবের সময়ে আমাদের পরিবার বিশেষ পাটাতনযুক্ত নৌকার ব্যবস্থা করত। তাতে করে মন্দির থেকে দেবতার বিগ্রহ বিবাহস্থলে নিয়ে যাওয়া হত। বিবাহস্থলটি ছিল আমাদের বাড়ির কাছে রামতীর্থ নামে একটি পুকুরের মধ্যস্থলে। আমাদের পরিবারে, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার সময়ে মা-ঠাকুমারা রামায়ণের গল্প এবং পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জীবনী থেকেই গল্প শোনাতেন।

আমি যখন রামেশ্বরম এলিমেন্টারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, এক দিন আমাদের ক্লাসে একজন নতুন শিক্ষক এলেন। মুসলিম হিসাবে আমার মাথায় টুপি থাকত, আর আমি সর্বদাই বসতাম প্রথম বেঞ্চিতে গায়ে নামাবলী জড়ানো রামনাথ শাস্ত্রীর পাশে। একজন হিন্দু পুরোহিতের ছেলে এক মুসলিম ছেলের সঙ্গে বসবে, এ কী করে হয়, আমাদের নতুন শিক্ষকটিও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের যে সামাজিক মর্যাদা, সেই অনুযায়ী তিনি আমায় পিছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বসতে বললেন। আমার মনে খুব দুঃখ হল, স্বভাবতই রামনাথ শাস্ত্রীরও তাই। আমি উঠে পিছনের বেঞ্চিতে যাবার সময়ে দেখলাম সে খুবই মনমরা, চোখে তার জল। তার সেই কান্নার দৃশ্য আমার মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল।

ছুটির পর বাড়ি ফিরে আমরা দুজনেই আমাদের বাবা-মাকে ঘটনাটা বললাম। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী শিক্ষককে ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের সামনেই শিক্ষককে বললেন, নিষ্পাপ শিশুদের মনে তিনি যেন সামাজিক উঁচু-নিচুর ভেদ আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ না ঢুকিয়ে দেন। তিনি শিক্ষককে স্পষ্ট বলে দিলেন, হয় ক্ষমা চান, নয়তো ইস্কুল এবং দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। এর ফলে শিক্ষক মহাশয় শুধু যে অনুতপ্ত হলেন তাই নয়, লক্ষ্মণ শাস্ত্রী তাঁর যে দৃঢ় বিশ্বাসের কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার ফলে সেই তরুণ শিক্ষকের মনেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন এসেছিল।

সাধারণ ভাবে রামেশ্বরমের ওই ছোট্ট সমাজে উচ্চনীচ ভেদ ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব কঠোরভাবে রক্ষা করা হত। অবশ্য আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ার, যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ এবং তাঁর স্ত্রীও ছিলেন খুবই রক্ষণশীল, তবুও তিনি নিজে খানিকটা বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন ছিলেন। সামাজিক বিভেদ তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন ভেঙে দিতে, যাতে বিভিন্ন অবস্থার মানুষ সহজেই মেলামেশা করতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে কাটাতেন, বলতেন, "কালাম, আমি চাই তুমি এমনভাবে বেড়ে ওঠ, যাতে বড় বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের উচ্চ-শিক্ষিত লোকেদের তুমি সমকক্ষ হতে পার।"

একদিন তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের শুদ্ধ-আচারসম্মত রান্নাঘরে এক মুসলিম ছেলেকে খেতে নিমন্ত্রণ করা, তাঁর স্ত্রী তো ভয়ে আঁতকে উঠলেন। তিনি তাঁর রান্নাঘরে আমাকে খেতে দিতে রাজি হলেন না। শিবসুব্রহ্মণ্য এতে বিচলিত হলেন না, স্ত্রীর ওপর রাগও করলেন না। তার বদলে তিনি নিজের হাতে আমাকে খাবার পরিবেশন করে আমার পাশেই খেতে বসলেন। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরের দরজার পিছন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আমি যেভাবে ভাত খাচ্ছি, জল খাচ্ছি, খাওয়ার পর ঘরের মেঝে যেভাবে পরিষ্কার করছি, সে-সব কি আমি তাঁদের মতো না করে অন্যরকম ভাবে করলাম বলে তাঁর মনে হল? যখন চলে আসছিলাম, শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ার আবার পরের সপ্তাহে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। আমি ইতস্তত করছি দেখে তিনি বললেন, আমি যেন ঘাবড়ে না যাই, "রীতি-নীতি যদি বদলাতে চাও, এ-সব সমস্যার মুখোমুখি হতেই হবে।" পরের সপ্তাহে যখন তাদের বাড়ি গেলাম, শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ারের স্ত্রী আমাকে রান্নাঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হল এবং ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন। গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, "ভারতীয়রা নিজের ভারত নিজেরা গড়বে।" সারা ভারতে অভূতপূর্ব আশার মনোভাব। আমি বাবার কাছে রামেশ্বরম ছেড়ে জেলা সদর রামনাথপুরমে গিয়ে পড়াশোনা করবার অনুমতি চাইলাম।

উত্তরে বাবা যেন স্বগতোক্তি করলেন, "আবুল, আমি জানি বড় হওয়ার জন্যে তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। সমুদ্রের চিলকে কি বাসা ছেড়ে একাকী উড়ে যেতে হয় না? তোমার স্মৃতি যাকে জড়িয়ে আছে সেই জায়গার মায়া ছেড়ে তোমার সব চাইতে বড় যে আকাঙ্ক্ষা, তার জায়গায় তোমাকে যেতেই হবে। আমাদের ভালবাসা আমাদেরকে অন্ধ করবে না, আমাদের প্রয়োজন তোমাকে বেঁধে রাখবে না।" আমার মা-র মনে দ্বিধা ছিল, বাবা তাঁকে খলিল জিব্রান-এর লেখা শোনালেন, "তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়/জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা তার নিজেরই জন্যে, তোমার সন্তানেরা তারই সন্তান। তোমার মধ্যে দিয়ে তারা আসে, তোমার কাছ থেকে নয়। তোমার ভালবাসা তাদেরকে দেবে, তোমার ভাবনা-চিন্তা নয়, কারণ তাদের নিজেদেরই ভাবনা-চিন্তা আছে।"

আমাকে আর আমার তিন ভাইকে নিয়ে বাবা মসজিদে গেলেন। সেখানে পবিত্র কোরান থেকে তিনি "আল ফতিহ্" প্রার্থনাটি আবৃত্তি করলেন। রামেশ্বরম স্টেশনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, "এই দ্বীপ তোমার চোখে বাসস্থান হতে পারে, তোমার মনের নয়, তোমার মনের বাস আগামীকালে, সেখানে রামেশ্বরমের আমরা কেউ যেতে পারি না। এমনকী স্বপ্নেও নয়। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন!"

সামসুদ্দিন ও আহ্‌মেদ জালালুদ্দিন আমার সঙ্গে রামনাথপুরম গেলেন, আমাকে শোয়ার্জ হাইস্কুল (Schwartz High School)-এ ভর্তি করবার জন্যে, এবং সেখানে আমার আহার ও বাসস্থানের জায়গা ঠিক করার জন্যে। যাই হোক, নতুন পরিবেশ আমার পছন্দ হল না। রামনাথপুরম শহরটি ছিল বর্ধিষ্ণু এবং তার পঞ্চাশ হাজার লোকের মধ্যে দলাদলিও কম ছিল না। রামেশ্বরমের মতো সকলের মিলেমিশে থাকা, স্বরসঙ্গতি, অখণ্ডতা সেখানে ছিল না। বাড়ির জন্যে আমার মন কেমন করত, তাই সুযোগ পেলেই আমি রামেশ্বরম চলে যেতাম। শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ রামানাথপুরমের যতই থাক, তার চেয়ে আমার মায়ের তৈরি "পোলি"র (এক ধরনের দক্ষিণ ভারতীয় মিষ্টি) আকর্ষণ বেশি ছিল। মা আলাদা-আলাদা বারো রকমের "পোলি" বানাতেন, তাতে যত রকমের উপকরণ থাকত তার মিশ্রণ এমন হত যে প্রত্যেকটির স্বাদ গন্ধ আলাদা করে পাওয়া যেত।

বাড়ির জন্যে মন যতই খারাপ করুক, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবই, কেন না, আমি জানতাম আমার বাবার অনেক আশা ছিল আমি কৃতকার্য হব। বাবা মনশ্চক্ষে দেখতেন, আমি ভবিষ্যতে একজন কালেক্টর হব এবং আমি ভাবতাম আমার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা আমার কর্তব্য, রামেশ্বরমের অভ্যস্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা, আরামের অভাব এখানে তীব্রভাবে অনুভব করা সত্ত্বেও।

জালালুদ্দিন আমাকে প্রায়ই ইতিবাচক চিন্তার ক্ষমতার কথা বলতেন, এবং যখন বাড়ির জন্যে মন খারাপ করত, মন দমে যেত, তাঁর সে-সব কথা আমার মনে পড়ত। তিনি যা বলেছিলেন, আমি সেই রকম করবার চেষ্টা করতাম, নিজের মনকে, নিজের ভাবনা চিন্তাকে বশে রাখবার চেষ্টা করতাম, এবং সেইভাবে চেষ্টা করতাম আমার ভাগ্যকে প্রভাবিত করতে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, ভাগ্য আমাকে রামেশ্বরমে ফিরিয়ে না নিয়ে গিয়ে, বাল্যের আবাসভূমি থেকে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আরও অনেক দূরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

রামনাথপুরমের শোয়ার্জ হাই স্কুলে স্থিত হওয়ার পর আমার মধ্যে যে পনেরো বছর বয়সের অত্যুৎসাহী বালকটি ছিল, সে আত্মপ্রকাশ করল। আগ্রহে ভরপুর একটি তরুণ মন, যে তখনও ঠিক জানে না তার সামনে কী কী পথ খোলা আছে, কী কী বিকল্প খোলা আছে, সেই রকম একটি মনের জন্য আদর্শ শিক্ষক ছিলেন আমার শিক্ষক ইয়াদুরাই সলোমন। তাঁর মনোভাব এমন আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, এমন খোলা মন ছিল যে, তাঁর ক্লাসে ছাত্রেরা অতিশয় স্বচ্ছন্দ বোধ করত। তিনি প্রায়শই বলতেন, যে ভাল ছাত্র সে একজন খারাপ শিক্ষকের কাছ থেকে যত শিখতে পারবে, একজন খারাপ ছাত্র কোনও ভাল শিক্ষকের কাছ থেকেও তত শিখতে পারবে না।

রামনাথপুরমে থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে থাকার জন্যেই আমি শিখেছিলাম, মানুষ তার নিজের জীবনে যা-যা ঘটে তার ওপরে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে। ইয়াদুরাই সলোমন প্রায়ই বলতেন, "জীবনে কৃতকার্য হতে গেলে, ফল লাভ করতে গেলে, তিনটি প্রবল শক্তিকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।" পরবর্তীকালের একজন রেভারেন্ড, এই ইয়াদুরাই সলোমনই আমাকে শিখিয়েছিলেন, আমি যা চাই তেমন ঘটনা তো তখনই ঘটতে পারে যখন আমি তীব্রভাবে চাইব এবং নিঃসংশয় হব যে ঘটনাটি ঘটবেই। আমার নিজের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। আকাশের রহস্য এবং পাখির আকাশে ওড়া, এই নিয়ে আমার মুগ্ধতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশৈশব। আমি সারস পাখিগুলোকে দেখতাম, সামুদ্রিক চিল দেখতাম, উড়ে যাচ্ছে ওপরের দিকে, ক্রমশ যেন আকাশে উঠে যাচ্ছে; আর তাই দেখে আমারও উড়বার ইচ্ছা হত। একজন সরল সাধারণ মফঃস্বলের ছেলে ছিলাম আমি, কিন্তু আমারও বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, আমিও একদিন আকাশে উড়ব। প্রকৃতপক্ষে রামেশ্বরমের ছেলেদের মধ্যে আমিই প্রথম আকাশে উড়ি।

ইয়াদুরাই সলোমন এক মস্ত বড় শিক্ষক ছিলেন, তার কারণ, তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাদের মূল্য সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে দিতেন। আমার নিজের মূল্যের বোধ আমার মধ্যে তিনি অত্যন্ত উঁচুতে তুলে দিলেন। আমি যাঁদের সন্তান তাঁদের যদিও শিক্ষার সুযোগ হয়নি, তবু আমিও যা হতে চাই তা হতে পারব, এই বিশ্বাসও তিনিও গড়ে দিয়েছিলেন আমার মনে। "বিশ্বাস থাকলে তুমিও নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে," বলতেন তিনি।

আমি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি সে-সময় একদিন আমার গণিত শিক্ষক রামকৃষ্ণ আয়ার অন্য একটি ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। ভুল করে আমি সেই ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। রামকৃষ্ণ আয়ার ছিলেন সাবেকি ধরনের জবরদস্ত ইস্কুলমাস্টার। তিনি ঘাড়টি ধরে আমাকে বেত লাগালেন ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের সামনে। অনেক মাস পরে, যখন আমি গণিতে ১০০-র মধ্যে ১০০ পেলাম, সকালবেলার প্রার্থনার সময়ই সারা স্কুলের সামনে তিনি ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে বললেন, "আমি যাকেই বেত মারি সে-ই মস্ত মানুষ হয়। আমি বলছি, এই ছেলেটি সারা ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে, তার শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করবে।" এই প্রশংসায় তার আগেকার সেই বেইজ্জতির ক্ষতিপূরণেরও বেশি হয়ে গেল আমার কাছে।

যত দিনে শোয়ার্জ-এ আমার শিক্ষা সমাপ্ত হল, তার মধ্যে আমার নিজের ওপরে আস্থা জন্মে গেছে, আমার সংকল্প দৃঢ় হয়েছে যে, আমি জীবনে কৃতকার্য হব। বিনা দ্বিধায় আমি ঠিক করে ফেলেছি, আরও শিক্ষার জন্যে অগ্রসর হব। তখনকার দিনে আমরা জানতামই না পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। উচ্চতর শিক্ষা বলতে বোঝাত কলেজে ভর্তি হওয়া, আর নিকটতম কলেজ ছিল তিরুচিরাপল্লীতে, তখন যার নাম ছিল ত্রিচিনোপল্লি, সংক্ষেপে ত্রিচি।

১৯৫০ সালে আমি ত্রিচির সেন্ট জোসেফ কলেজে হাজির হলাম, ইন্টারমিডিয়েট পড়তে। পরীক্ষার ফল দিয়ে বিচার করলে আমি খুব ভাল ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু আমার রামেশ্বরমের বন্ধুদের কল্যাণে, যাতে কাজ হয় এমন চিন্তা করবার মতো মনোভাব আমার তৈরি হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বড় ভাই মুস্তাফা কামালের একটি মুদিখানার দোকান ছিল রামেশ্বরমের রেল স্টেশন রোডে। আমি যখনই রামেশ্বরমে ফিরে যেতাম, সে আমাকে তার দোকানে একটু সাহায্য করতে বলে, আমার জিম্মায় দোকানটি রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাওয়া হয়ে যেত, আর আমি তেল, চাল, পেঁয়াজ, সবই বিক্রি করতাম। দেখতাম, সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত সিগারেট আর বিড়ি। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, গরিব লোকেরা তাদের কষ্টের রোজগার হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় কেন? মুস্তাফার কাছ থেকে যখন ছাড়া পেতাম, ছোটভাই কাশিম মোহাম্মদ তার ছোট্ট দোকানটি আমার হাতে ছেড়ে দিত। সেখানে আমি বিক্রি করতাম ঝিনুকের তৈরি জিনিস।

সেন্ট জোসেফ-এ রেভারেন্ড ফাদার টি. এন. সেক্যুইরা-র মতো একজন শিক্ষক পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, আর আমাদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেনও ছিলেন। তিনতলা হোস্টেলে আমরা শ-তিনেক ছেলে থাকতাম। রেভারেন্ড ফাদার বাইবেল হাতে নিয়ে প্রতিদিন রাত্রে প্রত্যেকটি ছেলের কাছে যেতেন। তাঁর কর্মশক্তি আর ধৈর্য ছিল বিস্ময়কর। তাঁর বিবেচনাশক্তি ছিল খুবই প্রখর, প্রত্যেকটি ছাত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনটিও তিনি অগ্রাহ্য করতেন না। দীপাবলীর দিন, তাঁর নির্দেশে হোস্টেলের দায়িত্বে থাকা সেই 'ব্রাদার' এবং মেসের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে আচার অনুযায়ী স্নানের জন্যে জিনজেলি তেল সবাইকে দিতেন।

সেন্ট জোসেফ-এর ছাত্রাবাসে আমি চার বছর ছিলাম। আরও দুজন আমার ঘরে থাকত। একজন ছিল শ্রীরঙ্গমের গোঁড়া ব্রাহ্মণ (আয়েঙ্গার), আরেকজন কেরালার সিরিয়ান ক্রিশ্চান। তিনজনে আমরা মহানন্দে থাকতাম। আমার হোস্টেলবাসের তৃতীয় বছর যখন আমাকে নিরামিষাশী মেসের সেক্রেটারি করা হল, এক রবিবার আমরা রেক্টর রেভা. ফাদার কালাথিলকে দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলাম। আমাদের আলাদা আলাদা খাদ্যরীতি থেকে বাছাই করে এক বিচিত্র পদ তৈরি হল। ফলটা দাঁড়াল অদ্ভুত ধরনের। কিন্তু রেভা. ফাদার আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রেভা. ফাদারের সঙ্গে আমাদের সময়টা কেটে গেল মহা আনন্দে। আমাদের কথাবার্তায় তিনি ছেলেমানুষের মতো সোৎসাহে যোগ দিলেন। আমাদের সকলের জীবনে সে-এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

সেন্ট জোসেফে আমাদের শিক্ষকেরা ছিলেন কাঞ্চি পরমাচার্যের প্রকৃত অনুগামী। পরমাচার্য সবাইকে বলতেন "বেঁচে থাকাটাকে উপভোগ করো।" আমাদের গণিত শিক্ষক অধ্যাপক তোতাদ্রি আয়েঙ্গার এবং অধ্যাপক সূর্যনারায়ণ শাস্ত্রী কলেজের চত্বরে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন, সে স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও তা আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

সেন্ট জোসেফ-এ আমার শেষ বছরে, ইংরেজি সাহিত্যে আমার রুচি জন্মাল। বড় বড় লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করলাম। টলস্টয়, স্কট, হার্ডি, হলেন আমার বিশেষ প্রিয়, যদিও তাঁদের লেখার পটভূমিকা আমার অপরিচিত। তারপর চলে গেলাম দর্শনের বইয়ে। এই রকম এক সময়েই পদার্থবিদ্যার প্রতিও আমার প্রবল আগ্রহের সঞ্চার ঘটল।

সেন্ট জোসেফ-এ আমার পদার্থবিদ্যার দুই শিক্ষক, অধ্যাপক চিন্নাদুরাই এবং অধ্যাপক কৃষ্ণমূর্তি অবপারমাণবিক পদার্থবিদ্যার (subatomic physics) বিষয়ে যা পড়ালেন, তাতে অর্ধজীবন কাল সম্পর্কে ধারণা এবং পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা-জনিত ক্ষয় সম্পর্কে (radioactive decay) ধারণার আমার প্রথম পরিচয় ঘটল। রামেশ্বরমে যিনি আমার বিজ্ঞান শিক্ষক ছিলেন, সেই শিবসুব্রহ্মণ্য আয়ার আমাকে কোনওদিন শেখাননি যে অধিকাংশ অবপারমাণবিক কণা অস্থায়ী, এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেগুলো বিভক্ত হলে অন্য কণায় পরিণত হয়। এ-সব তখনই আমি প্রথম শিখলাম। কিন্তু যখন তিনি আমাকে পরিশ্রম সহকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বললেন, কারণ অস্থায়িত্ব প্রত্যেক মিশ্র বস্তুতেই অন্তর্নিহিত, তখন কি তিনি সেই একই কথা বলছিলেন না? আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি, অনেকে এ কথা কেন মনে করেন যে, বিজ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়? আমার যা মনে হয়, বিজ্ঞান সর্বদাই হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে যেতে পারে। আমার দৃষ্টিতে বিজ্ঞান চিরকালই আধ্যাত্মিক সম্পদ এনে দেয় আর আত্মোপলব্ধি দান করে।

এমনকী বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন যুক্তি বিন্যাসের কাঠামো তার মধ্যে রূপকথাও আশ্রয় পেয়েছে। মহাবিশ্ব বিজ্ঞানের বইয়ে আমার অতিশয় আগ্রহ, মহাকাশের বস্তুসমূহের বিষয়ে গ্রন্থাদি পাঠেও আমার প্রভূত আনন্দ। বন্ধুরা অনেকে মহাকাশ যাত্রা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করার সময়ে জ্যোতিষবিদ্যার প্রসঙ্গে গিয়ে পড়েন। সত্যি কথা বলতে কী, আমি কোনওদিনই বুঝতে পারিনি, কী কারণে লোকে আমাদের সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলোকে এত গুরুত্ব দেয়। কলাবিদ্যা হিসাবে জ্যোতিষে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ যদি বলে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে তাকে মেনে নিতে হবে, তাতে আমি রাজি নই। গ্রহ, তারকা-সমাবেশ, এমনকী উপগ্রহ, এ-সব মানুষের ওপরে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়েও অত কল্পকাহিনীর কীভাবে উদ্ভব হল আমি জানি না। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি নিয়ে অত্যন্ত জটিল হিসাব থেকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমার মতে অযৌক্তিক। আমি যা বুঝেছি তা হল, পৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অতিশয় শক্তিশালী ও জীবন্ত উপগ্রহ। যেমন জন মিল্টন *প্যারাডাইস লস্ট*-এর অষ্টম সর্গে অতি সুন্দর বলেছেন:

তাতে কী যদি সূর্য
এ-বিশ্বের যত গ্রহ তারকার কেন্দ্রবিন্দু হয়,
যদি এই গ্রহ, ভূ-গোলক, স্থির প্রতীয়মান
যদিও, ত্রিবিধ গতিতে গতিশীল।

এই গ্রহের যেখানেই আপনি যান, দেখবেন চলমানতা, জীবন। এমনকী, যে সব বস্তু মনে হয় প্রাণহীন পাথর, ধাতু, কাঠ তার মধ্যেও নিহিত আছে চলমানতা, প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নৃত্য চলছে ইলেকট্রনের। বৈদ্যুতিক বলের দ্বারা নিউক্লিয়াস যে তাদেরকে যতটা সম্ভব দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে, তার দরুনই এই নৃত্য। যার মধ্যে কিছু শক্তি আছে সে যা করে ইলেকট্রনও তাই করছে, বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিউক্লিয়াস তাকে যত দৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাইবে, নিজের কক্ষপথে ইলেকট্রনের গতি তত দ্রুত হবে। প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের যে বন্দিদশা তার ফলে প্রচণ্ডগতির উদ্ভব হয়, সেকেন্ডে ১০০০ কিমি! এই উচ্চগতির জন্যে পরমাণুকে মনে হয় কঠিন বর্তুলাকার বস্তু যেমন দ্রুত ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডগুলিকে চাকার মতো দেখায়। পরমাণুকে চাপ দিয়ে আরও সংকুচিত করা অত্যন্ত কঠিন। এই কারণেই বস্তু তার পরিচিত কঠিন আকৃতি লাভ করেছে। অতএব প্রত্যেকটি কঠিন বস্তুর অভ্যন্তরে প্রচুর শূন্যস্থান আছে, এবং প্রত্যেক নিশ্চল বস্তুর মধ্যেই প্রচুর গতিও বিদ্যমান। ঠিক যেন, অহরহ পৃথিবীতে শিবের তাণ্ডবনৃত্য চলছে।

সেন্ট জোসেফ-এ যখন আমি বি. এসসি কোর্সে ভর্তি হলাম, আমি জানতাম না উচ্চতর শিক্ষার অন্য কোনও রাস্তা আছে। বিজ্ঞানের ছাত্রের জন্যে কোন কোন পেশা অথবা বৃত্তি খোলা আছে, সে বিষয়েও আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। বি. এসসি ডিগ্রি পাওয়ার পরই আমি উপলব্ধি করলাম, পদার্থবিদ্যা আমার বিষয় নয়। নিজের স্বপ্নকে সত্য করবার জন্যে আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমি অনেক আগেই ভর্তি হতে পারতাম, ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেই। যাই হোক, ভাবলাম দেরি হয়ে গেলেও, মোটেও না করার চেয়ে দেরিতে করা ভাল। তাই মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা জয়নুলআবেদিন। প্রথাসিদ্ধভাবে শিক্ষালাভ করেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন প্রগাঢ় জ্ঞানী ও দয়ালু ব্যক্তি।

পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, বাবার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং রামেশ্বরম মন্দিরের প্রবীণ পুরোহিত।

যে-অঞ্চলে আমি বড় হয়েছিলাম। মস্ক স্ট্রিটে আমাদের বাড়ি।

ভগবান শিবের প্রাচীন মন্দির। দূরদূরান্তর থেকে হাজার হাজার ভক্ত এখানে আসতেন। এই রাস্তার ওপরেই আমার ভাই কাশিম মহম্মদের হস্তশিল্পের দোকান ছিল। আমি মাঝে মাঝে সেখানে ভাইকে কাজে সাহায্য করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের পাড়ার একটি মসজিদ। এখানে বাবা প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে এবং ভাইদের নমাজ পড়তে নিয়ে যেতেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় আমার ব্যবহৃত টি-স্কোয়ারটি আমার ভাই নির্দেশ করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভাই মুস্তাফা কালামের বন্ধু এস.টি. আর মাণিক্কম-এর বাড়ি।
তার বিপুল বইয়ের সংগ্রহ থেকে রামেশ্বরমে থাকাকালীন আমি বই নিয়ে পড়তাম।

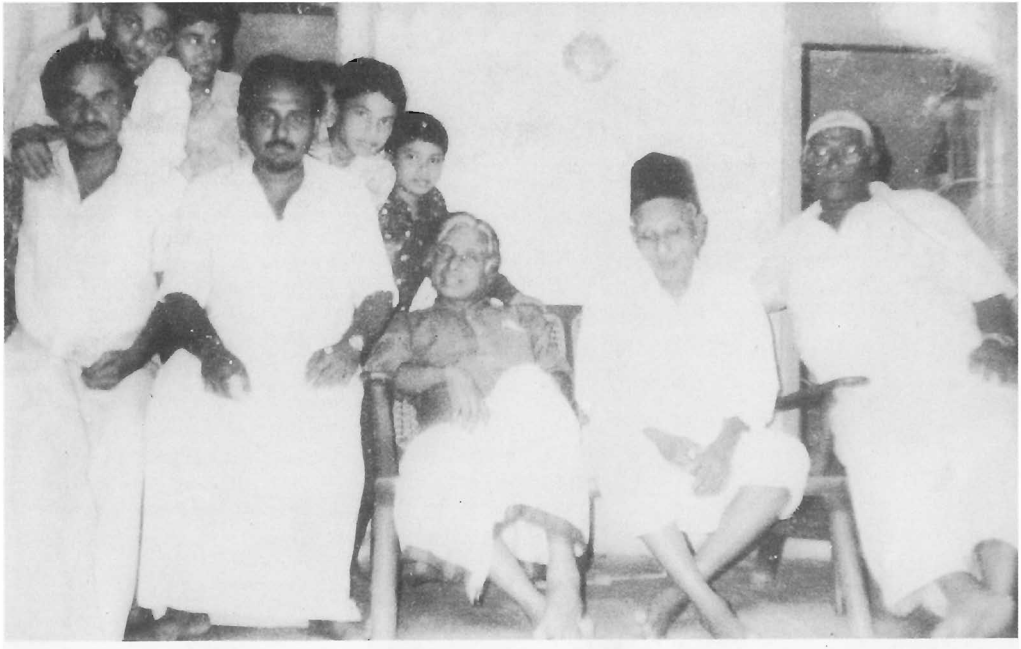

একটি পারিবারিক মিলনমেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামনাথপুরমের শোয়ার্জ হাইস্কুল। এখানে একটি ফলকে লেখা আছে: "দিনগুলি যেন বৃথা না কাটানো হয়, একবার দিন চলে গেলে আর কোনও মূল্যেই তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

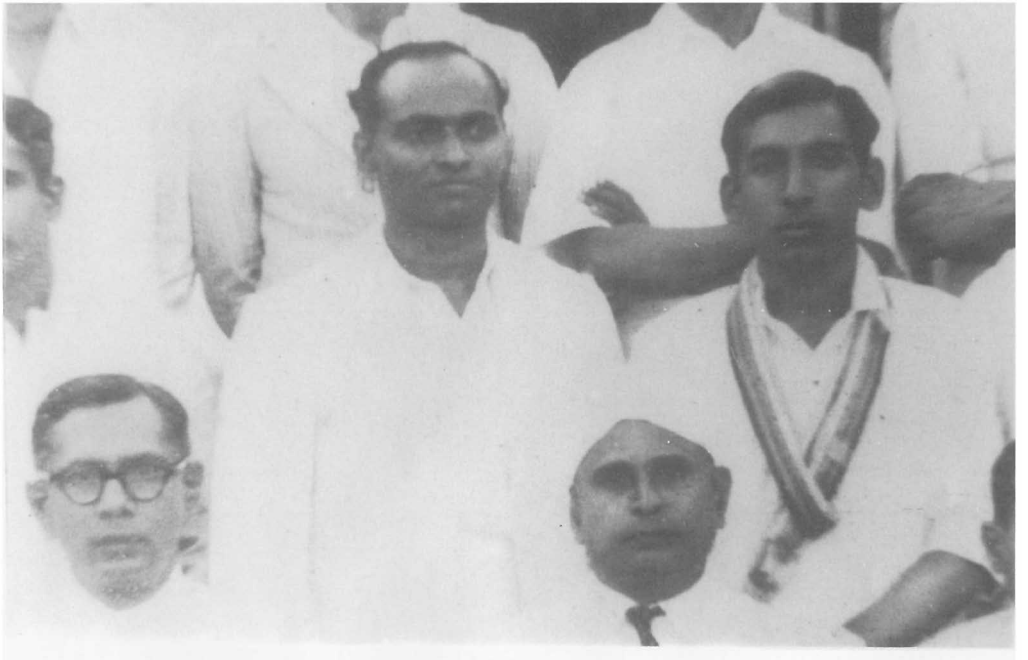

শোয়ার্জ হাইস্কুলে আমার শিক্ষকবৃন্দ: ইয়াদুরাই সলোমন (বাঁদিকে দাঁড়িয়ে) ও রামকৃষ্ণ আয়ার (ডানদিকে বসে)।
একটি ছোট শহরে বাচ্চাদের শেখানোর ব্যাপারে এমন নিবেদিত-প্রাণ জ্ঞানী শিক্ষক বিরল।

অফ টেকনোলজি (MIT)-তে ভর্তির জন্যে দরখাস্ত করলাম। তখনকার দিনে এই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ ভারতে প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হত।

নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এক হাজার টাকার মতো লাগত, এবং অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার বাবার ছিল না। সেই সময়ে আমার বোন জোহ্‌রা আমার পাশে দাঁড়াল। নিজের সোনার চুড়ি এবং গলার হার বাঁধা দিল। আমি যাতে লেখাপড়া শিখতে পারি সে জন্যে তার এই দৃঢ় সংকল্প, আমার শক্তিতে তার এই দৃঢ় আস্থা, এ আমার অন্তর স্পর্শ করল। নিজের রোজগারের টাকায় আমি তার গয়না ছাড়িয়ে নেব, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম। সে সময়ে অর্থ উপার্জনের একটি মাত্র রাস্তা আমার সামনে খোলা ছিল, ভাল করে পড়াশোনা করা, বৃত্তি পাওয়া। জোর কদমে পড়াশোনা করতে লাগলাম।

এম.আই.টি-তে আমার চোখে সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল দুটি অকেজো বিমান। সে দুটি রাখা ছিল বিমানপোতের যে সব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা থাকে (subsystems) সেগুলি ছাত্রদের দেখিয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে। আমি এক অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করতাম সেগুলির দিকে। অন্য ছাত্ররা ছাত্রাবাসে ফিরে যাবার পরে সেগুলির কাছে আমি বসে থাকতাম, পাখির মতো অবাধে আকাশে উড়বার জন্যে মানুষের যে সংকল্প, তার কথা ভাবতে আমার বেশ লাগত। আমার প্রথম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর, বিশেষ একটি শাখা যখন বেছে নেওয়ার সময় এল, প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আমি নির্বাচন করলাম এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিমানচালনা সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা)। আমার লক্ষ্য ততদিনে আমার সামনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: আমি বিমান চালাব। এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই আর ছিল না, যদিও জোর করে আমি কিছু বলতে পারতাম না। তার কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, আমার জন্ম নিম্নবিত্ত পরিবারে। এই সময় নাগাদ আমি বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম। তাতে কিছু কিছু বাধা এল, বিফলতা এল, হতাশা এল, কিন্তু সে সময়ে আমার বাবার কথাগুলো আমার মনে পড়ত "অন্যদেরকে যে জানে সে পণ্ডিত, কিন্তু জ্ঞানী হল সেই যে নিজেকে জানে। জ্ঞান না থাকলে বিদ্যায় কোনও কাজ হয় না।"

এম.আই.টি-তে শিক্ষাকালে আমার চিন্তাভাবনাকে আকার দান করেন তিনজন শিক্ষক। তাঁদের সম্মিলিত অবদানেই আমার পেশাগত জীবনের ভিত্তি আমি পরবর্তী কালে নির্মাণ করেছিলাম। সেই তিনজন শিক্ষক হলেন অধ্যাপক স্পনডার, অধ্যাপক কে. এ. ভি. পাণ্ডালাই, এবং অধ্যাপক নরসিংহ রাও। এঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিত্ব ছিল কিন্তু একটি সহজাত ক্ষমতা তিনজনেরই ছিল, নিজের নিজের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এবং নিরলস উদ্যমের সাহায্যে ছাত্রের বৌদ্ধিক ক্ষুধা মেটানোর ক্ষমতা।

অধ্যাপক স্পনডার আমাকে শিখিয়েছিলেন প্রায়োগিক বায়ুগতিবিদ্যা (technical aerodynamics)। তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়ান। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তাঁর প্রভূত ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাৎসিরা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখে। এই সহজবোধ্য কারণেই, জার্মানদের তাঁর অত্যন্ত অপছন্দ ছিল। প্রসঙ্গত বলি, এরোনটিকাল বিভাগটির প্রধান ছিলেন আর এক জার্মান অধ্যাপক ভাল্টার রিপেন্টিন, অন্য আর একজন খুবই পরিচিত অধ্যাপক ড. কুর্ট টাঙ্ক ছিলেন একজন বিশিষ্ট এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জার্মানির এক-আসনের যুদ্ধবিমান Focke Wulf FW 190-এর নকশা তিনিই করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেটি ছিল শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিমান। পরে ড. ট্যাঙ্ক বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেডস (HAL)-এ যোগদান করেন। এবং ভারতের প্রথম জেট-ফাইটার HF-24 মরুৎ-এর নকশা করার কৃতিত্ব তাঁর।

অসন্তুষ্টির এই সব কারণ সত্ত্বেও অধ্যাপক স্পনডার তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এবং উচ্চ পেশাগত মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তিনি সদা প্রশান্ত থাকতেন, তাঁর কর্মশক্তি সদা অক্ষুণ্ণ থাকত, আচার-আচরণে থাকতেন সর্বদা সংযত, আধুনিকতম প্রযুক্তির সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, এবং আশা করতেন ছাত্ররাও থাকবেন। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার আগে আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, তিনি আমায় বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমার কী হবে না হবে, বা আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা কতটা, তা নিয়ে মাথা ঘামানো কারও উচিত নয়। তার বদলে ভিত্তিটা আগে তৈরি করা বেশি দরকার এবং যে যা নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় তার জন্যে প্রবল আগ্রহ দরকার। অধ্যাপক স্পনডার লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতীয়দের নিয়ে সমস্যা এইখানে নয় যে, তাদের শিক্ষার সুযোগের অভাব আছে, কিংবা শিল্প-পরিকাঠামোর অভাব আছে; তাদের নিয়ে একটা মুশকিল এই যে, বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যটা তারা ঠিক ধরতে পারে না, এবং তারা যে কিছু একটা বেছে নেবে, সেই নির্বাচনের যুক্তিটাও তাদের কাছে পরিষ্কার হয় না। এরোনটিকস কেন? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নয় কেন? মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নয় কেন? ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সব নবীন ছাত্রদের আমি বলতে চাই, বিশেষ কোনও শাখা বেছে নেওয়ার আগে, সর্বাগ্রে ভেবে দেখা প্রয়োজন, তাদের নির্বাচন কি তাদের নিজেদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হচ্ছে?

অধ্যাপক কে. এ. ভি পাওালাই আমাকে শেখালেন কীভাবে বায়ু-যান সংক্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নকশা ও বিশ্লেষণ রচনা (aero-structure design and analysis) করতে হয়। তিনি প্রফুল্ল-চিত্ত, সহৃদয় ও অতি উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন। যে কোনও শিক্ষা-ক্রমে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনত্ব থাকত। অধ্যাপক পাণ্ডালাই নির্মাণ-সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যার (structural engineering) রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছিলেন। আজও আমার বিশ্বাস অধ্যাপক পাণ্ডালাই-এর যারা ছাত্র ছিল তারা সবাই মানবে যে, তাঁর পাণ্ডিত্য ও বৌদ্ধিক সাধুতা ছিল অসাধারণ, কিন্তু অহমিকার লেশ মাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবার স্বাধীনতা তাঁর ছাত্রদের ছিল।

অধ্যাপক নরসিংহ রাও ছিলেন গণিতজ্ঞ। তিনি আমাদের তাত্ত্বিক বায়ুগতিবিদ্যা শিখিয়েছিলেন। তরলগতিবিদ্যা (Fluid dynamics) পড়ানোয় তাঁর পদ্ধতি আমি আজও ভুলিনি। তাঁর ক্লাস করায় প্রায় সব বিষয়ের মধ্যে গাণিতিক পদার্থবিদ্যাই আমার সবচাইতে পছন্দের বিষয় হল। আমাকে প্রায়ই বলা হয়, বায়ুযান সংক্রান্ত নকশার পর্যালোচনা করবার সময়ে আমার হাতে সার্জেনের ছুরির মতো একটা ছুরি থাকত। বায়ুগতি প্রবাহের সমীকরণের প্রমাণ সংগ্রহের বিষয়ে অধ্যাপক রাও-এর অটল পরামর্শ না হলে ওই অলংকার-স্বরূপ অস্ত্রটি আমি হাতে পেতাম না।

বায়ুযান সংক্রান্ত বিজ্ঞান (aeronautics) এক অতিশয় চিত্তাকর্ষক বিষয়। তার মধ্যে নিহিত আছে স্বাধীনতার সম্ভাবনা। স্বাধীনতা এবং পলায়ন, অনির্দিষ্ট সঙ্কল্প এবং নির্দিষ্ট গতি, এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য সেইটাই এই বিজ্ঞানের রহস্য। এই সব সত্য আমার সামনে উদ্ঘাটিত করেন আমার শিক্ষকেরা। তাঁদের সযত্ন শিক্ষায় তাঁরা আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন বায়ুযান সংক্রান্ত বিদ্যা বা এরোনটিকস সম্পর্কে এক প্রবল আগ্রহ। তাঁদের বৌদ্ধিক উদ্দীপনা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং কোনও কাজে চরম উৎকর্ষ লাভে ঐকান্তিক আগ্রহ এমন ছিল যে, তাতে আমিও fluid dynamics-modes of compressible medium motion, development of shock waves and shock, induced flow separation at increasing speeds, shock stall and shock-wave drag-এর বিষয়ে নিবিড় পড়ানোয় উৎসাহ পেলাম।

ধীরে ধীরে আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন তথ্যের এক বিরাট একীকরণ ঘটল। এরোপ্লেনের যে-সব কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য—biplanes, monoplanes, tailless planes, canard configured planes, delta-wing planes—আমি তার মধ্যে নতুন নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেলাম। আমার তিন শিক্ষক, যাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞ, তাঁরা আমাকে সাহায্য করলেন বিবিধ উপাদানের সমন্বয়ে এক অবিমিশ্র জ্ঞানের বিষয়ে নিজেকে গড়ে উঠতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম.আই.টি.-তে আমার তৃতীয় অর্থাৎ অন্তিম বর্ষ ছিল পরিবর্তনের বছর, এবং আমার পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব ছিল অসামান্য। সেই সময়ে রাজনৈতিক নবজাগরণ এবং শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্যমের একটা আবহাওয়া সারা দেশে দেখা দিয়েছিল। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আমায় আবার নতুন করে যাচাই করে নিতে হল, দেখতে হল বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়াতে পারি কি-না। তখন প্রচলিত ধারণা ছিল, জ্ঞানলাভ করতে গেলে একমাত্র বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাই অনুসরণ করতে হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম, তাহলে কি বাস্তবতার শেষ কথা বস্তু? অধ্যাত্ম জগতের যে-সব ঘটনা, সে-সবই কি বস্তুরই নানা রূপে আত্মপ্রকাশ? সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ কি আপেক্ষিক? জ্ঞান এবং সত্যের একমাত্র উৎস কি ইন্দ্রিয় চেতনা? এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম। ভাবতাম "বৈজ্ঞানিক মানসিকতা" এবং আমার নিজের যে-সব আধ্যাত্মিক আগ্রহের বিষয় সে-সব নিয়েও। আমি যে নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বড় হয়েছি সেটা ছিল গভীরভাবে ধর্মীয়। আমাকে শেখানো হয়েছে, প্রকৃত সত্য বাস্তবজগতের ওপারে অবস্থিত, এবং একমাত্র মনোজগতের অভিজ্ঞতা দিয়েই তাকে লাভ করা যায়।

ইতিমধ্যে, আমার শিক্ষাক্রমের কাজ যখন শেষ হল, আমাকে একটি কাজ দেওয়া হল। চারজন সহকর্মীর সহযোগে আমাকে একটি স্বল্প উচ্চতায় ওড়ার আক্রমণ-বিমানের নকশা করতে হবে। এই বিমানের বায়ুগতি-সংক্রান্ত নকশাটি প্রস্তুত করা এবং অঙ্কন করার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম। আমার সহকর্মীরা ভাগ করে নিলেন বিমানের সম্মুখগতি, কাঠামো, নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য যান্ত্রিক-কলকব্জার-র নকশা করার কাজ। একদিন আমার ডিজাইন শিক্ষক, অধ্যাপক শ্রীনিবাসন, যিনি তখন ছিলেন এম.আই.টি-র ডিরেক্টর, আমার কাজের অগ্রগতি দেখে বললেন, আমার অগ্রগতি মোটেই ভাল হয়নি, অসন্তোষজনক। আমি বিলম্বের অনেক অজুহাত দেখালাম, কিন্তু অধ্যাপক শ্রীনিবাসন সে সবে কর্ণপাতই করলেন না। শেষ পর্যন্ত কাজ শেষ করবার জন্যে এক মাস সময় প্রার্থনা করলাম। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে অধ্যাপক বললেন, "দ্যাখো, আজ শুক্রবার বিকেল, আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলাম। যদি সোমবার সকালের মধ্যে তোমার নকশার ড্রয়িং আমি না পাই, তোমার স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে।" আমি হতবাক। ওই বৃত্তিটিই আমার জীবন। ওটি বন্ধ হলে আমার বাঁচবার কোনও পথ থাকবে না। দেখলাম, অধ্যাপকের কথা মতো কাজটা শেষ করা ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় নেই। সারা রাত কাজ করলাম, রাত্তিরের খাওয়া খেলাম না। পরদিন সকালে এক ঘণ্টার মধ্যে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলাম। রবিবারের সকালে আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ মনে হল আমার ঘরে কে যেন এসেছেন। খানিকটা দূর থেকে অধ্যাপক শ্রীনিবাসন আমাকে দেখছিলেন। সদ্য জিমখানা থেকে ফিরেছেন, পরনে তখনও টেনিসের পোশাক। আমার কাজ কী রকম এগোচ্ছে দেখার জন্যে একবার ঘরে ঢুকেছেন। আমার কাজ খুব ভাল করে দেখে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, "আমি জানতাম আমি তোমার ওপর খুব চাপ দিয়েছি, যত তাড়াতাড়ি তোমাকে কাজটা করতে বলেছি সেটা অসম্ভব। এত চাপের মধ্যে যে তুমি এত ভাল কাজ করতে পারবে আমি তা আশা করিনি।"

ওই প্রকল্পের কাজের অবশিষ্ট সময়টাতে আমি একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলাম। এম.আই.টি. তামিল সঙ্গম (সাহিত্য সমিতি) প্রতিযোগিতাটির ব্যবস্থা করেছিল। তামিল আমার মাতৃভাষা এবং তার উদ্ভবের ইতিহাস আমার গর্বের বিষয়। তার পূর্ব-ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা প্রাক-রামায়ণ যুগের ঋষি অগস্ত্য পর্যন্ত পৌঁছে যাই। তার সাহিত্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে চলে আসছে। বলা হয়, এ-ভাষাকে সৃষ্টি করেছেন আইনবিদ এবং বৈয়াকরণেরা। পরিচ্ছন্ন যুক্তিভিত্তিক বিন্যাসের জন্যে পৃথিবী জুড়ে এর সুখ্যাতি। আমি ঐকান্তিক ভাবে চাইতাম যেন বিজ্ঞান এই অপূর্ব সুন্দর ভাষার নাগালের বাইরে না থাকে। তামিল ভাষায় আমি একটি প্রবন্ধ লিখলাম, "আমাদের বায়ুযান আমরাই বানাব", প্রবন্ধটি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আমি প্রতিযোগিতায় জিতলাম। জনপ্রিয় তামিল সাপ্তাহিক *আনন্দ বিকতন*-এর সম্পাদক 'দেবন' আমার হাতে প্রথম পুরস্কার তুলে দিলেন।

এম.আই.টি. সংক্রান্ত যে স্মৃতি আমার অন্তরকে সবচাইতে স্পর্শ করে সেটি হল অধ্যাপক স্পনডারকে নিয়ে। যাঁরা পাশ করে বেরোচ্ছিলেন সেই সমস্ত ছাত্রেরা তিনটি সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন ফোটো তোলাতে। অধ্যাপকেরা মাঝখানে বসেছিলেন। হঠাৎ অধ্যাপক স্পনডার উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলেন। আমি তৃতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি বললেন, "এসে আমার সঙ্গে সামনে বোসো।" তাঁর এই আহ্বানে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। "তুমি আমার সেরা ছাত্র। কঠোর পরিশ্রম করলে ভবিষ্যতে তুমি তোমার অধ্যাপকদের নাম উজ্জ্বল করবে।" এই প্রশংসায় আমি বিব্রত বোধ করছিলাম, কিন্তু সম্মানিতও হলাম। ছবি তুলবার জন্যে আমি অধ্যাপক স্পনডারের পাশে বসলাম। আমাকে বিদায় জানিয়ে সেই প্রতিভাসম্পন্ন আত্মমগ্ন মানুষটি বললেন, "ঈশ্বরের ওপরে আশা রাখ, তিনিই তোমার ভবিষ্যতের পথ আলোকিত করবেন।"

এম.আই.টি. থেকে আমি গেলাম বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এরোনটিকস লিমিটেড-এ (HAL) শিক্ষানবীশ হিসাবে। সেখানে আমি একটা টিমের সঙ্গে এঞ্জিন মেরামতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে নিযুক্ত হলাম। বায়ুযানের এঞ্জিন সমস্ত ভাল করে দেখে মেরামতের কাজ হাতে-নাতে করা, এ খুবই শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। ক্লাসে কোনও তত্ত্ব শিখবার পরে ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতায় যখন দেখি সেই তত্ত্বটিই সমর্থিত হল, তখন মনে মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঠিক যেন, অনেক অচেনা লোকের ভিড়ে একজন পুরনো বন্ধুর দেখা পাওয়া। এই হিন্দুস্থান এরোনটিকস-এ আমি পিসটন (চাপদণ্ড) এবং টারবাইন (ঘূর্ণনযন্ত্র)—দুরকম এঞ্জিনেরই মেরামতির কাজ করলাম। পোড়ানোর পরে গ্যাসের গতি-সংক্রান্ত বিদ্যা এবং প্রসারণ (gas dynamics and diffusion) প্রক্রিয়ার যে কার্যকর নীতি সে-বিষয়ে আমার অস্পষ্ট ধারণাগুলি স্পষ্ট হয়ে গেল, আমি radial engine-cum-drum নিয়ে কাজ করা শিখলাম।

আরও যা-যা শিখলাম তা হল, ক্রাঙ্কশাফ্ট (crankshaft)-এর ব্যবহারজনিত ক্ষয় পরীক্ষা করে দেখতে, এবং সংযোগকারী দণ্ড এবং ক্রাঙ্কশাফ্টের ওঠানামার পর্যবেক্ষণ করতে। জানতে পারলাম super-charged অর্থাৎ অভ্যন্তরে দহনক্ষমতা সম্পন্ন এঞ্জিনের স্থিরভাবে আটকানো (fixed-pitch) পাখাকে জুড়তে। চাপ আর ত্বরণ-ও-গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিষয়, এবং একটি টারবো-এঞ্জিনের এয়ার-স্টার্টার যোগান ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিশদভাবে শিক্ষা পেলাম। প্রপেলার-এঞ্জিনের মুখ পাশে ঘোরানো ও তাকে আবার সোজা করা, উল্টোদিকে ঘোরানো ইত্যাদি ব্যাপার সম্পর্কে শিক্ষাও খুবই চমকপ্রদ হয়েছিল। HAL-এর কারিগরিবিদ্‌দের ব্লেডের কোণ নিয়ন্ত্রণের (*beta*) সূক্ষ্ম কলার বিষয়ে হাতে-কলমে শেখার ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তাঁরা কোনও বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেননি, এবং তাঁদের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারেরা যা বলে দিতেন, তাঁরা যে তাই করতেন তাও নয়। তাঁরা শুধু বছরের পর বছর নিজেদের হাতে কাজ করে গেছেন। তাতেই নিজেদের কাজের ব্যাপারে তাঁদের একটা সহজাত বোধ জন্মে গেছে।

গ্র্যাজুয়েট এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এইচ.এ.এল থেকে বেরোবার সময়ে আমার সামনে দুটি চাকরির মধ্যে একটি বেছে নেবার সুযোগ এল। দুটিই, আমার যে দীর্ঘকালের স্বপ্ন আকাশে উড়বার, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একটি বিমানবাহিনীর, আরেকটি প্রতিরক্ষা দপ্তরে Directorate of Technical Development and Production DTD & P (Air)-এ। আমি দুটিতেই দরখাস্ত করলাম। প্রায় এক সঙ্গে দু-জায়গা থেকেই ইন্টারভিউয়ের ডাক এল। বিমানবাহিনীর নিয়োজিত নিয়োগকর্মীরা আমাকে দেরাদুনে হাজির হতে বললেন, আর DTD & P (Air) বলল দিল্লি যেতে। করোমণ্ডল উপকূলের তরুণটি উত্তরের ট্রেন ধরল। ২০০০ মাইল দূরে তার গন্তব্যস্থল। মাতৃভূমির বিশালতার সঙ্গে সেই প্রথম আমার পরিচয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়ে দেখছি, দূরে সাদা ধুতি আর পাগড়ি পরে পুরুষেরা আর নারীরা উজ্জ্বল রঙিন শাড়ি পরে সবুজ ধানের ক্ষেতে কাজ করছে। মনে হচ্ছে তারা কোনও সুন্দর ছবিতে আঁকা। আমি জানালার ধারে যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। সবাইকে মনে হচ্ছে এমনভাবে কাজ করছে যেন একটা ছন্দ, একটা প্রশান্তি বিরাজ করছে তাদের কাজ ঘিরে। পুরুষেরা গোরু-মোষের পাল নিয়ে যাচ্ছে, নারীরা নদী থেকে জল আনছে। মাঝে মাঝে কোনও শিশু ট্রেনের দিকে হাত নাড়ছে।

উত্তরের দিকে যাওয়ার সময়ে বাইরের দৃশ্য কেমন বদলে যায়, দেখলে অবাক লাগে। গঙ্গা আর তার যত উপনদীর উর্বর শস্যশালিনী উপত্যকা ডেকে এনেছে বাইরে থেকে আক্রমণ অশান্তি-উপদ্রব, আর পরিবর্তন। ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গৌরবর্ণ আর্যরা সুদূর উত্তর-পশ্চিম থেকে গিরিবর্ত্ম দিয়ে এসে পড়ল। দশম শতাব্দীতে এল মুসলিমরা। তারা পরে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হল। এক সাম্রাজ্য গেল, আরেক সাম্রাজ্য এল। এক ধর্মের মানুষ গিয়ে আরেক ধর্মের মানুষের রাজ্য জয় করে নেওয়া, এ চলতেই থাকল। সেই সময়ে কর্কটক্রান্তি রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ভারত বিন্ধ্য এবং সাতপুরা পর্বতমালার আড়ালে থেকে এই উপদ্রব এড়িয়ে গেল। নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, এই সব নদী ভারতীয় উপমহাদেশের জন্যে এক দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা রচনা করেছিল। আমাকে দিল্লি নিয়ে আসতে আমার ট্রেনটিকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সাহায্য নিয়ে এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব বাধা অতিক্রম করতে হল।

বিরাট সুফি পীর হজরত নিজামুদ্দিনের শহর দিল্লিতে আমি একদিন থেকে গেলাম, DTD&P (Air)-এ ইন্টারভিউ দিলাম। আমার ইন্টারভিউ ভাল হল। প্রশ্ন সবই ছিল যেমন হওয়ার কথা, আমার যে-বিষয়ে যা জ্ঞান, তাকে কোনও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল না। তারপর রওনা হলাম দেরাদুন, বিমান বাহিনীর (এয়ারফোর্স সিলেকশান বোর্ড) ইন্টারভিউয়ের জন্যে। এই বোর্ডে মেধার চাইতে "ব্যক্তিত্ব"-র ওপরেই জোর দেওয়া হল বেশি। সম্ভবত তাঁরা শারীরিক সক্ষমতা এবং কথাবার্তা বলার ক্ষমতাই চাইছিলেন। আমার উৎসাহ যথেষ্ট ছিল কিন্তু আমি নার্ভাস ছিলাম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল কিন্তু দুশ্চিন্তাও ছিল, নিজের ওপর আস্থা ছিল, কিন্তু উৎসাহও ছিল। আটজন অফিসারকে নিয়োগ করার জন্যে যে পঁচিশ জনকে পরীক্ষা করা হল তাদের মধ্যে আমার স্থান হল নবম। অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম আমি। বিমানবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ যে আমার হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, সেটা বুঝতেই আমার বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। নির্বাচক বোর্ডের সামনে থেকে কোনও রকমে নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে এসে হ্রদের উঁচু পাড়ের প্রান্তে দাঁড়ালাম। অনেক নীচে হ্রদ দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম, আমার সামনে কঠিন সময়। পেতে হবে অনেক প্রশ্নের উত্তর আর এর পর কী করব তাও ভাবতে হবে। পায়ে হেঁটে হৃষিকেশ পৌঁছলাম।

AMARBOI.COM

গঙ্গায় স্নান করলাম। কী আনন্দ সেই নিষ্কলুষ জলে! জল থেকে উঠে হেঁটে গেলাম শিবানন্দ আশ্রমে। আশ্রমটি একটু ওপরে উঠে। সেখানে প্রবেশ করবার সময়েই আমি প্রবল একটা অনুকম্পন অনুভব করলাম। দেখলাম, চারিদিকে কত সাধু সমাধিমগ্ন। আমি পড়েছিলাম সাধুরা অতীন্দ্রিয় বোধসম্পন্ন। তাঁরা স্বতই অনেক কিছু জানতে পারেন। আমার বিষাদাপন্ন মানসিক অবস্থায়, আমি আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর চাইছিলাম।

স্বামী শিবানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দেখতে বুদ্ধর মতো, পরনে তুষারশুভ্র ধুতি, পায়ে খড়ম। গায়ের বর্ণ জলপাইয়ের মতো, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, তাঁর হাসি মন হরণ করে শিশুর হাসির মতো। তাঁর ব্যবহার সুষমামণ্ডিত। আমি স্বামীজিকে নিজের পরিচয় দিলাম। আমার মুসলিম নামে তাঁর কোনও ভাবান্তর হল না। আমি তাকে কিছু বলবার আগেই তিনি আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমার দুঃখের কথা তিনি কী করে জানালেন, সে-বিষয়ে কিছু বললেন না।

ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যে আমি যোগ দিতে পারলাম না, আমার আকাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছিলাম কেউ পান চিবিয়ে ওয়াজির আলি শাহের অনুকরণ করছেন; আবার বাঙ্গালোরে দেখেছি কেউ সাহেবি কায়দায় কুকুর নিয়ে বেরিয়েছেন। এখানেও আমার মনে রামেশ্বরমের প্রশান্তি এবং গভীরতার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগল। আমাদের শহরের এই যে দ্বিধা-বিভক্ত চেতনা ও অনুভূতি, এর ফলে সাধারণ ভারতীয়ের হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে যে ভারসাম্য, সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সন্ধ্যাবেলাটা আমি কাটাতাম বাঙ্গালোরের সব বাগান এবং কেনাকাটার কেন্দ্রগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে।

এ.ডি.ই-তে আমার প্রথম বছর কাজের চাপ বিশেষ ছিল না। বস্তুত প্রথম প্রথম আমাকে নিজের কাজ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হত। তারপর আস্তে আস্তে কাজের গতি বাড়তে লাগল। Ground-handling equipment সম্বন্ধে আমার যে প্রাথমিক পড়াশোনা ছিল, তার ভিত্তিতে একটি কর্মীগোষ্ঠী তৈরি করা হল, ground equipment machine (GEM) হিসাবে একটি স্বদেশে নির্মিত হোভারক্রাফট-এর নকশা ও পরিণত রূপদানের জন্যে। টিমটি ছোটই ছিল। তাতে সায়েন্টিফিক অ্যাসিসট্যান্ট স্তরের চারজন সদস্য ছিলেন। এ.ডি.ই.-র ডিরেকটর ড. ও. পি. মেডিরাট্টা আমাকে বললেন সেই টিমের নেতৃত্ব দিতে। সেই ইঞ্জিনিয়ারিং মডেলটিকে আকাশে ওড়ানোর জন্যে প্রস্তুত করে দিতে আমাদেরকে সময় দেওয়া হল তিন বছর।

এই প্রকল্পটি যেভাবেই দেখুন, আমার সম্মিলিত সাধ্যের তুলনায় একটু বেশিই বড় ছিল। আমাদের মধ্যে কারওরই মেশিন তৈরির অভিজ্ঞতা ছিল না, ওড়ার মেশিনের কথা তো ছেড়েই দিন। যা নিয়ে কাজ শুরু করব এ-রকম কোনও নকশা, কিংবা উচ্চমানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও ছিল না। আমরা শুধু জানতাম, আমাদের বাতাসের-চেয়ে-ভারী একটি উড়ানযন্ত্র নির্মাণে সফল হতে হবে। হোভারক্রাফট সম্বন্ধে যা কিছু পাওয়া যায় পড়ে নেওয়ার আমরা চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান আছে, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তেমন কাউকে পেলাম না। তথ্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই কাজে এগোব বলে একদিন ঠিক করলাম।

একটি ডানাহীন, লঘুভার ও দ্রুতগামী বিমান নির্মাণের এই প্রচেষ্টা আমার মনের জানালাগুলো খুলে দিল। হোভারক্রাফট এবং এয়ারক্রাফট-এর প্রতি একটি সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে আমার দেরি হল না। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম এরোপ্লেন তো বানিয়েছিলেন সাত বছর ধরে সাইকেল মেরামত করবার পর! জি.ই.এম প্রকল্পের মধ্যে আমি দেখলাম উদ্ভাবনী বুদ্ধি এবং বিকাশের এক বিরাট সুযোগ। কয়েক মাস নকশা করার কাজের পরেই আমরা সোজা চলে গেলাম যন্ত্রপাতির বিভাগে।

তবে একটা বিপদ সব সময়েই থাকে। যে যে-রকম পটভূমি থেকে উঠে এসে

থাকে গ্রাম কিংবা ছোট শহর, মধ্যবিত্ত, যার বাবা-মা হয়তো তেমন শিক্ষিত নন, সে একটি কোণের মধ্যে গুটিয়ে যেতে পারে এবং প্রাণপণে চেষ্টা করে যেতে পারে তার মধ্যে থেকেই কোনও রকমে টিকে থাকবার লড়াই চালিয়ে যেতে, যদি না ঘটনাচক্রে বৃহৎ কোনও পরিবর্তন অনেক অনুকূল অবস্থায় নিয়ে এসে হাজির করে। আমি জানতাম নিজের সুযোগ আমাকে নিজেকেই সৃষ্টি করে নিতে হবে!

একটু একটু করে, পর্যায়ক্রমে, একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে আমাদের কাজ এগোতে লাগল। এই প্রকল্পে কাজ করে আমি জানতে পারলাম, একবার মনটা নতুন কোনও চিন্তা অনুযায়ী তৈরি হয়ে গেলে সে আর পুরনো আকৃতিতে ফিরে যায় না।

সে-সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন। আমাদের ক্ষুদ্র প্রকল্পটির অগ্রগতিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি এর মধ্যে দেখেছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের স্বদেশি উৎপাদনের সূত্রপাত। তিনি যখনই বাঙ্গালোরে আসতেন, একটু সময় করে নিয়ে আমাদের প্রকল্পের অগ্রগতি দেখে যেতেন। আমাদের কর্মক্ষমতায় তাঁর আস্থা আমাদের উদ্দীপিত করত। আমি কর্মশালায় প্রবেশ করবার সময়ে আমার অন্য সব সমস্যা বাইরে রেখে যেতাম। ঠিক যেমন আমার বাবা নমাজের জন্যে মসজিদে ঢুকবার সময়ে জুতো বাইরে খুলে রাখতেন।

কিন্তু জি.ই.এম. সম্পর্কে কৃষ্ণ মেননের মত সকলে মানতে পারেননি। যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য সামগ্রী যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই কাজ করতে পারি কিনা, এ-ব্যাপারে আমাদের এই পরীক্ষায় উচ্চতর পদস্থ সহকর্মীরা ঠিক যে খুশি হলেন, তা নয়। অনেকে এমন কথাও বললেন যে, আমরা এক দল ছিটগ্রস্ত মানুষ যারা অসম্ভবের স্বপ্নের পিছনে ছুটছি। "কুলির" সর্দার হিসাবে আমার পিছনে লাগতেই মজা বেশি ছিল। আমি যেন ছিলাম এক "গেঁয়ো ভূত", যে মনে করে আকাশে উড়ে বেড়ানোই তার কাজ। আমি মাত্রাতিরিক্ত আশাবাদী। তাদের বিরূপ মনোভাব, আমার মনোবল আরও বাড়িয়ে দিল। এ.ডি.ই-র কোনও কোনও বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীর মন্তব্যে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ-কবিতা আমার মনে পড়ে গেল। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন জন টাউব্রিজ:

... with thimble and thread
And wax and hammer, and buckles and screws,
And all such things as geniuses use;—
Two bats for patterns, curious fellows!
A charcoal-pot and a pair of bellows.

প্রকল্পের কাজ বছরখানেক চলার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (তিনি নিয়মিত আসতেন)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ.ডি.ই-তে এলেন। আমি তাঁকে সঙ্গে করে আমাদের কর্মশালায় নিয়ে গেলাম। টেবিলের ওপর জি.ই.এম-এর মডেলটি ছিল, তার অংশগুলি তখনও জোড়া দেওয়া হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে একটি কার্যকর হোভারক্রাফট নির্মাণের জন্য আমাদের যে এক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, এই মডেলটি তারই পরিণতির প্রতিভূ স্বরূপ। মন্ত্রী একটার পর একটা প্রশ্ন বন্দুকের গুলির মতো আমার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আগামী বছরের মধ্যেই সমজাতীয় আকৃতির বায়ুযানটি পরীক্ষামূলক উড়ানে যেন যেতে পারে, সে বিষয়ে তিনি বদ্ধ-পরিকর হতে চান। তিনি ড. মেডিরাট্টাকে বললেন, "কালামের এখন যে-সব যন্ত্রপাতি আছে, তাতে GEM-এর উড়ান সম্ভব।"

শিবের বাহনের নাম অনুসারে হোভারক্রাফট-এর নামকরণ হল "নন্দী"। গঠনগত দিক থেকে সমজাতীয় আকৃতির বায়ুযান হিসাবে তার অবয়বের সৌষ্ঠব ইত্যাদি ছিল আমাদের প্রত্যাশার অতীত। যে পরিকাঠামো আমরা পেয়েছিলাম তা ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। সহকর্মীদের আমি বললাম, "এই যে হোভারক্রাফটি, এটি কোনও ছিটগ্রস্ত মানুষদের তৈরি নয়, দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি। এটি শুধু তাকিয়ে দেখবেন না, কারণ এটা শুধু দেখবার জন্যে তৈরি করা হয়নি, এতে চেপে উড়বার জন্যে তৈরি হয়েছে।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে যে অফিসারেরা এসেছিলেন, তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁরা আপত্তি করেছিলেন। সে আপত্তি অগ্রাহ্য করে মন্ত্রী "নন্দী"তে চেপে উড়লেন। একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তার বেশ কয়েক হাজার ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল। আমার মতো একজন অনভিজ্ঞ অসামরিক চালকের সঙ্গে উড়তে গিয়ে মন্ত্রী যাতে বিপদে না পড়েন, সেই দুশ্চিন্তায় তিনি নিজে যন্ত্রটি ওড়াতে চাইলেন। তিনি হাত নেড়ে আমাকে ইশারা করলেন, যন্ত্রটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, যন্ত্রটি ওড়াতে আমি সক্ষম। কাজেই আমি মাথা নেড়ে আমার অস্বীকৃতি জানালাম। আমাদের মধ্যে এই নির্বাক বাক্যবিনিময় দেখে, মন্ত্রী সেই অপমানজনক ইঙ্গিত হেসে নাকচ করে, আমাকে ইশারা করলেন যন্ত্রটি ওড়াতে। তিনি খুব খুশি। বললেন, "আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, হোভারক্রাফট নির্মাণের যে সব মৌলিক সমস্যা সেগুলোর সমাধান হয়ে গেছে। এর চেয়ে শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরির কাজে লেগে পড়ুন, তারপর আমাকে আবার ওড়বার জন্যে ডাকুন।" সেই সন্দিগ্ধ গ্রুপ ক্যাপ্টেন (এখন এয়ার মার্শাল) গোলে পরে আমার খুব ভাল বন্ধু হন।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমাদের প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমরা পেলাম একটি কার্যকর হোভারক্রাফট, ৫৫০ কিলোগ্রাম ওজন-সহ সেটি প্রায় ৪০ মিলিমিটারের

AMARBOI.COM

হাওয়ার গদির (air-cushion) ওপর চলতে পারে (তার নিজের ওজন ধরে)। ড. মেডিরাট্টা যে খুবই খুশি, তা তাকে দেখেই বোঝা গেল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ মেনন মন্ত্রিত্ব হারিয়েছেন, এবং দ্বিতীয়বার তাতে ভ্রমণের জন্যে তিনি আর আসতে পারেননি। পরিবর্তিত অবস্থায় স্বদেশে নির্মিত হোভারক্রাফটের সামরিক ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর স্বপ্নের অংশীদার বেশি ছিল না। বস্তুত আজও আমরা হোভারক্রাফট আমদানি করি। প্রকল্পটি বাদানুবাদের পাঁকে আটকে গেল এবং শেষ পর্যন্ত শিকেয় তোলা হল। আমার কাছে সে ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এত দিন পর্যন্ত আমি ভাবতাম আমাদের সামনে বাধাবন্ধনহীন অসীম সম্ভাবনা। এখন মনে হল একটা বেশ বড় সীমাবদ্ধতা আছে। জীবনে অনেক সীমারেখা থাকে। কতটা ওজন তুলতে পারব তার সীমা আছে; কত দ্রুত শিখতে পারি তার সীমা আছে; কত পরিশ্রম করতে পারি তার সীমা আছে, কত দূর যেতে পারি তারও সীমা আছে।

বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হতে আমার অনীহা ছিল। সমস্ত মন প্রাণ আমি "নন্দী"র নির্মাণে ঢেলে দিয়েছিলাম। এ কথা আমার মাথাতেই আসেনি যে তাকে ব্যবহার করা হবে না। আমার আশাভঙ্গ হল, মোহভঙ্গ হল। এই অনিশ্চয়তার সময়ে, যখন মনে হচ্ছিল সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, বাল্যের নানা স্মৃতি আমার মনে ভিড় করতে লাগল। আবার একবার নতুন অর্থ নিয়ে এল তারা জীবনে।

পক্ষী শাস্ত্রী মাঝেমাঝেই বলতেন, "সত্যকে জানো, সত্য তোমাকে মুক্তি দেবে।" যেমন বাইবেলে আছে, "চাও, তা হলে পাবে।" তাই হল, তবে তৎক্ষণাৎ নয়, কিছুদিন পরে। একদিন ড. মেডিরাট্টা আমায় ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের হোভারক্রাফটের কী খবর? সে উড়বার জন্যে একদম তৈরি শুনে তিনি বললেন, আগামী কাল একজন অত্যন্ত মান্য অতিথি আসছেন, তার জন্যে আমাকে সেই হোভারক্রাফটের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে আমি যতদূর জানতাম তা হল, পরের সপ্তাহে কোনও ভি. আই. পি-র আসবার কথা ছিল না। সে যাই হোক, ড. মেডিরাট্টার নির্দেশ আমি আমার সহকর্মীদের জানালাম। একটা নতুন আশার হাতছানি দেখা দিল আমাদের সামনে।

পরদিন ড. মেডিরাট্টা একজন অতিথিকে আমাদের হোভারক্রাফট দেখাতে নিয়ে এলেন। এক দীর্ঘকায় সুদর্শন ব্যক্তি, মুখে দাড়ি। যন্ত্রটি সম্পর্কে তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, নৈর্ব্যক্তিকতা অসাধারণ বলে আমার মনে হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওতে আমাকে একটু চড়াতে পারেন?" তাঁর অনুরোধ শুনে খুব আনন্দ হল আমার। এত দিনে তাহলে একজনকে পেলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কাজে যাঁর আগ্রহ আছে।

হোভারক্রাফটে আমরা দশ মিনিট চড়লাম, ভূমি থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উঠে। আমার নিজের সম্পর্কে অতিথি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, তাঁকে হোভারক্রাফটে চড়াবার জন্যে ধন্যবাদ দিলেন, তারপর বিদায় নিলেন। এই বিদায়ের ঠিক আগে তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি হলেন অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR)-এর ডিরেক্টর। এক সপ্তাহ বাদে আমি একটি ইন্টারভিউয়ের ডাক পেলাম ইন্ডিয়ান কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (INCOSPAR)-এর কাছ থেকে, রকেট ইঞ্জিনিয়ার-এর পদের জন্যে। সেই সময়ে INCOSPAR সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতাম না যে, ভারতে মহাকাশ গবেষণার জন্যে মুম্বাই-এর TIFR-এর মধ্যে থেকে বিজ্ঞানীদের নিয়ে সেটি গঠিত।

ইন্টারভিউয়ের জন্যে মুম্বাই গেলাম। সেখানে কী ধরনের প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আমি ঠিক জানতাম না। তার জন্যে একটু পড়াশোনা করে নেব কিংবা এ বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা আছে এমন কারও সঙ্গে কথা বলার মতো সময়ও হাতে ছিল না। *ভগবদগীতা* থেকে লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর আবৃত্তি যেন আমার কানে বাজতে লাগল:

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

৭।২৭-২৮

[ইচ্ছাদ্বেষাদি অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় হইতে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমুদ্ভূত হয়। এই দ্বন্দ্বজাত মোহ প্রাণীর প্রজ্ঞাকে স্ববশীভূত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। এই মোহদ্বারা প্রাণিগণ উৎপত্তি কালে অভিভূত হয়। সেইজন্য পরমার্থ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রতিবদ্ধ জ্ঞান লইয়াই প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু যে-সকল পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা সুখ-দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-নিমিত্তক মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত আমার ভজনা করেন।]

নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম, জিততে গেলে সবচেয়ে ভাল হয় যদি জেতার প্রয়োজন না থাকে। সহজ হয়ে থাকলে, সন্দেহ-পীড়িত না হলে, তবেই নিজের কাজ সবচেয়ে ভাল হয়। মনে মনে ঠিক করলাম, যখন আসবে তার মুখোমুখি হব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন যে এলেন, আমি যে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেলাম— এর কিছুই আমি করিনি। কাজেই এর পর যা হবে তার জন্যেও আমার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।

আমার ইন্টারভিউ নিলেন ড. বিক্রম সারাভাই, এবং তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন ও অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন-এর ডেপুটি সেক্রেটারি মি. সরাফ। ঘরে ঢুকবার সময়ে আমি তাঁদের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা যেন অনুভব করতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার এও মনে হল যে, ড. সারাভাই কী প্রাণবন্ত। একজন তরুণ প্রার্থী, যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তার সঙ্গে কথা বলবার সময়ে যাঁরা ইন্টারভিউ নেন তাঁদের যে হামবড়া ভাব, যে মুরুব্বিয়ানার ভাব সচরাচর দেখা যায় তার লেশমাত্র আমি দেখলাম না। আমি কী জানি, না জানি, কী পারি, না পারি, তা নিয়ে ড. সারাভাই প্রশ্ন করলেন না, তিনি দেখতে চাইলেন আমার মধ্যে কী কী সম্ভাবনা নিহিত আছে। মনে হল বৃহত্তর কোনও কিছুর কথা মাথায় রেখেই তিনি আমাকে দেখছেন। মনে হল সমস্ত সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা সামগ্রিকভাবে একটা সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে একজন বৃহত্তর মানুষের বৃহত্তর স্বপ্ন আমার স্বপ্নটিকে আলিঙ্গন করে আছে।

আমাকে দু-দিন থেকে যেতে বলা হল! যাই হোক, পর দিনই জানলাম আমি নির্বাচিত হয়েছি। রকেট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে INCOSPAR-এ আমাকে ঢুকিয়ে নেওয়া হবে। আমার মতো একজন তরুণের পক্ষে এ যে এক স্বপ্নপূরণ!

TIFR-এর কম্পিউটার সেন্টারে একটি অবহিতকরণ শিক্ষাক্রমের (famliarization course) কাজ দিয়ে INCOSPAR-এ আমার যাত্রা আরম্ভ হল। এখানকার বাতাবরণ DTD&P (Air)-এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কার পদের কী নাম তাতে কিছু আসে যায় না। নিজের হয়ে সাফাই গাইবার কারও দরকার হয় না, বিষদৃষ্টিতে কেউ কাউকে দেখে না।

১৯৬২-র শেষার্ধের কোনও এক সময়ে INCOSPAR মনস্থ করল একটি বিষুবীয় রকেট-উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপন করবে, থুম্বা নামে এক কর্মকোলাহলহীন ক্ষুদ্র মৎসজীবীদের গ্রামে। গ্রামটি কেরালার ত্রিবান্দ্রমের (এখন তিরুবনন্তপুরম) কাছে। আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির ড. চিটনিস উপযুক্ত স্থান হিসাবে গ্রামটিকে বেছেছিলেন। তার কারণ জায়গাটি পৃথিবীর চুম্বকীয় নিরক্ষরেখার খুব কাছে। এইভাবে বিনা আড়ম্বরে ভারতে রকেট-ভিত্তিক গবেষণার সূচনা হল। থুম্বাতে যে জায়গাটি বেছে নেওয়া হল সেটি রেল লাইন এবং সমুদ্রতটের মধ্যবর্তী আড়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিলোমিটার বিস্তৃত, ৬০০ একর পরিমিত। এই এলাকার মধ্যে একটা বড় গির্জা ছিল। তার জমিটি অধিগ্রহণ করতে হল। ব্যক্তিগত, কিংবা বেসরকারি মালিকের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করা সব সময়েই দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ, বিশেষত কেরালার মতো ঘনবসতির জায়গায়, উপরন্তু ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ জমি নেওয়ার ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। এই কাজটি অত্যন্ত নিপুণভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং দ্রুত সমাধা করলেন ত্রিবান্দ্রামের তৎকালীন কালেক্টর কে. মাধবন নায়ার, তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন রাইট রেভারেন্ড ড. ডেরিরা, যিনি তখন (১৯৬২-তে) ত্রিবান্দ্রমের বিশপ ছিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডেভেলপমেন্ট (CPWD)-এর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আর. ডি. জন জায়গাটির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। থুম্বা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম কার্যালয়টির স্থান হল সেন্ট মেরি মাগডালেন গির্জায়, এর উপাসনা কক্ষে বসল আমার প্রথম পরীক্ষাগার, বিশপের কামরা হল আমার নকশা এবং অঙ্কনের কার্যালয়। আজও পর্যন্ত গির্জাটি তার পূর্ণ গরিমায় বিরাজমান। আর এখন সেখানে স্থাপিত ভারতীয় মহাকাশ বিষয়ক যাদুঘর।

এর খুব অল্প দিন পরেই আমাকে ছ মাসের জন্যে আমেরিকা যেতে বলা হল, ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (NASA)-এ সাউন্ডিং রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশনের মানের একটি শিক্ষাক্রমের জন্যে। বিদেশযাত্রার আগে আমি কিছুদিনের ছুটি নিয়ে রামেশ্বরম গেলাম। আমার সামনে যে-সুযোগ এসেছে তার কথা শুনে আমার বাবা খুব খুশি হলেন। আমাকে তিনি মসজিদে নিয়ে গেলেন, এবং একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক বিশেষ নমাজ—'শুকরানা নমাজের' ব্যবস্থা করলেন। আমি বোধ করলাম, একটি ঐশী শক্তি আমার বাবা থেকে আমার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাচ্ছে। আমরা সবাই সেই নমাজের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

আমার বিশ্বাস প্রার্থনার একটি বিশেষ উপযোগিতা এই যে, তাতে মানুষের মধ্যে সৃজনাত্মক চিন্তা উদ্দীপিত হয়। সার্থক জীবন যাপনের জন্যে যা যা সম্পদ প্রয়োজন তার সবই মনের মধ্যে বিদ্যমান। চেতনার মধ্যে নিহিত থাকে চিন্তাভাবনা। সে-সব চিন্তাভাবনা মুক্তি পেলে, বাড়বার সুযোগ এবং ক্ষেত্র পেলে, বাস্তব রূপ পেলে, সাফল্য এনে দিতে পারে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে, ব্যক্তিত্বের মধ্যে শক্তি এবং ক্ষমতার বিরাট সম্ভাবনা রেখে দিয়েছেন। প্রার্থনার সাহায্যে আমরা সেইসব শক্তিকে বিকশিত করতে পারি, কাজে লাগাতে পারি।

আহমেদ জালালুদ্দিন এবং সামসুদ্দিন আমাকে বিদায় জানাতে মুম্বাই বিমানবন্দরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলেন। মুম্বাইএর মতো বড় শহরের অভিজ্ঞতা তাঁদের সেই প্রথম, ঠিক যেমন আমি যাচ্ছি নিউ ইয়র্কের মতো বড় শহরের অভিজ্ঞতা প্রথম লাভ করতে। জালালুদ্দিন এবং সামসুদ্দিন, এই দুজন মানুষ ছিলেন আত্মনির্ভরশীল, আশাবাদী। তাঁরা যে কাজে হাত দিতেন, জানতেন তা সফল হবে। আমার মনের গভীরে যে সৃজন ক্ষমতা, তা আমি পেয়েছিলাম এই দুজনের কাছ থেকে। আমার ভাবের উচ্ছ্বাস আমি সামলাতে পারছিলাম না, বুঝতে পারছিলাম আমার চোখ ভিজে উঠছে। তখন জালালুদ্দিন বললেন, "আজাদ, আমরা চিরদিন তোমায় ভালবাসি। তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। চিরদিন আমরা তোমার জন্যে গর্ব অনুভব করব।" তাঁদের বিশ্বাসের গভীরতা ও বিশুদ্ধতা আমার সংযমের শেষ বাঁধটিও ভেঙে দিল। দু-চোখ জলে ভরে উঠল আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

সৃজন

[১৯৬৩ - ১৯৮০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

আমার কাজ আরম্ভ করলাম NASA-তে—ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটনে অবস্থিত ল্যাংলে গবেষণা কেন্দ্রে (LRC) । প্রধানত সেটি উচ্চতর মহাকাশ প্রযুক্তির গবেষণা ও বিকাশ (R&D) কেন্দ্র। LRC সম্পর্কে আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে যা-যা উজ্জ্বল হয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হল একটি মূর্তি, একটি রথ, তাতে দুটি ঘোড়া এবং ঘোড়াদুটিকে চালনা করছে একজন রথারোহী। একটি ঘোড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতীক, দ্বিতীয়টি প্রযুক্তিগত বিকাশের। গবেষণা ও বিকাশের মধ্যে যে যোগসূত্র, এ যেন তারই রূপকল্প।

এল.আর.সি থেকে আমি গেলাম মেরিল্যান্ড-এর গ্রিনবেল্ট-এ গোদারদ্ মহাকাশ যাত্রা কেন্দ্রে (Goddard Space Flight Centre)। নাসা-র যত পৃথিবী পরিক্রমাকারী বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োগসংক্রান্ত উপগ্রহ, তার অধিকাংশই এই কেন্দ্র থেকে নির্মিত ও পরিচালিত হয়। নাসা-র যত মহাকাশ যাত্রা তার চলাচলের সামগ্রিক কাজকর্ম (tracking network) পরিচালিত হয় এখান থেকে। এখানে শেষের দিকে আমি ভার্জিনিয়ার ইস্ট কোস্টের ওয়ালপস দ্বীপে Wallops Flight Facility-তে গিয়েছিলাম, এই জায়গাটি 'নাসা'র (NASA) কেন্দ্র। এখানে রিসেপশন লবিতে আমি দেখলাম, লোকের চোখে পড়বার মতো করে রাখা আছে একটি ছবি। তাতে আছে একটি যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, পিছনে কয়েকটি রকেট উড়ছে। একটি উড়ানকেন্দ্রে (Flying Facility) এই ধরনের ছবি থাকা খুবই সাধারণ ব্যাপার হওয়া উচিত। কিন্তু এই ছবিটি যে বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার কারণ যে-সব সৈনিকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকেটগুলো উৎক্ষেপণ করছিলেন তাঁরা শ্বেতাঙ্গ নন, অশ্বেতকায়, তাঁদের মুখাবয়ব দক্ষিণ এশিয়ার লোকের মতো। একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে আমি ছবিটির কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখি, টিপু সুলতানের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করছে ব্রিটিশদের সঙ্গে। যে ঘটনাটি চিত্রিত হয়েছে, টিপু সুলতানের নিজের দেশে সেটি বিস্মৃত হলেও ভূ-মণ্ডলের আরেক দিকে তার স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। একজন ভারতীয়কে 'নাসা' এইভাবে যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন বীর হিসেবে উচ্চাসনে বসিয়েছে দেখে আমার ভাল লাগল।

আমেরিকার লোকেদের সম্পর্কে আমার যা ধারণা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে পারি: "যা কষ্টকর তা থেকেই শিক্ষা পাই।" আমি উপলব্ধি করলাম এ দেশের মানুষ তাদের সমস্যাগুলিকে সামনা সামনি মোকাবিলা করে। তারা সেগুলোকে এড়িয়ে যায় না। বরং সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করে।

আমার মা একবার আমাকে আমাদের পবিত্র গ্রন্থ থেকে একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন। মনুষ্য সৃষ্টি করবার পর ঈশ্বর আদমের আগে দেবদূতদের বলেছিলেন তার সামনে প্রণত হতে। সকলেই তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, একমাত্র ইবলিস (শয়তান) তাতে রাজি হল না। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কেন প্রণত হলে না?" শয়তান যুক্তি দেখাল, "আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, আর আদমকে মাটি দিয়ে। তাহলে আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নই?" ঈশ্বর বললেন, "স্বর্গোদ্যান থেকে দূর হও। তাচ্ছিল্যপূর্ণ আত্মাভিমানের এখানে স্থান নেই।" শয়তান সে আদেশ পালন করল, কিন্তু যাবার আগে আদমকে অভিশাপ দিয়ে গেল, তারও সেই একই দশা হবে। শিগ্‌গিরই আদমও একই পথ অনুসরণ করল নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে। আল্লাহ বললেন, "বিদায় হও, তোমার বংশধররা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জীবন যাপন করুক।"

যে কারণে কোনও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করা কঠিন হয়, সেটা হল ঠিক এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ আত্মাভিমানেরই ব্যাপকতা। এরই দরুন আমরা আমাদের চেয়ে যারা পদমর্যাদায় খাটো, যারা অধস্তন, যারা নিচুতলার বাসিন্দা তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি না। একজনকে হেয় করব, আবার তার কাছ থেকেই ভাল কাজ আশা করব, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করব, আর আশা করব সে সৃষ্টিশীল হবে, তা হয় না। দৃঢ়তা এবং রূঢ়তা, শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং অন্যায় জুলুম, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা এই দুইয়ের মধ্যে যে ভেদরেখা সেটি অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তাকে মানতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে যে ভেদটি চিরস্থায়ী হয়ে গেছে সেটি হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হিরো' এবং 'জিরো'-র মধ্যে। এক দিকে আছে কয়েক শো হিরো, আর ৯৫ কোটিকে আমরা ধরে রেখেছি আরেক দিকে। এই অবস্থাটাকে বদলাতেই হবে।

সমস্যার সামনে দাঁড়ানো, এবং তার সমাধান করা সময় ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেইজন্যে আমাদের দীর্ঘসূত্রিতা সীমাহীন। বস্তুত, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে যে ব্যবধান সেখানে নির্ণায়কের কাজ করে সমস্যা। সমস্যাই ভেতর থেকে টেনে বের করে আনে অন্তর্নিহিত সাহস ও প্রজ্ঞা।

আমি নাসা থেকে ফিরে আসার ঠিক পরেই ২১ নভেম্বর ১৯৬৩-তে ভারতের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষিপ্ত হল, সেটি ছিল সাউন্ডিং রকেট। নাসায় তৈরি এই রকেটটির নাম দেওয়া হয়েছিল Nike-Apache। রকেটটিকে সংযোজিত করা হয়েছিল সেখানে, যে কথা আমি আগেই বলেছি। রকেটটি নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাহন বলতে ছিল একটি ট্রাক এবং হস্ত-চালিত একটি হাইড্রলিক ক্রেন। সংযোজনের পর রকেটটিকে গির্জা থেকে উৎক্ষেপণ-মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে ট্রাকে করে। যখন ক্রেন দিয়ে রকেটটিকে তুলে উৎক্ষেপক (launcher)-এর ওপরে স্থাপন করা হবে তখন সেটি একদিকে হেলে পড়তে আরম্ভ করল। বোঝা গেল ক্রেন-এর হাইড্রলিক ব্যবস্থায় (hydraulic system) ছিদ্র হয়েছে। এদিকে সন্ধ্যা ছটায় যেহেতু উৎক্ষেপণের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল আগেই, তাই তার মধ্যে ক্রেন মেরামত একেবারেই অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে ছিদ্রটি বড় ছিল না। আমরা সবাই মিলে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে রকেটটিকে তুলে ধরতে পারলাম। শেষ পর্যন্ত রকেটটি উৎক্ষেপণ-মঞ্চে স্থাপিত হল।

Nike-Apache-র প্রথম উৎক্ষেপণের সময়ে আমার দায়িত্ব ছিল রকেটটির সম্পূর্ণতা দান করা ও তার নিরাপত্তা। আমার যে দুজন সহকর্মী এই উৎক্ষেপণে বিশেষ সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন ডি. ঈশ্বরদাস এবং আর. অরবমুদন। রকেট সংযোজনের দায়িত্ব নিলেন ঈশ্বরদাস এবং উৎক্ষেপণের ব্যবস্থাও করলেন। আর যাঁকে আমরা ডাকতাম ড্যান বলে, তিনি দায়িত্বে ছিলেন রাডার, টেলিমেট্রি এবং ভূমি-সহায়তার (ground support)। উৎক্ষেপণ মসৃণভাবে সম্পন্ন হল, কোনও সমস্যা হল না। উড়ান-সংক্রান্ত চমৎকার তথ্যাদি আমরা পেয়ে গেলাম এবং যা করতে পেরেছি সে সম্পর্কে গর্বের অনুভূতি নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা খাবার টেবিলে খবর পেলাম টেকসাস-এর ডগলাস-এ প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। আমরা স্তম্ভিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনেডির জমানা আমেরিকার এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ, যখন সব-কিছু চালনার দা.য়িত্ব ছিল যুবকদের হাতে। ১৯৬২-এর শেষ দিকে ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময়ে কেনেডির বিভিন্ন পদক্ষেপের খবর আমরা সাগ্রহে পড়তাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাতে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করেছিল। সেখান থেকে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে আক্রমণ চালানো যেত। কিউবাতে কোনও প্রকার আক্রমণাত্মক অস্ত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে কেনেডি অবরোধ জারি করলেন। তা ছাড়া তিনি এই বলে সাবধান করে দিলেন যে, কিউবা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও পারমাণবিক আক্রমণ পশ্চিম গোলার্ধের কোনও দেশে যদি হানা দেয়, সোভিয়েত ইউনিয়নকে তিনি তাঁর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেন। চোদ্দো দিনের অত্যন্ত নাটকীয় ঘটনাবলীর পর এই সংকটের সমাধান হল, সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ কিউবার উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলির অপসারণ এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলি রাশিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।

পরদিন অধ্যাপক সারাভাই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তিনি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন। এক নতুন প্রজন্ম, যে-সব বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের বয়স তিরিশের কোঠায় এবং চল্লিশ-এর কোঠার প্রথম দিকে, তাঁদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব গতিশক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হয়। INCOSPAR-এ আমাদের ডিগ্রিকে কিংবা আমাদের অভিজ্ঞতাকে নয়, আমাদের সামর্থ্যের ওপর ড. সারাভাইয়ের যে আস্থা, তাকেই আমাদের যোগ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে গণ্য করা হত। Nike-Apache-র সফল উৎক্ষেপণের পর একটি ভারতীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণ বাহন (Satellite Launch Vehicle) সম্পর্কে তাঁর স্বপ্নের কথা আমাদের জানাতে চাইলেন।

অধ্যাপক সারাভাইয়ের আশাবাদ ছিল অতিশয় সংক্রামক। থুম্বায় যে তিনি আসছেন এই খবর পৌঁছনো মাত্র সকলের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হত; কর্মশালায়, নক্‌শা-অফিসে নিরলস কর্মব্যস্ততার গুঞ্জন উঠত। নতুন কিছু, এ দেশে যা কখনও করবার চেষ্টা হয়নি এমন কিছু, তা সে নতুন কোনও নক্‌শাই হোক, নতুন কিছু নির্মাণই হোক, এমনকী কর্ম পরিচালনা সম্পর্কে অভিনব কোনও পদ্ধতিও যদি হয়, অধ্যাপক সারাভাইকে দেখাবার আগ্রহে প্রায় সারা দিনরাত কাজ চলত। একজন একক মানুষকে, কিংবা একটি গোটা দলকে অধ্যাপক সারাভাই প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের কাজ দিতেন, প্রথম প্রথম যদিও মনে হত ওই সমস্ত কাজের একটির সঙ্গে আরেকটির কোনও সম্পর্কই নেই, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যেত সে-সব কাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। অধ্যাপক সারাভাই যখন আমাদের কাছে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ-যান (SLV)-এর কথা বলছেন, তখনই প্রায় এক নিশ্বাসেই আমাকে বললেন, সামরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমানের জন্যে একটি রকেট-সহায়ক উড়ার ব্যবস্থা (rocket-assisted take-off system) (RATO) নিয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করতে। সেই বিরাট স্বপ্নদর্শীর মনের বাইরে ওই দুটো বস্তুর মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না। আমি শুধু জানতাম, আমাকে সেই উদ্দেশ্যটির দিকে লক্ষ্যস্থির রেখে সজাগ থাকতে হবে এবং আজ হোক কাল হোক, আমার সুযোগ আসবেই, আমার শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করবার মতো কোনও কাজের।

কোনও কাজ নতুনভাবে করার ব্যাপারে অধ্যাপক সারাভাই সর্বদা আগ্রহী ছিলেন, এবং সবসময় তিনি তরুণদেরই সে কাজে টেনে নিতে চাইতেন। তিনি নিজের প্রজ্ঞা এবং বিচারশক্তি দিয়ে শুধু যে কোনও কাজ ঠিকমতো করা হল কিনা তাই বুঝতে পারতেন শুধু তাই নয়, কখন থামতে হবে তাও বুঝতে পারতেন। আমার মতে, তিনি ছিলেন নতুন কিছু পরীক্ষা করে দেখবার, নতুন কিছু উদ্ভাবনের আদর্শ ব্যক্তি। যখন দেখা যেত আমাদের সামনে একাধিক বিকল্প কর্মপন্থা, তার কোনটির কী ফল হবে আগের থেকে বোঝা কঠিন, কিংবা বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যখন সামঞ্জস্য করা যাচ্ছে না, অধ্যাপক সারাভাই সে সব সমস্যার সমাধানের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিতেন। ১৯৬৩-তে INCOSPAR-এ ঠিক এই রকমই একটি অবস্থার সৃষ্টি হল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আত্মনির্ভরতার মনোভাবকে সাকার করবার ভার দেওয়া হল অনভিজ্ঞ কিন্তু প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক দল উৎসাহী তরুণকে। বিশ্বাস স্থাপন করে নেতৃত্ব প্রদানের এ এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটি পরবর্তীকালে থুম্বা ইকোয়াটোরিয়াল রকেট লঞ্চ স্টেশন (Thumba Equatorial Rocket Launch Station) (TERLS) হিসেবে পরিণতি লাভ করে। TERLS স্থাপিত হল ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় সহযোগিতায়। এই কঠিন দায়িত্বের অর্থ কী, ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির নেতা অধ্যাপক সারাভাই তা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং তা থেকে কখনই পিছিয়েও আসেননি। যে দিন INCOSPAR গঠিত হল সেই দিন থেকেই তিনি জানতেন একটি সুসংহত জাতীয় মহাকাশ কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে এবং তাতে রকেট ও তার উৎক্ষেপণ ব্যবস্থাদি স্বদেশে প্রস্তুত করার যন্ত্রপাতি থাকবে।

এই উদ্দেশ্যে আহমেদাবাদের মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র (Space Science and Technology Centre) এবং ভৌত গবেষণা পরীক্ষাগারে (Physical Research Laboratory) এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হল। তাতে থাকল রকেটের জ্বালানি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎক্ষেপণ পদ্ধতি, বায়ুযান, মহাকাশ বিষয়ক বিভিন্ন উপাদান, উচ্চমানের নির্মাণ প্রক্রিয়া, রকেট মোটরের যান্ত্রিক-কলকব্জা, নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাদি, টেলিমেট্রি ও উড়ানপদ্ধতি এবং মহাকাশে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ল্যাবরেটরি থেকে সেই সময়ে বহুসংখ্যক উচ্চমানের ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী বেরিয়ে এসেছেন।

ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির যাত্রা প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়েছিল রোহিণী সাউন্ডিং রকেট (Rohini Sounding Rocket) (RSR) কর্মসূচি দিয়ে। উপগ্রহ উৎক্ষেপণ-যান (SLV) এবং ক্ষেপণাস্ত্র থেকে একটি সাউন্ডিং রকেটের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, মূলত এগুলি তিন প্রকারের রকেট। সাউন্ডিং রকেট সাধারণত ব্যবহার করা হয় পৃথিবীর নিকটবর্তী পরিবেশ অনুসন্ধানের জন্যে, তার মধ্যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর ভাগও থাকে। যদিও সেগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই সব যন্ত্রপাতিকে পরিক্রমণ কক্ষে স্থাপন করতে পারার মতো গতিশক্তি তারা সঞ্চার করতে পারে না। অপরপক্ষে একটি উৎক্ষেপণ-যান এমনভাবে নির্মিত যে, সেটি যন্ত্রপাতিকে কিংবা কোনও কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে পৌঁছে দিতে পারে। উৎক্ষেপণ-যান তার শেষ পর্যায়ে উপগ্রহকে কক্ষপথে প্রবেশের মতো গতি দান করে। এই কাজটি জটিল, তার জন্যে দূর-নিয়ন্ত্রক সহায়ক ব্যবস্থা (on-board guidance) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির (control system) প্রয়োজন হয়। আবার, একটি ক্ষেপণাস্ত্র যদিও এই একই পরিবারভুক্ত, কিন্তু তা আরও জটিল। উচ্চ অন্তিম গতিশক্তি এবং তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থা ছাড়াও লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। লক্ষ্যবস্তু যদি উচ্চগতি সম্পন্ন হয় এবং দ্রুত দিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়, ক্ষেপণাস্ত্রের তাহলে তার পশ্চাদ্ধাবনের মতো ক্ষমতাও থাকা দরকার।

ভারতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে সাউন্ডিং রকেটে দূর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (on-board systems) যে বিকাশ ঘটেছে, তার জন্যে কৃতিত্ব প্রাপ্য RSR কর্মসূচির। এই কর্মসূচীর অধীনে সাউন্ডিং রকেটের সক্রিয় কার্যকলাপের আনুষঙ্গিক কাজের বিকাশ ঘটেছে। এইসব রকেট বিবিধ প্রকারের কাজে ব্যবহারোপযোগী এবং আজ পর্যন্ত কয়েক শো এই রকেট বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত গবেষণার কাজের জন্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

এখনও আমার মনে আছে, প্রথম রোহিণী রকেটিতে ছিল একটি সলিড প্রোপালশান মোটর যার ওজন ছিল মাত্র ৩২ কেজি। নামমাত্র ৭ কেজি ওজনের বস্তুকে সে মাইল দশেক তুলতে পারত। তার পরেই এল আরেকটি, যার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিরিক্ত একটি সলিড প্রপেলান্ট স্তর যুক্ত করা হল, যাতে প্রায় ১০০ কেজি বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি ৩৫০ কিলোমিটারের অধিক উচ্চতায় পাঠানো যায়।

এইসব রকেট নির্মাণের ফলে ভারত এখন সাউন্ডিং ও তার প্রপেলান্ট সম্পূর্ণভাবে স্বদেশেই নির্মাণে সক্ষম। এইসব কর্মসূচি আমাদের দেশকে দিয়েছে পলিবুটেন পলিমার এবং পলিউরেথেন-এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রপেলান্ট তৈরির মতো উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি। পরবর্তীকালে এর ফলে সম্ভব হল একটি প্রোপেলান্ট Fuel Complex (PFC) স্থাপন করা, যার প্রয়োজন হয় রকেট ইঞ্জিনে এবং Rocket Propellant Plant (RPP) স্থাপন করা, যার উদ্দেশ্য প্রপেলান্ট প্রস্তুত করা।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রকেট নির্মাণকে দেখা যেতে পারে টিপু সুলতানের স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন। ১৭৯৯ সালে তুরুখানাল্লির যুদ্ধে টিপু সুলতান যখন নিহত হন ব্রিটিশেরা হাতে পেয়ে গেল ৭০০-র অধিক রকেট এবং ৯০০ রকেটের অন্তর্গত বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থাদি। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ১৭টি বিগ্রেড, যাদের বলা হত 'কুশুন' এবং প্রত্যেক ব্রিগ্রেডের ছিল এক কোম্পানি রকেট-সৈনিক, যার নাম ছিল 'জোরক'। এই রকেটগুলিকে উইলিয়াম কংগ্রিভ ইংল্যান্ডে নিয়ে যান এবং ব্রিটিশরা এগুলিকে নিয়ে, আমরা যাকে বলি বিপরীত-কারিগরি পদ্ধতি অর্থাৎ তৈরি করা বস্তুটি থেকে আরম্ভ করে পিছন দিকে হেঁটে, তার নির্মাণের কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টা, তাই করে। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে GATT, IPR Act এবং পেটেন্ট-এর শাসন ছিল না। টিপু সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, অন্তত দেড়শো বছরের জন্য ভারতীয় রকেট-বিদ্যার অবসান ঘটল।

ইতিমধ্যে বিদেশে রকেট প্রযুক্তিতে বিপুল অগ্রগতি এসেছে। কনস্টানটাইন শিওলকোভ্স্কি রাশিয়াতে (১৯০৩), রবার্ট গোদারদ্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (১৯১৪) এবং হেরমান ওবেরথ জার্মানিতে (১৯২৩) রকেট-বিদ্যাকে নতুন মাত্রা দিলেন। নাৎসি জার্মানিতে ভেরনার ভন ব্রাউন-এর দল V-2 স্বল্পপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করে মিত্রশক্তির ওপর আঘাত করতে আরম্ভ করল। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানির রকেট-প্রযুক্তি এবং রকেট প্রযুক্তিবিদদের ভাগ করে নিল। এইভাবে লাভবান হয়ে তারা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এবং রকেটবাহিত যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে তাদের মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল।

ভারতে যে রকেট-বিদ্যার পুনর্জন্ম হল তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব আকার দানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক সারাভাই। অনেকে ছিলেন অ-দূরদর্শী, তাঁরা প্রশ্ন করলেন যে, সদ্য-স্বাধীন এই দেশ দেশবাসীকে অন্ন যোগাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, তার মহাকাশ নিয়ে অত ব্যস্ত হওয়ার কী দরকার? কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং অধ্যাপক সারাভাই, এ দুজনের কারওরই লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও দ্বিধা ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি ছিল অতি পরিষ্কার: ভারতকে যদি জগৎসভায় কোনও মূল্যবান ভূমিকা নিতে হয়, বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে তার কারও থেকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। শুধু আমাদের শক্তি দেখাবার উদ্দেশ্যে এই পথে চলার কোনও উদ্দেশ্যই তাঁদের ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

অধ্যাপক সারাভাই প্রায়ই থুম্বায় আসতেন। তখন তিনি সমগ্র কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করতেন। কখনও তিনি নির্দেশ দিতেন না। বরং স্বাধীন মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নতুন এক জায়গায় নিয়ে যেতেন। সেখান থেকে আমরা সমস্যার এমন সমাধান দেখতে পেতাম যা আগে দেখিনি। বোধ হয় তিনি জানতেন, কোনও লক্ষ্য হয়তো তাঁর নিজের কাছে খুব পরিষ্কার, হয়তো সে লক্ষ্য কী করে সাধিত হতে পারে সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট নির্দেশ দিতে সক্ষম, কিন্তু তাঁর টিমের সহকর্মীরা সেই লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যেতে আগ্রহ বোধ করছেন না, কারণ লক্ষ্যটি তাঁদের মনে হচ্ছে অর্থহীন। তিনি মনে করতেন, ফলপ্রদ নেতৃত্বের প্রধান লক্ষণ কোনও সমস্যা সম্পর্কে সমবেত উপলব্ধি। একদিন তিনি আমায় বলছিলেন, "দ্যাখ, আমার কাজ সিদ্ধান্ত নেওয়া: কিন্তু আমার টিমের সবাই যেন সে-সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করে সেটা দেখাও কম জরুরি নয়।"

বস্তুত, অধ্যাপক সারাভাই এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যেগুলি অনেকের জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমরা নিজেরা আমাদের রকেট, আমাদের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ-যান (SLVs) এবং আমাদের উপগ্রহ নির্মাণ করব। এবং এসব একে একে নয়, যুগপৎ হবে, বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে। তথ্য-সংগ্রহকারী রকেটগুলি যে বস্তুটি বহন করে নিয়ে যাবে, অর্থাৎ সেই পেলোডটি আগে হাতে নিয়ে তারপর সেটিকে রকেটটির উপযোগী করে বানিয়ে নেওয়ার বদলে, যাঁরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠানে পেলোড বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গেই আমরা আলোচনা করতাম। এমনকী, একথাও বলা যায় মহাকাশ-সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহকারী রকেট কর্মসূচির শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল দেশব্যাপী আস্থা স্থাপন করা।

অধ্যাপক সারাভাই সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিজের আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগ করার বদলে আমি লোককে আমার কথা মতো কাজ করতে স্বেচ্ছায় সম্মত করায় বেশি পছন্দ করি। সেইজন্যে তিনি আমায় বললেন, পেলোড বিজ্ঞানীদের সহায়তা দেওয়ার জন্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে। সাউন্ডিং রকেট কর্মসূচিতে ভারতের প্রায় সমস্ত পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত পরীক্ষাগারই যুক্ত হয়েছিল। প্রত্যেকটিরই নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, নিজের পেলোড ছিল, এই সব পেলোডকে রকেটের কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে হত, যাতে উড়ানকালে সেগুলো ঠিকমতো কাজ করে, ধকল সহ্য করতে পারে। আমাদের এক্স-রে পেলোডগুলি ছিল তারকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করবার জন্যে, রেডিও কম্পাস্ক ভর যুক্ত পেলোড ছিল উচ্চতর বায়ুস্তরের গ্যাসের বিশ্লেষণ করবার জন্যে, সোডিয়াম পেলোড ছিল বায়ুর অবস্থিতি কোন দিকে, কী বেগে প্রবাহিত হচ্ছে, তা জানবার জন্যে। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে অনুসন্ধানের জন্যে ছিল আয়নোস্ফোরিক পেলোড। শুধু TIFR, ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (NPL), এবং ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরির সঙ্গে নয়, আমাকে কাজকর্ম, কথা-বার্তা, আদানপ্রদান চালাতে হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি এবং জাপানের পেলোড বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও।

খলিল জিব্রান আমি প্রায়ই পড়ি। গভীর প্রজ্ঞায় ভরপুর তার লেখা। "যে রুটি ভালবাসা বিনা প্রস্তুত, তা বিস্বাদ, তাতে ক্ষুধা অর্ধেক মাত্র মেটে" তিনি বলেছেন। অন্তর দিয়ে যারা কাজ করতে পারে না, তাদের সাফল্য অন্তঃসারশূন্য তাতে অন্তরের যোগ থাকে না। তাতে চতুর্দিকে তিক্ততারই সৃষ্টি হয়। তুমি যদি লেখক হও, অথচ তোমার মনে গোপন সাধ আইনজীবী কি ডাক্তার হওয়ার, তাহলে তোমার লেখা তোমার পাঠককে অতৃপ্ত রাখবে; তুমি যদি হও শিক্ষক অথচ তোমার মনে সাধ ব্যবসায়ী হওয়ার, তাহলে তোমার ছাত্রের জ্ঞানতৃষ্ণা অপূর্ণ থেকে যাবে, তুমি যদি হও এমন বিজ্ঞানী যে বিজ্ঞানকে ঘৃণা করে, তাহলে তুমি যা করবে তাতে তোমার যেটা উদ্দেশ্য তার প্রয়োজনের অধিকের বেশি মিটবে না। ব্যক্তিগত অ-সুখ ও ব্যর্থতা কখনই সম্পূর্ণ লক্ষ্যপূরণে সমর্থ হবে না—আংশিক হতে পারে মাত্র, তার বেশি নয়। অর্থাৎ যার যেখানে স্থান নয়, সেখানে সে যে অসুখী হবে, কৃতকার্য হবে না, এ কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন কথা নয়। তবে, এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যথা অধ্যাপক ওডা এবং সুধাকর। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, অন্তরের তাগিদ এবং অন্তঃকরণে যে স্বপ্ন অবয়ব ধারণ করেছে তার জন্যে তাঁদের কাজে একটা অত্যাশ্চর্য গুণ সঞ্চারিত হয়। তাঁদের অন্তরের অনুভূতি তাঁদের কাজের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, সাফল্যে যদি কোনও ঘাটতি থাকে তাহলে বেদনার অন্ত থাকে না।

অধ্যাপক ওডা ছিলেন জাপানের Institute of Space and Aeronautical Sciences-এর একজন এক্স-রে পেলোড বিজ্ঞানী। আমার মনে পড়ে, তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রকায় মানুষ কিন্তু উত্তুঙ্গ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, চোখে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি। নিজেকে তিনি নিজের কাজে যেভাবে উৎসর্গ করেছিলেন সেটা অনুকরণ করবার মতো। ISAS থেকে তিনি যে এক্স-রে পেলোড নিয়ে আসতেন তাকে ইউ.আর. রাওয়ের তৈরি এক্স-রে পেলোডের সঙ্গে আমার টিম ঠিক ঠিক মতো তৈরি করে নিত, রোহিণী রকেটের নাসিকাগ্রে (nose cone) যাতে লাগতে পারে। ১৫০ কিমি উচ্চতায় একটি বৈদ্যুতিন সময়জ্ঞাপক একটি বিস্ফোরণ ঘটাবে, যার ফলে নাসিকাগ্রটি রকেট থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। তার ফলে এক্স-রে sensorগুলি মহাকাশে উন্মোচিত হবে এবং বিভিন্ন তারকা থেকে বিচ্ছুরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। অধ্যাপক ওডা এবং অধ্যাপক রাও, এঁরা দুজনে একত্রে মেধাশক্তি ও আত্মোৎসর্গের এমন এক সংমিশ্রণ ছিলেন যা সচরাচর দেখা যায় না। একদিন আমি অধ্যাপক ওডা-র পেলোডটিকে আমার সময়জ্ঞাপক যন্ত্রপাতির সঙ্গে একাঙ্গীকরণের কাজ করছিলাম, সে-সময়ে তিনি জোরাজুরি করতে লাগলেন জাপান থেকে তাঁর আনা যে-সব সময়জ্ঞাপক, সেগুলিকে ব্যবহার করার জন্যে। আমার মনে হচ্ছিল সেগুলো একটু ঠুনকো ধরনের কিন্তু অধ্যাপক ওডা তবু চাইতে লাগলেন যে, ভারতীয় টাইমারগুলির বদলে জাপানি টাইমার লাগাতে হবে। আমি তাঁর কথা মেনে নিলাম, টাইমার বদল হল। রকেটটি সুন্দরভাবে রওনা হল, নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছল। কিন্তু টেলিমেট্রি যে সংকেত পাঠাল তাতে দেখলাম টাইমারের কাজে ত্রুটির জন্যে অভিযান (misson) ব্যর্থ হয়েছে। অধ্যাপক ওডা এতদূর মর্মাহত হলেন যে তাঁর চোখে জল এসে গেল। তাঁর এই তীব্র আবেগ দেখে আমি স্তম্ভিত। দেখলাম সত্যিই তিনি এই কাজে তাঁর প্রাণ-মন ঢেলে দিয়েছেন।

'পেলোড'-প্রস্তুত পরীক্ষাগারে সুধাকর আমার সহকর্মী ছিলেন। প্রাক্-প্রক্ষেপণ কার্যক্রম অনুযায়ী একদিন আমরা সোডিয়াম এবং থারমাইটের বিপজ্জনক মিশ্রণটি ভরছিলাম এবং দূর নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে তার ওপরে চাপ দিচ্ছিলাম। অন্যদিনের মতো সেদিনও থুম্বার আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও আর্দ্র। ষষ্ঠবার সে-কাজ করবার পর সুধাকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমি পেলোড কক্ষে দেখতে গেলাম মিশ্রণটি ঠিকমতো ভরা হচ্ছে কি না। হঠাৎ সুধাকরের কপাল থেকে একটি ফোঁটা ঘাম সোডিয়ামের ওপর পড়ল। আমরা ব্যাপার কিছু বুঝবার আগেই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমস্ত ঘরখানা কেঁপে উঠল। কয়েক মুহূর্ত আমাদের হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল। কী করব আমি বুঝতে পারলাম না, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, সোডিয়ামের আগুন জলে নিভবে না। সেই নরকাগ্নির মধ্যে আটকে পড়ে, সুধাকর কিন্তু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি হারালেন না। খালি হাতে কাচের জানালা ভেঙে ফেললেন, আমাকে ধাক্কা দিয়ে বিপদের বাইরে ফেলে দিয়ে নিজে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন। সুধাকরের রক্তাক্ত হাতে হাত দিয়ে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম। যন্ত্রণার মধ্যেও সুধাকরের মুখে হাসি লেগেছিল। তিনি যে-রকম গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন তার জন্যে তাঁকে অনেক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

আমি TERLS-এ যুক্ত ছিলাম যে যে কাজের সঙ্গে সেগুলো হল রকেট প্রস্তুত, পেলোড সংযোজন, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন এবং পেলোড-এর যন্ত্রপাতি একত্রীকরণ এবং (রকেটের) বর্জনোপযোগী নাসিকাগ্র উপ-ব্যবস্থা নির্মাণ। রকেটের নাসিকাগ্র-র কাজ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমি মিশ্র পদার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম।

ভাবতে একটু অবাক লাগে, প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সব ধনুক পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে জানা যায় যে, কাঠ, জীবজন্তুর পেশী এবং শৃঙ্গ জাতীয় বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থ দিয়ে নির্মিত ধনুক ভারতীয়রা ব্যবহার করত সেই একাদশ শতাব্দীতে, মধ্যযুগের ইউরোপে সে-রকম ধনুক ব্যবহারের অন্তত ৫০০ বছর আগে। অত্যন্ত উপযোগী বিভিন্ন গঠন-সংক্রান্ত, তাপ-সংক্রান্ত, বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই সব মিশ্র পদার্থের নানাবিধ ব্যবহারের পক্ষে উপযোগিতার কথা ভাবলে আমি চমৎকৃত হই। এই সব মনুষ্য-সৃষ্ট কৃত্রিম বস্তু আমাকে এত দূর উৎসাহিত করেছিল যে, প্রায় রাতারাতি সেগুলো সম্পর্কে সব কিছু জেনে নেবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এ সংক্রান্ত যা কিছু পাওয়া যায় সবই আমি পড়ে ফেলতাম। আমার বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল কাচ এবং কারবনের Fibre Reinforced Plastic (FRP) মিশ্রণ সমূহে।

FRP মিশ্রণে থাকে একটি অজৈব তন্তু যেটি একটি ছাঁচ-এর মধ্যে বয়ন করে দেওয়া হয়। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থুম্বায় এলেন TERLS-কে International Space Science Community-তে উৎসর্গ করতে। সেই উপলক্ষে তিনি দেশের প্রথম তন্তুকুণ্ডলীকরণ যন্ত্র (filament winding machine) নির্মাণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৬৪www.amarboi.com ~

নির্দেশ দিলেন আমাদের ল্যাবরেটরিকে। এই ঘটনায় প্রভূত সন্তোষলাভ করল আমার টিম, যার মধ্যে ছিলেন সি. আর. সত্য, পি. এন. সুব্রহ্মণ্যম এবং এম. এন. সত্যনারায়ণ। আমরা অ-চৌম্বকীয় পেলোড যন্ত্রপাতি একীকরণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কাচের চাদরের আবরণী প্রস্তুত করে দ্বি-স্তরীয় সাউন্ডিং রকেটে সেগুলোকে উড়ানের জন্যে দিতাম। আমরা ৩৬০ মিমি. ব্যাসের মোটর খাপও প্রস্তুত করতাম ও পরীক্ষামূলক ভাবে ওড়াতাম।

ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে থুম্বায় দুটি ভারতীয় রকেটের জন্ম হল। নামকরণ হল স্বর্গলোকের অধিপতি ইন্দ্রের রাজসভায় দুই পৌরাণিক নর্তকী রোহিণী এবং মেনকার নামে। ভারতীয় পেলোড এখন আর ফরাসি রকেটে উৎক্ষেপণের প্রয়োজন হত না। এ কী সম্ভব হত, অধ্যাপক সারাভাই INCOSPAR-এ যে আস্থা এবং দায়বদ্ধতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন তার ব্যতিরেকে? প্রত্যেকটি মানুষের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। সমস্যার সমাধান-কল্পে তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের অন্তর দিয়ে যুক্ত করার কাজে সফল হয়েছিলেন। টিমের সদস্যরা যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সমস্যার প্রকৃত সমাধান তাতেই সম্ভব হত, সেই সমাধান প্রত্যেকের বিশ্বাসযোগ্য হত এবং তাকে কার্যকর করবার জন্যে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ দায়বদ্ধতা থাকত।

যা বলবার প্রয়োজন তা নিয়ে অধ্যাপক সারাভাই ভনিতা করতেন না, হতাশা কখনও গোপন করবার চেষ্টা করতেন না। আমাদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে যা বলবার নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, অকপটে বলতেন। কখনও কখনও আমি দেখতাম, তিনি পরিস্থিতি যতটা নয় তার বেশি আশাব্যঞ্জক বলে দেখাতেন এবং তাঁর প্রায়-যাদুকরী বাক্-প্রতিভায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমরা যখন ড্রইংবোর্ডে নকশা আঁকার কাজ করতাম, কারিগরি সহযোগিতার জন্যে তিনি শিল্পোন্নত দেশের কাউকে নিয়ে আসতেন। এই রকমভাবে, সূক্ষ্ম কৌশলে তিনি আমাদের প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ জানাতেন, যার যতদূর শক্তি তাকে সেই অনুযায়ী প্রয়োগ করতেন।

আবার, বিশেষ কোনও লক্ষ্য পূরণে যদি আমরা অসমর্থ হতাম, আমরা যতটুকু করেছি তারই তিনি প্রশংসা করতেন। যখনই তিনি দেখতেন কেউ এমন কিছু করবার চেষ্টা করছেন যেটা তাঁর শিক্ষা এবং যোগ্যতার অতীত, অধ্যাপক সারাভাই নতুন করে কাজ ভাগ করে দিতেন যাতে সেই ব্যক্তির ওপর চাপ লাঘব হয়, আরও ভাল কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে TERLS থেকে প্রথম রোহিণী-৭৫ রকেট উৎক্ষিপ্ত হল ২০ নভেম্বর ১৯৬৭; আর তার মধ্যে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের বছরের প্রথম দিকে অধ্যাপক সারাভাই আমাকে দিল্লি থেকে জরুরি তলব পাঠালেন। তাঁর কাজের রীতি আমি ভালই জানতাম। তিনি সদাই উৎসাহে ভরপুর, সদাই আশাবাদী। সে রকম মানসিক অবস্থায় খুব সহজেই অনুপ্রেরণা আসা প্রায় স্বাভাবিক। দিল্লি পৌঁছে আমি অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং তিনি আমাকে ভোররাত্রি ৩-৩০-এ অশোকা হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দিল্লি জায়গাটা আমার একটু অপরিচিত ছিল এবং দক্ষিণ ভারতের উষ্ণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার ফলে তার জলবায়ুও আমার মতো একজনের পক্ষে খুব সুখকর ছিল না। আমি ঠিক করলাম নৈশভোজের পর হোটেলের লাউঞ্জেই অপেক্ষা করব।

আমি চিরকালই ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এই অর্থে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমি কর্মের একটি অংশীদারিত্ব বজায় রেখে চলি। আমি জানতাম, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি করতে গেলে আমার ক্ষমাতায় কুলোবে না, অতএব আমার সাহায্যের প্রয়োজন এবং সে সাহায্য একমাত্র সেই ঈশ্বরই দিতে পারেন। আমি আমার ক্ষমতার একটা যথার্থ পরিমাপ নিলাম এবং তাকে পঞ্চাশ শতাংশ বাড়ালাম, বাড়িয়ে ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম। যখন যা শক্তি প্রয়োজন হয়েছে আমি এই অংশীদারিত্ব কিংবা সহায়তা থেকে পেয়েছি; এমনকী আমি এও অনুভব করেছি যে, এই শক্তি আমার ভিতরে সঞ্চারিত হচ্ছে। আজ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ঈশ্বরের রাজত্ব কোনও একজনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এই শক্তিরূপেই, এর দ্বারাই লক্ষ্য পূরণ করা যায়, স্বপ্ন সাকার করা যায়।

অভ্যন্তরের এই শক্তির প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে অনেক রকম অবস্থায়। কখনও কখনও, আমরা যখন প্রস্তুত, তাঁর সামান্যতম স্পর্শ আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টিতে, প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে দিতে পারে। অন্য কারও সঙ্গে সংযোগে, একটি কথায়, একটি প্রশ্নে, একটি কোনও ভাব-ভঙ্গিতে, এমনকী একটি চাউনিতে সেরকম হতে পারে। অনেক সময়ে সে ঘটনা ঘটতে পারে একটি বই থেকে, একটি বাক্য থেকে, একটি বাক্যাংশ থেকে, কিংবা কবিতার একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি, অথবা এমনকী একটি ছবি থেকেও। কোনও রকম পূর্বাভাস ছাড়াই নতুন কিছু আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়, গোপনে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেটি আমাদের কাছেও প্রথমে গোপন থাকে।

সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত সেই লাউঞ্জটিতে বসে আমি চারদিকে তাকালাম। কাছের একটি সোফায় কে যেন একটি বই ফেলে গেছে। শীতল রাত্রির শেষ প্রহরে যেন খানিকটা উষ্ণ আরামের জন্যেই আমি বইটি হাতে নিয়ে পাতা উলটাতে আরম্ভ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইটির কয়েকটি মাত্র পাতাই হয়তো আমি উলটেছিলাম, যার কথা আজ আর আমার প্রায় কিছুই মনে নেই।

ব্যবসা-পরিচালনা সংক্রান্ত কোনও জনপ্রিয় পুস্তক ছিল সেটি। পাতা ওলটাচ্ছিলাম, টপকে টপকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি অংশের ওপর আমার চোখ পড়ল, জর্জ বার্নার্ড শ-এর থেকে একটি উদ্ধৃতি। তার মূল কথাটি ছিল, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই বাস্তবজগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। শুধু অল্প কয়েক জন মানুষ যারা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নয়, তারা জগতকে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যায়। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষদের উদ্ভাবনী, পৃথকধারার কাজকর্মের ওপরেই পৃথিবীর অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

বার্নার্ড শ-এর উদ্ধৃতি থেকে আমি বইটি পড়তে আরম্ভ করলাম। শিল্প-বাণিজ্যে উদ্ভাবনের ধারণা ও পদ্ধতি নিয়ে নানারকম অবাস্তব কল্পকথার লোককথার বিবরণ লেখক দিচ্ছিলেন। কৌশলগত পরিকল্পনার সম্পর্কে কল্পিত ধারণার কথা পড়ছিলাম। প্রচলিত ধারণা, পরিচালনগত ও প্রযুক্তিগত কৌশল যদি থাকে, তাহলে শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগে ফললাভ কী হবে সেটা আগে থেকে বহুল পরিমাণে অনুমান করা যায়। লেখকের মত, প্রকল্প ম্যানেজারের জানা দরকার, অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতাকে নিয়েই ঘর করতে হবে। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক সাফল্য নির্ভর করে হিসেব-নিকেশ করা যাচ্ছে কী না তার ওপর, এ ধারণা ভ্রান্ত। তাঁর মতের সমর্থনে তিনি জেনারেল জর্জ প্যাটনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: একটি ভাল পরিকল্পনা এখনই সবলে রূপায়িত করা, পরের সপ্তাহে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পনা রূপায়িত করার চেয়ে ভাল। প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করতে গেলে যাতে সব চাইতে ভাল হয়, তাকেই লক্ষ্য করতে হবে, এ এক ভ্রান্ত বিশ্বাস। কাগজ-কলমে তা হতে পারে, বাস্তব জগতে পরবর্তী কালে দেখা যায় তাতে ব্যর্থতাই আসে।

দু-ঘণ্টা পরে যে সাক্ষাৎকারটির সময় নির্দিষ্ট আছে, তার জন্যে হোটেলের লবিতে রাত্রি ১টা থেকে বসে থাকার কোনও মানে হয় না, আমার জন্যেও নয়, অধ্যাপক সারাভাইয়ের জন্যেও নয়। তাহলে কী হবে, চিরকালই দেখেছি অধ্যাপক সারাভাইয়ের চরিত্রে এমন কিছু একটা আছে যাতে প্রথাসিদ্ধ পথে তাঁকে চলতে দেয় না। দেশে মহাকাশ গবেষণার কাজ তিনি সফলভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যদিও লোকবল কম ছিল, কাজের চাপ ছিল মাত্রাতিরিক্ত।

হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম আরেক জন এসে আমার মুখোমুখি সোফায় বসলেন, সুগঠিত দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, মার্জিত ভাবভঙ্গি। আমার বেশবাস সর্বদা অবিন্যস্ত, তাঁর পরিধানে সুষ্ঠু পোশাক-আশাক। এমন অসময়েও, তিনি সজাগ, প্রাণবন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল যে, তাতে উদ্ভাবন সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল। বইটিতে যে আবার মনোনিবেশ করব, তার আগেই শুনলাম অধ্যাপক সারাভাই আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে প্রস্তুত। বইটি আমি যেখান থেকে নিয়েছিলাম সেই সোফাতেই রেখে দিলাম। সামনের সোফার সেই ভদ্রলোককেও ভিতরে যাবার জন্যে বলা হল দেখে আমি অবাক হলাম। কে উনি? উত্তর পেতে দেরি হল না। আমরা আসন গ্রহণ করবার আগেই অধ্যাপক সারাভাই আমাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি গ্রুপ ক্যাপটেন ভি. এস. নারায়ণন, বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে এসেছেন।

আমাদের দুজনের জন্যে অধ্যাপক সারাভাই কফির অর্ডার দিলেন এবং সামরিক বিমানের জন্যে একটি রকেট-সহায়ক উড়ান-শুরুর ব্যবস্থা (rocket-assisted take-off system) সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনার কথা আমাদেরকে জানালেন। আমাদের সামরিক বিমানকে হিমালয়ের মধ্যে ছোট ছোট রানওয়ে থেকে উড়তে এটি সাহায্য করবে। গরম কফির সঙ্গে নানা ঘটনা নিয়ে খুচরো কথা-বার্তা চলল। অধ্যাপক সারাভাইয়ের এ ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস মোটেই নেই। কফি শেষ হওয়া মাত্র তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের বললেন, তাঁর সঙ্গে দিল্লির উপকণ্ঠে টিলপট রেঞ্জ (Tilpot Range)-এ যেতে। লবি দিয়ে যাওয়ার সময়ে, আমি যে সোফাতে বইটি রেখেছিলাম সেটার দিকে তাকালাম। বইটি সেখানে নেই।

রেঞ্জটি মোটরে প্রায় এক ঘণ্টার রাস্তা। অধ্যাপক সারাভাই আমাদেরকে একটি রুশ RATO দেখালেন। জিজ্ঞাসা করলেন "এই সিসটেম-এর মোটরটি যদি রাশিয়া থেকে আপনাদের জন্যে এনে দিই, তাহলে আপনারা ১৮ মাসের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারবেন?" "হ্যাঁ, পারব", গ্রুপ ক্যাপ্টেন ভি. এস. নারায়ণন এবং আমি, আমরা দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলাম। অধ্যাপক সারাভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাদের গভীর আগ্রহই যেন প্রতিফলিত হল সে মুখমণ্ডলে। মনে পড়ল, একদা পড়েছিলাম, "তার আলোতে তোমার চলার পথ আলোকিত হবে।"

অশোকা হোটেলে আমাদের নামিয়ে দিয়ে অধ্যাপক সারাভাই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বাড়ি গেলেন এক প্রাতরাশ বৈঠকে যোগ দিতে। সন্ধ্যার মধ্যে খবর বেরিয়ে গেল, উচ্চ কর্মদক্ষতা-সম্পন্ন সামরিক বিমান স্বল্প দৈর্ঘের রানওয়ে থেকে যাতে উড়তে পারে, স্বদেশেই তার জন্যে একটি যন্ত্র প্রস্তুতের কাজ আমার নেতৃত্বে হাতে নেওয়া হয়েছে। নানা ভাবের অনুভূতিতে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হল, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, চরিতার্থতা। উনবিংশ শতাব্দীর এক স্বল্পখ্যাত কবির এই কয়েকটি লাইন আমার মনে পড়ল:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত থাকে আগামী সব দিনের জন্যে
একইভাবে গ্রহণ করো যেমন দিনই আসুক, তাকে
যখন তুমি নেহাই, সহ্য করো,
যখন তুমি হাতুড়ি, আঘাত করো।

বায়ুযানে RATO মোটর লাগানো হল ওড়া-শুরুর সময় তাকে সামনের দিকে ঠেলা দেবার অতিরিক্ত শক্তি যোগানোর জন্য, যাতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, যেমন বোমার আঘাতে আংশিকভাবে বিনষ্ট, রানওয়ে থেকে, অধিক উচ্চতায় অবস্থিত বিমানক্ষেত্র থেকে, কিংবা নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে বেশি ওজন নিয়ে উড়বার সময়ে কিংবা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশের মধ্যে উড়বার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি তার থাকে। বিমানবাহিনীর প্রচুর RATO মোটরের খুবই প্রয়োজন ছিল তাদের S-22 এবং HF-24 বিমানের জন্যে।

আমরা টিলপট রেঞ্জ-এ RATO মোটর দেখেছিলাম, তার ৩০০০ কিলোগ্রাম ঘাত (thrust) সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছিল যার মোট বেগ (impulse) ২৪৫০০ কেজি-সেকেন্ড। তার ওজন ছিল ২২০ কেজি এবং ইস্পাতের আবরণের মধ্যে তার একটি দ্বিস্তরীয় প্রপেলান্ট ছিল। এ কাজ করতে হবে মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র (SSTC), প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ কেন্দ্র (DRDO), HAL, DTD&P (Air) এবং বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরের সহায়তায়।

সমস্ত সম্ভাব্য বিকল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর আমি সিদ্ধান্ত করলাম ফাইবারগ্লাসে তৈরি মোটর আবরণ ব্যবহার করব। আমরা ঠিক করলাম একটি মিশ্র প্রপেল্যান্ট ব্যবহার করা হবে, যাতে পাওয়া যাবে উচ্চতর আপেক্ষিক বেগ এবং যার লক্ষ্য হবে নিঃশেষে তাকে ব্যবহারের জন্যে তার জ্বলনের সময় দীর্ঘায়িত করা। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে আমি এমন একটি ডায়াফ্রাম সংযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, যেটি, যদি কোনও কারণে প্রকোষ্ঠের মধ্যেকার চাপ প্রচলন চাপের দ্বিগুণের বেশি হয়, তাহলে ছিন্ন হয়ে যাবে।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা RATO-র কাজের সময়ে ঘটল। প্রথমটি অধ্যাপক সারাভাই-কৃত দেশে মহাকাশ গবেষণার দশ বছরের একটি রেখাচিত্র। এই রেখাচিত্রটি শুধু তাঁর কর্মীগোষ্ঠীর পালনের জন্যে একটি কর্মসূচি মাত্র ছিল না। এটা ছিল আমাদের কর্মোদ্যোগের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সন্দর্ভ, খোলাখুলি আলোচনার জন্যে। পরে তাকে কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করা হবে। বস্তুত সেটা ছিল একজন ব্যক্তি, যিনি তাঁর দেশে মহাকাশ গবেষণা কর্মসূচির সঙ্গে গভীর প্রেমে আশ্লিষ্ট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর কল্পনার, তাঁর স্বপ্নের এক ইশ্‌তাহার।

INCOSPAR-এ যার জন্ম হয়েছিল, সেই সব প্রথম দিকের চিন্তাভাবনাই এই প্রকল্পের কেন্দ্রে ছিল। তার মধ্যে ছিল টেলিভিশনের জন্যে, বিকাশ-সংক্রান্ত শিক্ষার জন্যে, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের এবং প্রাকৃতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে দূর থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ বাহনের নির্মাণ এবং নিক্ষেপ।

প্রথম কয়েক বছরের সক্রিয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধীরে ধীরে প্রায় অবসান ঘটিয়ে জোর দেওয়া হল আত্মনির্ভরতা ও দেশীয় প্রযুক্তির উপরে। প্রকল্পে ছিল পৃথিবীর অদূরে কক্ষপথে স্বল্প ওজনের উপগ্রহ প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্যে একটি SLV নির্মাণ, ভারতীয় উপগ্রহকে ল্যাবরেটরি মডেল থেকে উন্নীত করে মহাকাশের উপযুক্ত করা এবং অ্যাপোজি (apogee), বুস্টার মোটর (booster motors), মোমেন্টাম হুইল (momentum wheel) এবং solar panel deployment mechanism জাতীয় নানা প্রকার মহাকাশ যান উপ-ব্যবস্থা নির্মাণের কথা। আরও ছিল ভবিষ্যতের নানা সম্ভাবনা, যথা জাইরো (gyro), নানা ধরনের ট্রান্সডিউসার (transducers), টেলিমেট্রি (telemetry), অ্যাডেসিভ (adhesive) এবং পলিমার ইত্যাদি মহাকাশ ব্যতীত অন্যত্র ব্যবহারের জন্যে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সর্বোপরি, একটি স্বপ্ন ছিল এমন এক পরিকাঠামোর যার নানাবিধ কারিগরি এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা ও বিকাশের (R&D) কাজে প্রয়োজন হবে।

এই তো গেল একটি ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র গোষ্ঠী (Missile Panel) তৈরি। নারায়ণন এবং আমি, দুজনকেই তার সদস্য করে নেওয়া হল। নিজেদের দেশে নিজেরাই আমরা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করব, এই চিন্তাতেই উদ্দীপিত হলাম এবং নানা উন্নত দেশের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চর্চায় লেগে থাকতাম।

ট্যাকটিক্যাল মিসাইল এবং স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল-এর মধ্যে পার্থক্য প্রায়ই হয়ে থাকে অতি সূক্ষ্ম। সাধারণত "strategic" বলতে বোঝায় ক্ষেপণাস্ত্রটি হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে যাবে। কিন্তু যুদ্ধে ওই শব্দটি ব্যবহার করা হয় ক্ষেপণস্থল থেকে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নয়, লক্ষ্যবস্তুটি কী প্রকারের তাই বোঝাতে। স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করে শত্রুর দেশের একদম কেন্দ্রে গিয়ে, তাদের স্ট্র্যাটেজিক-ফোর্সের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে, নতুবা তার জনসমাজে, অর্থাৎ তার বিভিন্ন শহরে। ট্যাকটিক্যাল অস্ত্র হল সেই সব অস্ত্র, লড়াইয়ের গতি-প্রকৃতির ওপর যার প্রভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। সে লড়াই জমিতে, জলে কিংবা আকাশে, কিংবা তিন স্থানেই একত্রে হতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগ এখন অর্থহীন মনে হয়, কারণ মার্কিন বিমান বাহিনীর ভূমি-থেকে-নিক্ষিপ্ত টোমাহক ট্যাকটিক্যাল-এর ভূমিকা পালন করে, যদিও তার পাল্লা ৩০০০ কিমি। তখনকার দিনে কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেপণাস্ত্র আর মাঝারি পাল্লার সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র (IRBM) ছিল সমার্থক। যদিও IRBM-এর পাল্লা ছিল ১৫০০ নটিক্যাল মাইল অথবা ২৭৮০ কিমি-র মতো, এবং আন্তর্মহাদেশীয় সামরিক ক্ষেপণাস্ত্রের (ICBM) আরও দূরে যাবারও ক্ষমতা থাকে।

গ্রুপ ক্যাপটেন নারায়ণনের একটা ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল, এ দেশেই দূরনিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র (guided missile) তৈরি হোক। রুশদের ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ কর্মসূচিতে যে পাশবিক বলপ্রয়োগের মনোভাব প্রতিফলিত, তার তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। "সেখানে যদি করা যায়, এখানে কেন করা যাবে না? এখানে মহাকাশ গবেষণা যখন দেদার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি-সংক্রান্ত কাজের জন্যে জমি তৈরি করেই রেখেছে।" এই বলে নারায়ণন আমাকে খেপিয়ে তুলবার চেষ্টা করতেন।

১৯৬২ আর ১৯৬৫-র দুই যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে, ভারতীয় নেতৃত্বের সামনে সামরিক ভারী অস্ত্রশস্ত্রে স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ আর খোলা ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির সুরক্ষার জন্যে রাশিয়া থেকে বহু সংখ্যক ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র (SAM) সংগৃহীত হয়েছিল। গ্রুপ ক্যাপটেন নারায়ণন তাই মনপ্রাণ দিয়ে চাইতেন এইসব ক্ষেপণাস্ত্র দেশেই তৈরি হোক।

RATO মোটর এবং মিসাইল প্যানেল নিয়ে একত্রে কাজ করবার সময়ে নারায়ণন এবং আমার ছিল ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকা। সে ভূমিকা প্রয়োজনে আমরা পালটা-পালটি করে নিতাম। তার প্রবল আগ্রহ ছিল রকেট-বিদ্যা শিক্ষার এবং আমার অত্যধিক কৌতূহল ছিল আকাশপথে বাহিত অস্ত্র সম্পর্কে। তাঁর বিশ্বাস এত গভীর ছিল এবং এত প্রবল ছিল তাঁর আত্মনিয়োগের শক্তি যে, দেখলে একটা অনুপ্রেরণা পাওয়া যেত। অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে ভোর রাতে সেই যে টিলপট রেঞ্জ দেখতে গিয়েছিলাম, তার পর থেকেই নারায়ণন RATO মোটর নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। চাইবার আগেই সব কিছু তিনি প্রস্তুত করে রাখতেন। ৭৫ লক্ষ টাকার তিনি যোগাড় করলেন এবং আরও যদি কিছু হঠাৎ দরকার হয়, তার জন্যে আরও অর্থের প্রতিশ্রুতি আদায় করে রাখলেন। আমায় বললেন, "কী চাই বলবেন, আমি এনে দেব। শুধু, সময় চাইবেন না।" তাঁর অধীরতায় আমি মাঝে মাঝে হাসতাম, টি. এস. এলিয়টের *Hollow Men* থেকে এই লাইনগুলি পড়ে শোনাতাম:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা এবং সৃজনের মধ্যে,
আবেগ এবং সাড়ার মধ্যে
এসে পড়ে একটি ছায়া।

সেই সময়ে প্রতিরক্ষা 'গবেষণা ও বিকাশ' বহুল পরিমাণে আমদানি করা সরঞ্জামের ওপর নির্ভরশীল ছিল। দেশের মধ্যে প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। আমরা দুজনে মিলে এক বাজারের লম্বা ফর্দ তৈরি করলাম এবং আমদানির একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম। কিন্তু আমার এটা ভাল লাগল না—এর কোনও সুরাহা নেই? কোনও বিকল্প নেই? চিরকাল স্ক্রু-ড্রাইভার প্রযুক্তি নিয়েই থাকাটাই কী জাতির নিয়তি? ভারতের মতো একটি গরিব দেশ এ রকমের বিকাশের খরচ বইতে পারবে?

একদিন, অফিসে ছুটির পরে কাজ করছিলাম, RATO-র বিভিন্ন প্রকল্প আমি হাতে নেওয়ার পর যদিও এরকম প্রায়ই হত, আমি দেখলাম এক তরুণ সহকর্মী জয়চন্দ্র বাবু বাড়ি যাচ্ছেন। মাস কয়েক আগে বাবু আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমি এইটুকু মাত্র জানতাম যে, সব বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল ইতিবাচক, আর তিনি নিজের বক্তব্য বেশ ভাল বলতে পারতেন। আমি তাঁকে আমার অফিসে ডেকে নিয়ে একটু সোচ্চার চিন্তা করলাম। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কোনও পরামর্শ দিতে পার?" বাবু মিনিট খানেক চুপ করে থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত সময় চাইলেন। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তিনি একটু হোমওয়ার্ক করতে চান।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাবু আমার কাছে হাজির। তাঁর মুখ সাফল্যের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল, "আমরা করতে পারব, স্যার, আমদানি ছাড়াই RATO সিস্টেম করা যাবে। একমাত্র বাধা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার এবং সাব-কনট্র্যাক্ট দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অনমনীয় মনোভাব। আমদানি এড়াতে গেলে প্রধানত ওই দুটো কণ্টকময় ক্ষেত্রই এড়িয়ে যেতে হবে। তিনি আমাকে সাতটি দিকের কথা বললেন, কিংবা বলা উচিত, সাতটি ব্যাপারে স্বাধীনতা চাইলেন: অর্থ ব্যয় অনুমোদন করবেন অনেক জন ওপরওয়ালা মিলে নয়, এক জন ব্যক্তি পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্য হোক বা না হোক সমস্ত কাজে বিমান যোগে যাতায়াতের অনুমতি পাবেন, জবাবদিহি একজনের কাছেই করবেন, মাল পরিবহণ হবে বিমানযোগে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাব-কনট্র্যাক্ট দেওয়া যাবে, প্রযুক্তিগত বিচারের পর অর্ডার দেওয়া হবে, এবং দ্রুত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ সব দাবি কেউ কোনও দিন শোনেনি। সেখানে কাজকর্ম চলে চিরাচরিত পথে। আমি কিন্তু তাঁর এ সব প্রস্তাবের যাথার্থ্য উপলব্ধি করলাম। RATO

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল একেবারে আনকোরা নতুন প্রকল্প, তাই এখানে নতুন নিয়মনীতি চালু করা অন্যায্য কিছু নয়। খুবই গুরুত্ব দিয়ে বাবুর মতামতের সব ভালমন্দ দিক নিয়ে ভাবনায় একটা গোটা রাত্তির আমি ব্যয় করলাম। আর শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রকল্পটি অধ্যাপক সারাভাইয়ের কাছে উত্থাপন করব। প্রশাসনিক খোলা হাওয়ার সম্পর্কে আমার আবেদন শুনে, এর পেছনের নানা সুবিধার কথা বিবেচনা করে অধ্যাপক সারাভাই দ্বিরুক্তি না করে প্রস্তাবটির সপক্ষে সম্মতি দিলেন।

বিকাশ কর্মোদ্যোগ যখন এমন যে তার সাফল্যের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে, তখন ব্যাবসায়িক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তার কথাই বাবু এইসব প্রস্তাবে তুলে ধরলেন। কাজকর্মে গতির সঞ্চার করতে দরকার অধিকতর জনবল, অধিকতর দ্রব্যসামগ্রী, অধিকতর অর্থ। তার যোগান যদি না দিতে পার, লক্ষ্য নতুন করে স্থির করো! কী হলে সাফল্য অর্জিত হবে সেই অনুযায়ী তার মাপকাঠি বদলে ফেলো। বাবুর মধ্যে সহজাত ব্যাবসায়িক বুদ্ধি ছিল, বেশি দিন আমাদের সঙ্গে থাকা তার পোষাল না। ISRO ছেড়ে দিয়ে সে নতুন বিচরণ ক্ষেত্রের সন্ধানে নাইজেরিয়া চলে গেল। তবে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে বাবুর এই বুদ্ধিবিবেচনা আমি কোনও দিনও ভুলব না।

আমরা RATO মোটর যার মধ্যে থাকবে সেই অধ্যায়ের জন্য একটি মিশ্র কাঠামোর পক্ষেই মত দিয়েছিলাম, যাতে filament fibre glass/epoxy ব্যবহার করা হবে। তা ছাড়া আমরা একটি high energy composite propellant এবং real time-এ একটি event-based ignition এবং jettisoning system চেয়েছিলাম। বিমান থেকে জেটটিকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে একটি canted nozzle-এর নকশা করা হয়েছিল। প্রকল্প হাতে নেওয়ার বারো মাসের মধ্যে RATO-র প্রথম পরীক্ষা হল। পরের চার মাসে ৬৪টি static test হল। আমরা মোটে ২০ জন প্রযুক্তিবিদ্ সেই প্রকল্পে কাজ করছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

ততদিন ভবিষ্যতের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ বাহন (SLV)-এর কথাও ভাবা হয়ে গিয়েছে। মহাকাশ প্রযুক্তির যে বিপুল আর্থ-সামাজিক সুফল, তার কথা বিবেচনা করে ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক সারাভাই সিদ্ধান্ত করলেন, আমাদের নিজেদের উপগ্রহ নির্মাণ এবং উৎক্ষেপণের জন্যে দেশীয় সামর্থ্য প্রতিষ্ঠার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে। তিনি নিজে বিমানযোগে পূর্ব উপকূল পর্যবেক্ষণ করলেন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, পরিবহণ এবং বৃহদাকার রকেট উৎক্ষেপণের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্যে।

পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘূর্ণনের পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্যেই অধ্যাপক সারাভাই পূর্ব উপকূলের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাচন করলেন মাদ্রাজ (অধুনা চেন্নাই)-এর ১০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত শ্রীহরিকোটা দ্বীপ। এইভাবে SHAR রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের জন্ম হল। চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট দ্বীপটির প্রস্থ প্রশস্ততম স্থানে ৮ কিমি, উপকূল রেখা বরাবর সেটি লম্বিত। এর এলাকার পরিমাপ মাদ্রাজ শহরের সমান। এর পশ্চিম সীমানায় বাকিংহাম খাল এবং পুলিকট খাল।

১৯৬৮ সালে আমরা ইন্ডিয়ান রকেট সোসাইটি স্থাপন করলাম। তার অল্প দিনের মধ্যেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির (INSA) অধীনে একটি উপদেষ্টা সমিতি হিসেবে INCOSPAR পুনর্গঠিত হল এবং পরমাণু শক্তি বিভাগের (Department of Atomic Energy) (DAE) অধীনে প্রবর্তিত হল ভারতীয় মহাকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা কেন্দ্র (Indian Space Research Organization) (ISRO), এ দেশে প্রকৃত মহাকাশ গবেষণার কাজ করবার জন্যে।

এর মধ্যেই অধ্যাপক সারাভাই বাছাই করা বিজ্ঞানীদের তুলে নিয়েছেন তাঁর স্বপ্নের ভারতীয় SLV-কে সফল করার জন্যে। আমি যে একটি প্রকল্প-প্রধানের পদের জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলাম সে জন্যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। তার ওপরে অধ্যাপক সারাভাই আমাকে আরও একটি দায়িত্ব দিলেন, সেটি হল SLV-র চতুর্থ পর্যায়ের নকশা তৈরি। ড. ভি. আর. গোওয়ারিকর, এম. আর. কুরুপ এবং এ. ই. মুতুনয়গমকে অন্য তিনটি পর্যায়ের নকশা প্রস্তুতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে অধ্যাপক সারাভাই আমাদের কজনকেই বেছে নিলেন কেন? একটা কারণ মনে হয়, আমাদের পেশাগত পটভূমিকা। ড. গোওয়ারিকর মিশ্র প্রপেল্যান্ট (composite propellant) নিয়ে অসাধারণ ভাল কাজ করছিলেন; এম. আর. কুরুপ একটি উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরি গড়ে তুলেছেন prepellant, propulsion ও pyrotechnic-এর জন্যে। মুতুনয়গম high energy propellant-এর ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। চতুর্থ পর্যায়টি হবে মিশ্র কাঠামোর এবং তার জন্যে প্রয়োজন হবে করিগরি-সংক্রান্ত প্রযুক্তির অনেক নতুন নতুন উদ্ভাবন। আমাকে বোধহয় সেইজন্যেই ডাকা হয়েছিল।

চতুর্থ পর্যায়-কে আমি স্থাপন করেছিলাম দুটি দৃঢ়ভিত্তির ওপর, বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত অনুমান এবং শঙ্কাহীন সমর্থন। আমার চিরকালই ধারণা, সব কিছু একদম নিখুঁত, সর্বাঙ্গসুন্দর হতে হবে, এমন দাবি করে কাজে এগোতে গেলে তার জন্যে মূল্য অত্যন্ত বেশি দিতে হয়। ভুল-ত্রুটিকে গ্রহণ করতে হয় শিক্ষার একটা অঙ্গ হিসেবে। একটু বেপরোয়া ভাব এবং জেদ, আমার মতে ত্রুটিশূন্য হওয়ার চেয়ে ভাল। আমার সহকর্মীদের শিক্ষালাভকে আমি সর্বদা সমর্থন যুগিয়ে এসেছি, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতি নিরলস মনোযোগ দিয়েছি, সে প্রচেষ্টা সফলই হোক আর ব্যর্থই হোক।

আমার বিভাগে প্রতি পদে অগ্রগতি স্বীকৃত হত এবং তাকে জোরদার করা হত। যদিও আমার চতুর্থ পর্যায়ের সহকর্মীদের পুরোদস্তুর অংশীদার হওয়ার জন্যে যাবতীয় তথ্য প্রয়োজনে সবই তাঁদের দিতাম। আমি দেখলাম, সকলের কাজের সুবিধা করে দেওয়ার জন্যে, সকলকে শক্তি ও উৎসাহ যোগানোর জন্যে যতটা সময় আমার দেওয়া দরকার, দিতে পারছি না। ভাবলাম, কোথাও কি ভুল হচ্ছে আমার নাকি আমার সময় আমি ঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছি না? এই রকম এক সময়ে অধ্যাপক সারাভাই আমাদের কর্মশালায় একজন ফরাসি আগন্তুককে নিয়ে এলেন। তিনি এই সমস্যাটি চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। তিনি CNES-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক কুরিয়েন। CNES, অর্থাৎ Centre Nationale de Etudes Spatiales, ফ্রান্সে আমাদেরই অনুরূপ এক প্রতিষ্ঠান। তাঁরা তখন Diamont উৎক্ষেপণ-যানের কাজ করছিলেন। অধ্যাপক কুরিয়েন ছিলেন পুরোদস্তুর পেশাদার মানুষ। অধ্যাপক সারাভাই ও তিনি দুজনে মিলে আমাকে একটি লক্ষ্য স্থির করে নিতে সাহায্য করলেন। কী করে সে লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে পারব তা নিয়েও যেমন তাঁরা আলোচনা করলেন, তেমনি আবার ব্যর্থতার সম্ভাবনার বিষয়েও আমাকে সতর্ক করে দিলেন। অধ্যাপক কুরিয়েনের পরামর্শ পেয়ে আমি পর্যায়-৪-এর যে সব সমস্যা তার বিষয়ে অধিকতর অবহিত হলাম। আবার অধ্যাপক সারাভাইয়ের পরামর্শে অধ্যাপক কুরিয়েন তাঁর Diamont কর্মসূচির কাজের অগ্রগতিও আবার নতুন ভাবে বুঝতে শিখলেন।

অধ্যাপক কুরিয়েন অধ্যাপক সারাভাইকে পরামর্শ দিলেন, যাতে আমাকে ছোটখাটো কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বিশেষত যে সব কাজ নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না। তার ফলে আমি নিজেও কিছু কৃতিত্ব অর্জন করবার সুযোগ পাব। আমাদের সুপরিকল্পিত উদ্যোগ দেখে তিনি এত খুশি হলেন যে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন Diamont-এর চতুর্থ পর্যায় আমরা নির্মাণ করতে পারব কী না। মনে পড়ে, এতে অধ্যাপক সারাভাইয়ের ঠোঁটে একটি সূক্ষ্ম হাস্য ফুটে উঠেছিল।

বস্তুত Diamont এবং SLV—এই দুই বায়ুযান-কাঠামো (airfrme) পরস্পরের সঙ্গে খাপ খেত না। দুটির ব্যাস ছিল ভিন্ন আকারের এবং তাদের যন্ত্রাংশ যাতে পরস্পরের সঙ্গে বদলাবদলি করা যায় তার জন্যে রীতিমতো উদ্ভাবনের প্রয়োজন ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কোথা থেকে আরম্ভ করব। ঠিক করলাম, আমার সহকর্মীদের মধ্যে থেকেই সমাধান খুঁজব। আমি খুব যত্ন করে লক্ষ্য করতাম, তাঁদের দৈনিক নিয়মিত কাজকর্মের মধ্যে অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাওয়ার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় কী না। তা ছাড়া, যাঁর মধ্যে তিলমাত্র সম্ভাবনা দেখতাম তাঁকেই আমি প্রশ্ন করতাম, তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতে আরম্ভ করলাম। আমার বন্ধুরা কেউ কেউ আমাকে অত "সরল-মনা" হতে বারণ করলেন। এটা আমার একটা নিয়মই হয়ে দাঁড়াল যে, প্রত্যেকের যুক্তি পরামর্শ আমি লিখে নিতাম এবং আমার কারিগরি ও নকশা বিভাগের সহকর্মীদের হাতে লেখা নোট দিয়ে বলতাম, পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে পরবর্তী কার্য সমাধা করতে।

এই পদ্ধতিতে কাজ হল আশ্চর্যজনক ভাবে। আমাদের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে অধ্যাপক কুরিয়েন জানালেন আমরা এক বছরে যা করেছি, ইউরোপে আমাদের মতো কর্মীরা সে কাজ তিন বছরে কোনওক্রমে করে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি দেখলেন, আমাদের এই একটা বাড়তি সুবিধা ছিল যে, আমরা প্রত্যেকে ওপরের স্তরের এবং নীচের স্তরের কর্মীদের সঙ্গে কাজ করতাম। আমি নিয়ম করে নিয়েছিলাম, আমরা সবাই সপ্তাহে অন্তত একবার মিলিত হব। তাতে সময় এবং শক্তি ব্যয় হত ঠিকই, কিন্তু আমি মনে করতাম, এ এক অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার।

এক জন নেতা কতটা ভাল? তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেন, পুরোদস্তুর অংশীদার হিসাবে প্রকল্পটিতে তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং অংশগ্রহণ যতটা, তিনি ততটাই ভাল! আমরা যতটুকু কাজ করতে পেরেছি, ফল যতটা পেয়েছি, অভিজ্ঞতা যা অর্জন করেছি, সাফল্য যতটুকু লাভ করেছি তার সবটা ভাগ করে নেওয়ার জন্যে তাঁদেরকে যে আমি একত্র করতে পেরেছিলাম, আমার মনে হয়েছে তাতেই আমার সমস্ত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় সার্থক হয়েছে। যে দায়বদ্ধতা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার যে মনোভাব, বস্তুত যাকে বলা যায় বিশ্বাস, সে যে আমি পেলাম তার জন্যে এটুকু মূল্য খুব সামান্য বলেই আমার মনে হয়। আমার ছোট গোষ্ঠীটির মধ্যেই আমি নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কয়েকজনকে পেয়েছিলাম, আর এও জেনেছিলাম যে, নেতা প্রত্যেক স্তরেই থাকেন। ব্যবস্থাপনার এই একটা দিক, আমি জেনেছিলাম, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা SLV-IV পর্যায়-এর নকশার অদল-বদল করে তাকে Diamont বায়ুযান-কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। নতুন করে তার সংগঠন করে ২৫০ কেজি ৪০০ মি.মি ব্যাস থেকে ৬০০ কেজি ৬৫০ মি.মি. ব্যাসের পর্যায়ে উন্নীত করা হল। প্রায় দু বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পর যখন আমরা CNES-এর হাতে সেটিকে তুলে দিতে যাচ্ছি, ফরাসিরা হঠাৎ তাদের Diamont BC কর্মসূচি বাতিল করে দিল। আমাদেরকে তারা বলল, আমাদের Stage IV-এর আর তাদের প্রয়োজন নেই। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সেই যে দেরাদুনে আমি বিমান বাহিনীতে যোগ দিতে গিয়ে বিফল হয়েছিলাম, কিংবা বাঙ্গালোরে ADE-তে "নন্দী" প্রকল্পটির অকালমৃত্যু, সে-সব দিনই আমার কাছে যেন আবারো ফিরে এল।

আমার অনেক আশা, অনেক প্রচেষ্টা ছিল চতুর্থপর্যায় নিয়ে, যাতে Diamont রকেটের সঙ্গে সেটিকে ওড়ানো যায়। SLV-র অন্য তিনটি পর্যায়, রকেট-পুরশ্চালন (propulsion)-এর ক্ষেত্রে বিপুল কাজ যার জন্যে প্রয়োজন, তার তখনও অন্তত পাঁচ বছর বাকি। যাই হোক, Diamont BC Stage IV নিয়ে আমার যে আশাভঙ্গ, তা কাটিয়ে উঠতে আমার বেশি দিন লাগল না। আর যাই হোক, ওই প্রকল্পটিতে কাজ করতে আমার খুব ভাল লেগেছিল। কালক্রমে Diamont BC Stage যে শূন্যতার সৃষ্টি করে গিয়েছিল আমার মনে, RATO তাকে পূর্ণ করল।

RATO প্রকল্পের কাজ যখন এগিয়ে চলছে, SLV প্রকল্পটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকার নিতে আরম্ভ করল। তত দিনে উৎক্ষেপণ-যানের সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবস্থাই থুম্বাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বসন্ত গোওয়ারিকর, এম. আর. কুরুপ এবং মুতুনয়গম তাদের অসামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা রকেট-বিদ্যায় TERLS-কে এক বিপুল অগ্রগতির জন্যে প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

কর্মীগোষ্ঠী কী করে তৈরি করতে হয়, সেই বিদ্যায় অধ্যাপক সারাভাই ছিলেন এক অনুকরণীয় আদর্শ। একবার তাঁকে এমন একজনকে নির্বাচিত করতে হল যাকে SLV-র জন্য একটি টেলিকমান্ড পদ্ধতি, যার দ্বারা দূরে কোনও আদেশ প্রেরণ করা যায়, উদ্ভাবনের দায়িত্ব দেওয়া যায়। সে-যোগ্যতা দুজন ব্যক্তির ছিল। একজন বহু অভিজ্ঞতা ও বাস্তববোধসম্পন্ন ইউ. আর. রাও এবং দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত নতুন জি. মাধবন নায়ার। আমি যদিও মাধবন নায়ারের আনুগত্য ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অতি উচ্চধারণা পোষণ করতাম, তাহলেও তাঁর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি বলে আমি মনে করিনি। অধ্যাপক সারাভাই নিয়মিতই আসতেন। একবার মাধবন নায়ার তার নিজের উদ্ভাবিত, কিন্তু অতিশয় নির্ভরযোগ্য টেলিকমান্ড পদ্ধতিটি কী রকম কাজ করে দেখালেন। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞকে বাদ দিয়ে সেই তরুণকেই সমর্থন করতে অধ্যাপক সারাভাইয়ের দেরি হল না। মাধবন নায়ার শুধু যে তাঁর নেতার প্রত্যাশাই পূরণ করলেন তাই নয়, তার চেয়েও এগিয়ে গেলেন। পরবর্তীকালে তিনি মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান (Polar Satellite Launch Vehicle)-এর প্রকল্প অধিকর্তা হয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান এবং ক্ষেপণাস্ত্র, বলা যেতে পারে, দুই মাসতুতো ভাই। দুটির পিছনে ভাবনা-চিন্তা পৃথক, তাদের উদ্দেশ্যও পৃথক। কিন্তু রকেট-বিদ্যার একই বংশধারায় তাদের জন্ম। হায়দ্রাবাদে প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাবরেটরিতে (Defence Research and Development Laboratory) (DRDL) DRDO ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশের এক বৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এর ফলে ভূমি-থেকে-আকাশ (surface-to-air) ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ সংক্রান্ত প্রকল্পের অগ্রগতি যত দ্রুত হতে লাগল মিসাইল প্যানেল-এর বৈঠক এবং গ্রুপ ক্যাপটেন নারায়ণনের সঙ্গে আমার পারস্পরিক আদান-প্রদানও তত ঘন ঘন চলতে লাগল।

১৯৬৮ সালে, অধ্যাপক সারাভাইয়ের নিয়মিত থুম্বা পরিদর্শনের কালে একবার তাঁকে [ক্ষেপণাস্ত্রের] নাসিকাগ্র বর্জন কৌশল (nose-cone jettisoning mechanism) দেখানো হল। বরাবরের মতো, নিজেদের কাজের ফল অধ্যাপক সারাভাইকে জানাতে সেবারও আমরা সবাই খুব আগ্রহী ছিলাম। একটি সময়-জ্ঞাপক সারকিট (timer circuit)-এর সাহায্যে আমরা অধ্যাপক সারাভাইকে পাইরো (pyro)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৭৮www.amarboi.com ~

পদ্ধতিটিকে চালু করতে অনুরোধ করলাম। অধ্যাপক সারাভাই মৃদু হেসে বোতাম টিপলেন। কা-কস্য পরিবেদনা! আমরা সভয়ে দেখলাম, কিছুই হল না! আমরা হতভম্ব! আমি প্রমোদ কালে-র দিকে তাকালাম। তিনিই সময়-জ্ঞাপক সারকিটটির ডিজাইন করেছেন, সংযোজন করেছেন। এক ঝলকে আমরা দুজনেই মনে মনে ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণের কাজটি সেরে ফেললাম। আমরা অধ্যাপক সারাভাইকে কয়েক-মিনিট অপেক্ষা করতে বললাম, তারপর সময়-জ্ঞাপক যন্ত্রটিকে খুলে ফেলে পাইরোগুলোকে সরাসরি সংযোগ করে দিলাম। আবার অধ্যাপক সারাভাই বোতাম টিপলেন। পাইরোগুলি জ্বলতে আরম্ভ করল, নাসিকাগ্র ভাগটি (nose cone) খসে পড়ল। অধ্যাপক সারাভাই কালে-কে আর আমাকে অভিনন্দন জানালেন, কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম, তাঁর মন অন্য জায়গায় ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল আমরা বুঝতে পারলাম না। তবে সে-উৎকণ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হল না কারণ অল্প পরেই অধ্যাপক সারাভাইয়ের সেক্রেটারির কাছ থেকে ডাক পেয়ে আমি জানলাম, একটা খুব জরুরি বিষয়ে আলোচনার জন্যে নৈশভোজের পর অধ্যাপক সারাভাই আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

অধ্যাপক সারাভাই বরাবরের মতো ত্রিবান্দ্রমের কোবালাম প্যালেস হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর তলব শুনে আমি একটু ধাঁধায় পড়লাম। তাঁর স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী অধ্যাপক সারাভাই সাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের কথা বললেন, তার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, যথা উৎক্ষেপণ মঞ্চ, ব্লক হাউস, রাডার, টেলিমেট্রি ইত্যাদি, আজকের দিনে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় যে সব সুযোগ-সুবিধা থাকবেই বলে ধরে নেওয়া হয়, সে সব নিয়ে কথা বললেন। তারপর তিনি সকালবেলার ঘটনাটার কথা তুললেন। আমি ঠিক সেই ভয়ই করছিলাম। কিন্তু আমার গুরু যে আমাকে ভর্ৎসনা করবেন সে ভয় অমূলক ছিল। আমাদের পাইরো সময়-জ্ঞাপক সারকিটটি যে কাজ করল না, তা থেকে অধ্যাপক সারাভাই এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন না যে, আমাদের যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব, কিংবা পরিচালনার স্তরে ত্রুটিপূর্ণ বোঝাপড়া বা দক্ষতার অভাবই তার জন্যে দায়ী। তার বদলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, এ কাজ যথেষ্ট দুরূহ নয় বলে কী আমরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি? এছাড়া, তিনি এও বললেন যে, এমন কোনও সমস্যা যার কথা আমি আগে জানতাম না, তাতেই হয়তো আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি একেবারে মূল সমস্যাটি দেখিয়ে দিলেন। সমস্ত রকেট সিসটেম এবং রকেট পর্যায়গুলির কাজকে সংহত করে একাঙ্গীভূত করবার জন্যে আমাদের একটি ছাদের তলায় বসে সমস্ত কাজ করা দরকার। সেটির সুবিধা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সংযোজন বা একীভবনের (integration)-এর কাজ চলছে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে। এই পৃথক পৃথক পর্যায়ের কাজের মধ্যে সংহতি সাধনের বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা নেই। তারপর এক ঘণ্টা ধরে তিনি আমাদের কাজের লক্ষ্যটি নতুনভাবে নিরূপণ করে দিলেন। শেষ রাত্রে এসে সিদ্ধান্ত হল একটি রকেট প্রযুক্তি বিভাগ (Rocket Engineering Section) স্থাপন করতে হবে।

ভুল-ত্রুটির জন্যে একজন ব্যক্তি কী একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে দেরি করে ফেলতে পারে, কিংবা লক্ষ্য আদৌ অর্জিত না হতে পারে, কিন্তু অধ্যাপক সারাভাইয়ের মতো একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ভুলত্রুটিকেও কাজে লাগাতে পারেন, উদ্ভাবনে, নতুন চিন্তা-ভাবনায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে। সময়-জ্ঞাপক সার্কিটটিতে কী গলদ ছিল তা নিয়ে তাঁর বিশেষ কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কাউকে তার জন্যে দোষারোপ করার জন্যে তো নয়ই। ভুলত্রুটি হলে তিনি ধরে নিতেন, ও তো হবেই, আর সাধারণত তাকে সামলানোও যায়। তা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাকে কীভাবে মোকাবিলা করা হল, তাতেই বোঝা যায় একজনের দক্ষতা। পরবর্তীকালে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে ভুলত্রুটি যাতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, আগে থেকেই তার জন্যে ব্যবস্থা করা। কিন্তু এবারে, অদৃষ্টের কৌতুকে, সময়জ্ঞাপক-সারকিটের অকার্যকরতা থেকে জন্ম নিল একটি রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি।

আমাদের মিসাইল প্যানেলগুলির প্রত্যেক বৈঠকের পর সেই বৈঠকের বিবিধ সিদ্ধান্তের কথা আমি অধ্যাপক সারাভাইকে জানাতাম। দিল্লিতে ১৯৭১-এর ৩০ ডিসেম্বর তেমনই একটি বৈঠকের পর আমি ত্রিবান্দ্রমে ফিরে আসছিলাম। অধ্যাপক সারাভাইও ঠিক সেই দিনই থুম্বায় আসছিলেন SLV-র নকশা দেখবার জন্যে। আমি বিমানবন্দরের লাউঞ্জ থেকে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে প্যানেল বৈঠকের প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন, দিল্লির বিমান থেকে নেমে ত্রিবান্দ্রম বিমানবন্দরে আমি যেন অপেক্ষা করি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। কারণ সেই রাত্রেই তিনি মুম্বাই ফিরে যাবেন।

ত্রিবান্দ্রমে বিমান থেকে যখন নামলাম, একটা বিষাদের ছায়া যেন সেখানে ছেয়ে ছিল। বিমানের সিঁড়ির চালক কুট্টি আমাকে ধরা গলায় বললেন, অধ্যাপক সারাভাই আর নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হওয়ায় তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। আমার অন্তরাত্মায় পৌঁছে গেল সেই মর্মান্তিক আঘাত। আমাদের কথাবার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাটি ঘটেছে। আমার ওপর সে এক প্রচণ্ড আঘাত, এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের এ এক বিপুল ক্ষতি। শেষকৃত্যের জন্যে অধ্যাপক সারাভাইয়ের মরদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমানযোগে আহমেদাবাদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে সে রাত কেটে গেল।

পাঁচ বছর, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১, প্রায় ২২ জন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। তাঁরা সবাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক সারাভাই শুধু বড় বিজ্ঞানীই ছিলেন না, বড় নেতাও ছিলেন। আমার এখনও মনে আছে, ১৯৭০ সালের ৩ জুন SLV-3-র নকশা প্রস্তুত প্রকল্পের ষান্মাষিক অগ্রগতি তিনি পর্যালোচনা করছিলেন। প্রথম পর্যায় থেকে চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম তিনটি উপস্থাপন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হল। শেষ উপস্থাপনাটি হবে আমার। আমার টিমের যে পাঁচজন বিভিন্নভাবে নকশার কাজে সাহায্য করেছিলেন আমি তাঁদেরকেই উপস্থাপিত করলাম। সবাই দেখে অবাক হলেন, তাঁদের প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজের কথা বলবার সময়ে কতখানি সুনিশ্চিত কর্তৃত্বের পরিচয় দিলেন। এই উপস্থাপনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, সন্তোষজনক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।

হঠাৎ একজন বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী যিনি অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিলেন, তিনি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের প্রকল্পের যে উপস্থাপনা আপনার টিম করলেন, সে কথা তাঁদের কাজের ওপর, আপনি নিজে প্রকল্পের জন্যে কী কাজ করেছেন?" সেই প্রথম আমি অধ্যাপক সারাভাইকে প্রকৃতই বিরক্ত হতে দেখলাম। তিনি তাঁর সহকর্মীকে বললেন, "আপনার জানা উচিত, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাকে বলে। তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা এখনই দেখলাম। টিম-ওয়ার্ক-এর এ এক অসাধারণ প্রদর্শন। আমি বরাবরই প্রকল্প নেতাকে দেখে এসেছি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঐক্যসাধক হিসাবে। কালাম ঠিক তাই করেছেন।" আমার দৃষ্টিতে অধ্যাপক সারাভাই ভারতীয় বিজ্ঞানের মহাত্মা গান্ধী, যিনি নিজের টিমের মধ্যে নেতার উপযোগী গুণাবলী সৃষ্টি করে থাকেন এবং চিন্তাভাবনা দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

যাইহোক, একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থায় অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন হাল ধরে থাকলেন, তারপর ISRO-র নেতৃত্বের দায়িত্ব পেলেন অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান। থুম্বার সমস্ত কমপ্লেক্সটি, যার মধ্যে ছিল TERLS, মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র (SSTC), RPP, Rocket Fabrication Facility (RFF) এবং Propellant Fuel Complex (PFC)—এইসব প্রতিষ্ঠানকে একত্র করে একটি সংযুক্ত মহাকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হল এবং নিজের অস্তিত্বের জন্যে সে যাঁর কাছে ঋণী, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে তার নাম দেওয়া হল বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (VSSC)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রখ্যাত ধাতুবিদ্ ড. ব্রহ্মপ্রকাশ VSSC-র প্রথম অধিকর্তা হলেন।

উত্তর প্রদেশের বেরিলি এয়ারফোর্স স্টেশনে ১৯৭২-এর ৮ অক্টোবর RATO পদ্ধতির সফল পরীক্ষা হল, যখন একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন Sukhoi-16 জেট বিমান ১২০০ মিটারের হ্রস্ব দৌড়ের পরেই ভূমিত্যাগ করল। সাধারণত এই দৌড়ের দৈর্ঘ্য হয় ২ কিমি। সেই পরীক্ষায় আমরা 66th RATO মোটর ব্যবহার করেছিলাম। সেই প্রদর্শন দেখলেন এয়ার মার্শাল শিবদেব সিং এবং ড. বি. ডি. নাগচৌধুরী, যিনি তখন ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। এই প্রচেষ্টার ফলে ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছিল বলে শুনেছি। সেই শিল্পপতি-বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যৎদৃষ্টির ফল অবশেষে ফলতে আরম্ভ করল।

ভারতে মহাকাশ গবেষণা সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং INCOSPAR-এর চেয়ারম্যান হওয়ার আগে অধ্যাপক সারাভাই সাফল্য সহকারে কয়েকটি শিল্প-উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি জানতেন শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পৃথকভাবে বাঁচতে পারে না। অধ্যাপক সারাভাই প্রতিষ্ঠা করলেন সারাভাই কেমিক্যালস, সারাভাই গ্লাস, সারাভাই গেইগি লিমিটেড, সারাভাই মার্ক লিমিটেড এবং সারাভাই ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ। তাঁর স্বস্তিক অয়েল মিলস তৈলবীজ থেকে তৈল নিষ্কাষণে, সিনথেটিক ডিটারজেন্ট ও প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতে পথিকৃতের কাজ করেছিল। স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিডেটকে তিনি বৃহৎ পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুতের উপযোগী করে গড়ে তুললেন। আগে সে বস্তু বিপুল ব্যয়ে বিদেশ থেকে আমদানি হত। এখন, এই যে RATO-র স্বদেশিকরণ হল, এর দ্বারা তাঁর কর্মোদ্যোগ এক নতুন মাত্রা লাভ করল—ভারী সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি (military hardware) উৎপাদনে স্বনির্ভরতা এবং কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা ব্যয়ে সম্ভাব্য সাশ্রয়। RATO systems-এর সফল পরীক্ষার দিন এ সব কথা আমি স্মরণ করলাম। পরীক্ষা ব্যয় সমেত সমগ্র প্রকল্পটির জন্যে আমাদের ব্যয় হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকার কম। ভারতীয় RATO প্রতিটি ১৭,০০০ টাকার কমে উৎপাদন করা যেত, এবং আমদানি করা RATO, ভারতীয় RATO যার স্থান অধিকার করল, তার প্রত্যেকটির জন্যে খরচ পড়ত ৩৩,০০০ টাকা।

বিক্রম সারাভাই মহাকাশ কেন্দ্রে SLV-র কাজ পুরোদমে চলল। সমস্ত উপ-ব্যবস্থার (sub-systems) নকশা প্রস্তুত, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি নির্ধারিত হয়েছে, পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয়েছে, কর্মকেন্দ্র নির্বাচিত হয়েছে, লোকবল আলাদা করে রাখা হয়েছে, কর্মসূচি রচিত হয়েছে। অভাব ছিল শুধু একটি জিনিসের। বহু সংখ্যক কর্মকেন্দ্রে কাজ হচ্ছিল, তার প্রত্যেকটির নিজস্ব কর্মপদ্ধতি, নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ছিল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না তাদের কাজ-কর্মের সমন্বয়-সাধন, এবং এই বৃহৎ প্রকল্পটি ঠিকভাবে পরিচালনা করবার জন্যে ছিল না একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা সংগঠন।

অধ্যাপক ধাওয়ান, ড. ব্রহ্মপ্রকাশের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে এই কাজের জন্যে নির্বাচিত করলেন। আমি হলাম SLV-র প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এবং রিপোর্ট করতাম সরাসরি অধিকর্তা, VSSC-র কাছে। আমার প্রথম কাজ হল একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা রচনা। আমি ভাবলাম, এ কাজের জন্যে আমাকে কেন বেছে নেওয়া হল, যখন গোওয়ারিকর, মুতুনয়গম, কুরুপের মতো মস্ত মস্ত মানুষেরা ছিলেন? ঈশ্বরদাস, অরবমুদন এবং এস. সি. গুপ্তর মতো সংগঠক যখন পাওয়া যাচ্ছিল, আমি তাঁদের চেয়ে ভাল কাজ করব কেন মনে করা হল? আমার প্রশ্নটি আমি ড. ব্রহ্মপ্রকাশের কাছে ব্যক্ত করলাম। আমি কী পারি না আর অন্যরা কী পারেন তা নিয়ে তিনি আমায় বেশি মাথা ঘামাতে বারণ করলেন, তার বদলে আমাকে উপদেশ দিলেন নিজের কর্মক্ষমতা বাড়াতে।

ড. ব্রহ্মপ্রকাশ আমাকে উপদেশ দিলেন, কাজের মান যারা নামিয়ে আনে, তাদের সম্পর্কে যা করবার তা যেন আমি করি, এবং সাবধান করে দিলেন, যে সমস্ত কর্মকেন্দ্র আমাদের প্রচেষ্টায় যুক্ত হবে তাদের কাছ থেকে যেন তৎক্ষণাৎ সর্বোচ্চ মানের কাজের আশা না করি। "প্রত্যেকেই SLV-র যে অংশ নিয়ে যে কাজ করছে, তা নিয়ে কাজ করে যাবে, তোমার সমস্যা হবে সমগ্র SLV নির্মাণে অন্যদের ওপর তোমার নির্ভরতা। SLV-র লক্ষ্য অর্জন করতে হবে অনেককে সঙ্গে নিয়ে, অনেকের সাহায্য নিয়ে। তোমার দরকার হবে বিপুল সহিষ্ণুতা, বিপুল ধৈর্য।" আমার মনে পড়ল, উচিত-অনুচিতের ভেদ সম্পর্কে পবিত্র কোরান থেকে বাবা আমাকে কী পড়ে শোনাতেন, "আমরা তোমাদের কাছে এমন দূত পাঠাইনি যে আহার গ্রহণ করবে না, হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াবে না, তোমাদের একজনকে দিয়ে আমরা অন্যের পরীক্ষা নিই। তোমরা কী ধৈর্যশীল হবে না?"

এই ধরনের পরিস্থিতিতে যে সব পরস্পর বিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তার কথা আমি জানতাম। কোনও কর্মীগোষ্ঠীর নেতাকে প্রায়ই এই দুধরনের মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়: কারও কারও কাছে কাজের তাগিদটাই আসল; আবার কারও কাছে কর্মীরাই আসল। অনেকে এমনও আছেন, যাঁরা এই দুই মনোভাবের মধ্যবর্তী স্থানে কিংবা তার বাইরে অবস্থান করেন। আমার কাজ হবে তাঁদের এড়িয়ে চলা যাঁরা কাজ কিংবা কর্মী, কিছু সম্পর্কেই কোনও আগ্রহ বোধ করতেন না। আমি সঙ্কল্প করেছিলাম, ওই দুই অবস্থানের কোনওটিই আমি কাউকে নিতে দেব না। আমি বরং এমন অবস্থার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করব যাতে কর্ম এবং কর্মী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। আমার দৃষ্টিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার টিম ছিল এমন এক গোষ্ঠী যার প্রত্যেকে অন্যদেরকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। একত্র কাজ করার আনন্দ উপভোগ করবেন।

SLV-প্রকল্পের প্রথম লক্ষ্য ছিল এমন একটি SLV সিসটেম, SLV-3 প্রস্তুত করা যার দ্বারা পৃথিবীবেষ্টনকারী ৪০০ কিমি উর্ধ্বে অবস্থিত কক্ষপথে একটি ৪০ কেজি উপগ্রহ দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে স্থাপিত করা যায়।

তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলিকে আমি প্রধান প্রধান করণীয় কাজে রূপান্তরিত করলাম। তার মধ্যে একটি কাজ ছিল বাহনটির চারটি পর্যায়ের জন্যে একটি রকেট মোটর সিসটেম প্রস্তুত করা। সে কাজ সম্পন্ন করতে নানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হল; ৮.৬ টনের propellant grain এবং high mass ratio apogee rocket motor system যাতে high-energy propellants-এর ব্যবহার হবে। আরেকটি কাজ ছিল [উৎক্ষেপণ] যান নিয়ন্ত্রণ ও তাকে নির্দিষ্টপথে চালনা করা। তিন ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রণালী এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল, বায়ুগতির তল নিয়ন্ত্রণ, ঘাত ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (aerodynamic surface control, thrust vector control, reaction control) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের জন্যে, এবং চতুর্থ পর্যায়ের জন্যে ঘূর্ণন কৌশল (spin-up mechanism)। আরও দুটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, নিয়ন্ত্রণ প্রণালী সমূহের জন্যে inertial reference এবং guidance through inertial measurements। আরেকটি বড় কাজ ছিল বিভিন্ন পদ্ধতির একীকরণ এবং নিক্ষেপের সুবিধা সহ SHAR-এ উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; এবং উৎক্ষেপক এবং vehicle assembly fixtures-এর মতো উৎক্ষেপণ-সহায়ক পদ্ধতির পরিবর্ধন। মার্চ ১৯৭৩-এ ৬৪ মাসের মধ্যে "all-line" উড়ান পরীক্ষার একটি লক্ষ্য স্থির করা হল।

গৃহীত নীতির, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রকল্প রিপোর্টের বিষয়ে আমি প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। আর এছাড়া VSSC-র অধিকর্তার ন্যস্ত করা ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বাজেটের দায়িত্বও আমার হাতে থাকল। চারটি বিশেষ ক্ষেত্রে, রকেট মোটর ও উপকরণ, গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিন, এবং প্রেরণ ও উৎক্ষেপণ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ চারটি প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে দিলেন। আমাকে বলা হল, ডি. এস. রানে, মুতুনয়গম, টি. এস. প্রহ্লাদ, এ. আর. আচার্য, এস. সি. গুপ্ত এবং সি. এল. অম্বা রাও-এর মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আমাকে পরামর্শ দেবেন।

পবিত্র কোরান বলছেন, "আমি তোমাদের কাছে যা প্রদর্শন করেছি—তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের আগে যাঁরা গিয়েছিলেন এবং পরে যাঁরা যাবেন তাঁদের কথা জানিয়েছি, এবং ধার্মিক মানুষদের সতর্কবাণী শুনিয়েছি।" ওইসব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অংশ লাভের আমি চেষ্টা করেছি। "আলোর ওপরে আলো। আল্লাহ্ তাঁর আলোর কাছে যাঁদের তাঁর ইচ্ছা তাঁদের নিয়ে যান, তিনি সর্বজ্ঞ।"

প্রকল্পের কাজ করবার জন্যে আমরা তিনটি গোষ্ঠী তৈরি করলাম। কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী, সংযোজনা ও উড়ান পরীক্ষা গোষ্ঠী এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার উন্নয়ন গোষ্ঠী। প্রথম গোষ্ঠীর দায়িত্ব হল SLV-3 প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দেখাশোনা। যার মধ্যে ছিল প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মূল্যয়ন, উপব্যবস্থা নির্দিষ্টকরণ, উপকরণ, কর্মসূচি রূপায়ণ, গুণগতমান স্থির ও নিয়ন্ত্রণ। সংযোজনা ও উড়ান-পরীক্ষা-গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়া হল SLV-3-র একীকরণ এবং উড়ান পরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করার। যান্ত্রিক এবং বায়ুগতির আন্তঃতল সমস্যাসহ বাহন (vehicle)-এর বিশ্লেষণও তাকে করতে বলা হল। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার উন্নয়ন গোষ্ঠীকে VSSC-র বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার দায়িত্ব দেওয়া হল এবং এই তিনটি বিভাগের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করে বিভিন্ন উপব্যবস্থা নির্মাণে যে সব প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সমাধান করার কথা বলা হল ।

AMARBOI.COM

আমি হিসাব করে জেনেছিলাম ২৭৫ জন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হবে, কিন্তু পেলাম মোটে ৫০ জনের মতো। পরস্পর নির্ভরশীল সহযোগিতা যদি না পেতাম প্রকল্পের কাজ আরম্ভই হতে পারত না। এম. এস. আর. দেব, জি. মাধবন নায়ার, এস. শ্রীনিবাসন, ইউ. এস. সিং, সুন্দররাজন, আব্দুল মজিদ, বেদপ্রকাশ সন্ডালাস, নাম্বুদিরি, শশীকুমার, এবং শিবথানু পিল্লাই-এর মতো তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজের নিয়মাদি নিজেরাই তৈরি করে নিলেন, যাতে তাঁরা একটি প্রজেক্ট টিম হিসাবে ভাল কাজ করতে পারেন। ফলে তাঁরা প্রত্যেকে এবং একত্রে সকলে অসাধারণ কাজ করলেন। তাঁরা তাঁদের সাফল্য নিয়ে উৎসবের মতো করতেন, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের কাজের তারিফ করতেন। তাঁদের মনোবল তাতে বাড়ত, কোনও ব্যর্থতা এলে তাতে তাঁরা হতাশ হতেন না, এবং কঠোর পরিশ্রমের পর পুনরায় প্রাণশক্তি ফিরে পেতেন।

SLV-র প্রত্যেক সদস্য তাঁর নিজের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ফলে, স্বভাবতই প্রত্যেকে নিজের স্বাধীনতাকে মূল্য দিতেন। সে রকম বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কাজ করতে গেলে নেতাকে কখন হস্তক্ষেপ করবেন কখন করবেন না সে বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। হস্তক্ষেপ করতে হলে সদস্যদের কাজের সম্পর্কে নিয়মিত

খোঁজ-খবর নিতে হয়। আর হস্তক্ষেপ না করতে হলে, সদস্যদের ওপর আস্থা রাখতে হয় এবং বুঝতে হয় তাঁদের স্বাধীনতা প্রয়োজন নিজের কাজ করবার জন্যে। যাঁরা নিজেদের অন্তরের তাগিদে নিজেরা কাজ করবেন, তাদের ওপরে নির্ভর করতে হয়। নেতা যদি বড় বেশি হস্তক্ষেপ করেন, তাঁকে মনে হবে একটু বেশি দুশ্চিন্তাপ্রবণ, নাক-গলানো ধরনের মানুষ। আবার যাঁরা একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন না, মনে হবে তাঁরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। বিষয়টিতে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। আজ SLV-3 টিমের সদস্যেরা দেশের সব চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এম. এস. আর. দেব Augmented Satellite Launch Vechile (ASLV) প্রকল্পের প্রধান, মাধবন নায়ার Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)-র প্রধান এবং সন্তালস ও শিবথানু DRDO-র প্রধান কার্যালয়ের দুই চিফ কন্ট্রোলার। এঁদের প্রত্যেকে তাঁদের বর্তমান উচ্চ পদে উঠেছেন কঠিন পরিশ্রম ও দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা। প্রকৃতই, সে ছিল এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন টিম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

এই প্রকল্পের (SLV-3) নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর দেখলাম নানা জরুরি, এবং পরস্পরের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কাজে আমাকে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে—কমিটির কাজ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ, পত্রালাপ, পর্যালোচনা, নির্দেশ প্রদান এবং বিভিন্ন প্রকারের বহু বিষয়ে নিজেকে অবহিত রাখা।

আমার দিনের শুরু হত আমার বাসগৃহের চারপাশে ২ কিমি পদচারণা দিয়ে। প্রাতঃভ্রমণের সময়ে আমি সারাদিনের একটা কর্মসূচি প্রস্তুত করে ফেলতাম এবং সে-দিনের অবশ্য করণীয় দু-তিনটির ওপর জোর দিতাম। তার মধ্যে অন্তত একটি এমন কাজ থাকত, দূরপাল্লার কোনও লক্ষ্য যার দ্বারা অর্জিত হয়।

অফিসে এসে আমি প্রথমেই আমার টেবিলটি সাফ করতাম। দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র দেখে নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন প্রকার অনুযায়ী ভাগ করতাম: যে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দেওয়া দরকার, যা তেমন জরুরি নয় পরে করলেও চলবে এবং যা পাঠ করা দরকার। তারপর আমি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাগজগুলোকে সামনে নিয়ে আসতাম এবং বাকি সব কিছুকে নজরের বাইরে সরিয়ে দিতাম।

SLV-3-এর কথায় ফিরে আসি। তার নকশা প্রস্তুতের সময়ে ২৫০ উপ-সংযোজক এবং ৪৪টি প্রধান উপ-ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা করতে গিয়ে দেখা গেল তার সংখ্যা ১০ লক্ষে পৌঁছে গেল। এই জটিল কর্মকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলবে সাত থেকে দশ বছর। সেটা যাতে চালু থাকে তার জন্যে একটি প্রকল্প-রূপায়ণ কৌশল অবশ্য প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক ধাওয়ান তাঁর নিজের দিক থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে পরিষ্কার জানালেন যে, VSSC এবং SHAR-এর সমস্ত অর্থ এবং কর্মীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। আমাদের দিক থেকে আমরা উদ্ভাবন করলাম একটি ম্যাট্রিক্স (matrix) ধরনের ব্যবস্থাপনা যার দ্বারা ৩০০-র বেশি শিল্পের সঙ্গে আমরা এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব যাতে উৎপাদন সম্ভব হবে। লক্ষ্য ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের যেন প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সহকর্মীদের সামনে আমি তিনটি বিষয়ে জোর দিলাম, নকশা প্রস্তুতে দক্ষতার গুরুত্ব, লক্ষ্য নির্ধারণ ও তাকে অর্জন করা এবং সাময়িক অসাফল্যে ভেঙে না পড়ার ক্ষমতা তৈরি করা। এখন, SLV-3 প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে মনোযোগ নিবিষ্ট করার আগে আমি SLV-3-র নিজের সম্পর্কেই একটু বলে নিই।

একটি উৎক্ষেপণ বাহন (launch vehicle)-কে একটি মনুষ্যদেহ হিসাবে দেখলে মন্দ হয় না। প্রধান যান্ত্রিক গড়নটি যেন মানুষের শরীর, এবং নিয়ন্ত্রণ এবং সহায়ক ব্যবস্থাটি (তার বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাসহ) মানুষের মস্তিষ্ক। প্রপেল্যান্টগুলি পেশীতন্ত্র। উৎক্ষেপণ বাহন কীভাবে নির্মাণ করা হয়, কী দিয়ে নির্মাণ করা হয়? কোন্ প্রযুক্তি কৌশলে?

বহু বিচিত্র বস্তুর প্রয়োজন হয় উৎক্ষেপণ বাহন নির্মাণে। তাতে ধাতব বস্তুও আছে, অ-ধাতব বস্তুও আছে। ধাতুর মধ্যে, নানা ধরনের স্টেনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম সংকর, ম্যাগনেসিয়াম, টাইটেনিয়াম, তামা, বেরিলিয়াম, ট্যাংস্টেন ও মলিবডেনাম ব্যবহার হয়। মিশ্র পদার্থতে থাকে দুই বা ততোধিক বস্তুর মিশ্রণ, যে-সব বস্তু পরস্পর থেকে পৃথক এবং এই সব বস্তু কোনওভাবেই একে অপরের মধ্যে দ্রবণীয় নয়। যে-সব বস্তুর মিশ্রণ হয় সেগুলি ধাতব হতে পারে, জৈব কিংবা অজৈব হতে পারে। যেখানে অন্যান্য বস্তুর মিশ্রণের সম্ভাবনা অসংখ্য বলে ধরে নেওয়া হয়, সেখানে উৎক্ষেপণ বাহনের জন্যে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকা গঠনগত দিক থেকে মৌলিক পদার্থ দিয়ে এক অতি-বিশেষ ধরনের মিশ্রণ তৈরি হয়। প্লাস্টিক মিশ্রণকে পুনঃশক্তিশালী করতে এবং কেভলার, পলিমাইড ও কার্বন-কার্বন মিশ্রণ প্রবেশের জন্যে বহু দরজা খুলে রাখতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম গ্লাস-ফাইবার। বিশেষ ধরনের পোড়ানো মাটি হল চীনামাটি (ceramics) যা ব্যবহার করা হত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তরঙ্গের স্বচ্ছতা ঢাকতে (microwave transparent enclosures)। আমরা চীনা মাটি ব্যবহারের কথা ভেবেছিলাম কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে পরে সে ভাবনা বাতিল করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সমস্ত উপকরণকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ভারী যন্ত্রপাতিতে রূপান্তরিত করা হয়। বস্তুত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যতগুলো শাখা সরাসরি রকেট নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত, তার মধ্যে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে তার যোগ সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। সে liquid engine-এর মতো অতি উন্নত কোনও সিসটেমই হোক আর অতি সাধারণ কোনও যন্ত্রই হোক, শেষ পর্যন্ত তার নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও অতি সূক্ষ্ম কাজ করতে সক্ষম মেশিন টুল। আমরা ঠিক করলাম বিভিন্ন প্রযুক্তি আরও তৈরি করে নেব, যেমন লো অ্যালয় স্টেনলেস স্টিল-এর জন্যে ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি, ইলেকট্রোফরমিং প্রক্রিয়া এবং অতি সূক্ষ্ম প্রসেস টুলিং। কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি, যথা ২৫৪ লিটার উল্লম্ব মিশ্রক এবং groove machining facility, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের জন্যেও আমরা নিজেরাই নির্মাণ করব ঠিক করলাম। আমাদের বহু উপব্যবস্থা-র মধ্যে বেশকিছু এমন বৃহদাকার ও জটিল ছিল যে সেগুলির নির্মাণ ছিল বিপুল ব্যয়সাধ্য, তাই বিনা দ্বিধায় আমরা বেসরকারি ক্ষেত্রের বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং চুক্তিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (contract management plan) প্রবর্তন করলাম। পরবর্তীকালে সেই পন্থাই সরকার পরিচালিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত হল।

SLV-র যে অংশটিকে বলা যায় জীবন্ত, সেখানে আছে জটিল বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা। যান্ত্রিক কাঠামোটিতে সেটিই প্রাণদান করে, তাতে গতিসঞ্চার করে। এই সমস্ত ব্যাপারটি, যার মধ্যে সাধারণ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা থেকে উচ্চাঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা যেমন থাকে তেমনি সহায়ক এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও থাকে। সব মিলিয়ে মহাকাশ গবেষণায় তাকে বলা হয় 'Avionics' অর্থাৎ বিমান ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। ডিজিটাল ইলেকট্রনিকস, মাইক্রোওয়েভ রাডার ও রাডার ট্রান্সপন্ডারস এবং জাড্য উপাদান ও ব্যবস্থার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে "avionic" ব্যবস্থার বিকাশের প্রচেষ্টা বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে আগেই আরম্ভ হয়েছিল। SLV যখন উড্ডীন তখন তার সব কিছু ঠিক-ঠাক চলছে কি না, তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। তার চাপ, ঘাত, কম্পন, ত্বরণ ইত্যাদি বাহ্যিক অবস্থার পরিমাপের জন্যে নানা পরিমাপক যন্ত্রের (transducer) উদ্ভবের নতুন উদ্যম SLV নিয়ে এল। পরিমাপক যন্ত্র তার বাহ্যিক পরিমাপক-কে বৈদ্যুতিক সংকেত-এ রূপান্তরিত করে। তার নিজস্ব টেলিমেট্রি ব্যবস্থা সেই সব সংকেত-কে সুবিধামতো বাছাই করে তাদেরকে বেতার সংকেতে পরিবর্তিত করে ভূমিতে অবস্থিত কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে সে সব সংকেত-কে তার সাংকেতিক ভাষা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ ভাষায় পরিবর্তিত করে ট্রানসডিউসার যে-ভাবে তাকে পেয়েছিল সেই ভাবে রূপান্তরিত করে দেয়। সব কিছু ঠিকঠাক মতো চললে ভাবনার কিছু থাকে না, কিন্তু কোনও কিছু ত্রুটি দেখা দিলেই বাহনটি ধ্বংস করে ফেলতে হয়, যাতে যে অপ্রত্যাশিত কিছু করে না বসে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবার জন্যে একটি বিশেষ টেলিকমান্ড ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, রকেটে যদি বেচাল দেখা যায় তাকে ধ্বংস করবার জন্যে; এবং রাডার-ব্যবস্থার একটি বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে ইনফেরোমিটার ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হয়েছিল SLV-র পাল্লা এবং অবস্থান নিরূপণ করবার জন্যে। এ ছাড়া SLV প্রকল্প থেকেই সূত্রপাত হয় এদেশেই sequencer উৎপাদনের। তার কাজ ignition, স্তর বিভক্তকরণ, যানের অলটিটুড প্রোগ্রামার (যা রকেট যাতে ঠিক পথে যায় তার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সঞ্চিত করে রাখে) এবং স্ব-চালিত বৈদুতিন-ব্যবস্থা (রকেটটি যাতে পূর্ব নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে তার জন্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে) যাতে ঠিক সময় মতো নিজেদের কাজটি করে সেটা দেখা।

সমগ্র পদ্ধতিটি চালিত করবার জন্যে যে শক্তি প্রয়োজন, সেটি ব্যতিরেকে উৎক্ষেপণ বাহন (launch vehicle) ভূমি ত্যাগই করতে পারে না। প্রপেল্যান্ট সাধারণত হয় একটি দাহ্য পদার্থ, যা থেকে তাপ উৎপন্ন হয়, এবং যেটি রকেট ইঞ্জিনকে নির্গত কণা (ejection particles) সরবরাহ করে। প্রপেল্যান্ট যেমন শক্তির একটি উৎস, তেমনি ক্রমবর্ধমান শক্তির জন্যে সেটি একটি প্রয়োজনীয় বস্তুও বটে। রকেট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রপেল্যান্ট শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়, রকেট যে সব রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে যায় সম্মুখ দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে, তাকে বোঝাতেই।

রীতি অনুযায়ী প্রপেল্যান্ট-কে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, কঠিন ও তরল, আমরা কঠিন প্রপেল্যান্ট নিয়েই কাজ করেছিলাম। কঠিন প্রপেল্যান্ট-এ মূলত তিনটি বস্তু থাকে: জারক, জ্বালানি এবং অ্যাডিটিভ (additives)। কঠিন প্রপেল্যান্ট-কেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, মিশ্রিত (composite) এবং দ্বি-স্তরীয় (double base)। প্রথমটিতে থাকে একটি জারক কিংবা অজৈব পদার্থ (যেমন অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট) কৃত্রিম রবারের মতো জৈব জ্বালানির ম্যাট্রিক্স-এর মধ্যে। দ্বি-স্তরীয় প্রপেল্যান্ট তখনকার দিনে ছিল এক সুদূরপরাহত স্বপ্ন। তবু সে স্বপ্ন দেখবার সাহস আমাদের হয়েছিল।

এই আত্মনির্ভরতা, নিজের দেশে এইসব দ্রব্যের উৎপাদন, এসবই এল ক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে। এবং খুব সহজেই যে সব সময়ে এসেছে, তাও নয়। আমাদের দলে আমরা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায় নিজে নিজেই শিখেছিলাম। পিছন ফিরে যখন তাকাই, আমার মনে হয় আমাদের অশিক্ষিত পটুত্ব, চরিত্র ও আত্মনিবেদন SLV-কে গড়ে তুলবার কাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়ে উঠেছিল। সমস্যার উদ্ভব অনবরত হয়েই চলত। কিন্তু আমার সহকর্মীদের জন্যে আমাকে নিজের দশটি আঙুলের বেশি গুণতে হয়নি। মনে পড়ে একদিন গভীর রাত্রিতে কাজ শেষ হওয়ার পরে আমি লিখেছিলাম:

সেই হাতই সুন্দর, যে কাজ করে
আন্তরিকভাবে, সৎভাবে, সাহস ভরে,
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, সারাদিন ধরে

SLV-তে আমাদের কাজের পাশাপাশি DRDO প্রস্তুত হচ্ছিল একটি স্বদেশি ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার জন্যে। RATO প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হল, কারণ যে বিমানের জন্যে তার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেই বিমানটিই ততদিনে তার কালোপযোগিতা হারিয়েছে। নতুন বিমানের আর RATO-র প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে DRDO-থেকে নারায়ণকে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের টিমটির নেতা নির্বাচিত করা হল। আমরা ISRO-তে যেমন প্রযুক্তিগত বিকাশের এবং কর্মক্ষমতাকে উন্নততর করবার নীতিতে বিশ্বাস করতাম, DRDO তার বদলে এক-একটি করে বিদেশি দ্রব্যের জায়গায় দেশীয় উৎপাদনের প্রবর্তন করার নীতিই পছন্দ করত। রুশ প্রযুক্তির ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র SA-2-কে বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল স্বীকৃত গুণমান সম্পন্ন একটি ক্ষেপণাস্ত্রের বিভিন্ন শর্তাবলী (parameter) সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কী রকম পরিকাঠামো প্রয়োজন তা সুনিশ্চিত হবে। মনে করা হয়েছিল, একটি-একটি করে যদি বিদেশি দ্রব্যের জায়গায় একবার স্বদেশে নির্মিত বস্তু আমরা পাই, দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা স্বাভাবিকভাবেই আরও অগ্রগতি করতে পারব। প্রকল্পটি অনুমোদন পেল ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ, তার সাংকেতিক নামকরণ হল "ডেভিল", এবং মঞ্জুর হল ৫ কোটি টাকা প্রথম তিন বছরের জন্যে। তার প্রায় অর্ধেকই চলে যাবে বিদেশি মুদ্রায়।

এর মধ্যে নারায়ণনকে Air Commodore-এর পদে উন্নীত করে DRDL-এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই বিশাল কাজটির জন্যে তাঁর নবীন ল্যাবরেটরিটি তিনি স্থাপন করলেন হায়দ্রাবাদের দক্ষিণপূর্ব শহরতলীতে। যেখানে ছিল কবর আর পুরনো বাড়ি সেখানে আরম্ভ হল নতুন জীবনের স্পন্দন। নারায়ণন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটির প্রাণশক্তি ছিল অপরিমেয়—উৎসাহে সর্বদাই টগবগ্ করে ফুটতেন। নিজের চারপাশে তিনি ডেকে নিলেন একদল উৎসাহী মানুষ। এই প্রধানত বেসামরিক ল্যাবরেটরিতে তিনি টেনে আনলেন অনেক সামরিক অফিসারকে। SLV-র কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমি ডুবে গেলাম, তার ফলে মিসাইল প্যানেল-এর বৈঠকে আমার যোগদান কমতে কমতে, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। তবে, নারায়ণন এবং তাঁর "ডেভিল"-এর সম্পর্কে নানা গল্প ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছত। সেখানে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল।

RATO প্রকল্পে নারায়ণনের সঙ্গে কাজ করবার সময়ে আমি দেখেছিলাম, তিনি কাজ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। সব কিছু যাতে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে, সব কিছুর ওপর তাঁর দখলও থাকে, সে বিষয়ে তিনি খুব সজাগ ছিলেন। আমার মনে হত, তাঁদের মতো যাঁরা ম্যানেজার, যাঁরা মনে করেন, যে কোনও মূল্যেই হোক, কাজ যাতে হয় তা দেখতেই হবে, শেষ পর্যন্ত কি তাঁরা কর্মীদের এক নীরব অসহযোগিতার বিদ্রোহের মুখোমুখি হন?

১৯৭৫-এর নববর্ষের দিন একটা সুযোগ এল নারায়ণনের নেতৃত্বে যে কাজ হল তার একটা সঠিক মূল্যায়ন করার। অধ্যাপক এম. জি. কে মেনন, সেই সময়ে যিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা ছিলেন, এবং DRDO-র প্রধানও ছিলেন, তিনি ড. ব্রহ্মপ্রকাশকে চেয়ারম্যান করে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করলেন "ডেভিল" প্রকল্পে যে কাজ হয়েছে তার মূল্যায়ন করবার জন্যে। সেই টিমের মধ্যে আমাকে নেওয়া হল রকেট-বিশেষজ্ঞ হিসাবে ক্ষেপণাস্ত্রের বায়ুযান-গতি, গড়ন এবং চালনার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে। চালনার ব্যাপারে আমায় সহায়তা করলেন বি. আর. সোমশেখর এবং উইং কমান্ডার পি. কামারাজু। কমিটি সদস্যদের মধ্যে আর ছিলেন ড. আর. পি. সেনয় এবং অধ্যাপক আই. জি. শর্মা, যাঁরা বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় কী কাজ হয়েছে সেটা দেখবেন।

১৯৭৫-এর ১ ও ২ জানুয়ারি DRDL-এ আমাদের বৈঠক হল এবং আবার বৈঠক হল তার ছ-সপ্তাহ পরে। আমরা বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে গেলাম, সেখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। এ. ভি. রঙ্গ রাও-এর ভবিষ্যৎ-দর্শন, উইং কমান্ডার আর. গোপালস্বামীর সর্বদা এগিয়ে চলার প্রবণতা, ড. আই. অচ্যুত রাও-এর কাজে কোনও ফাঁক না রাখার অভ্যাস, জি. গণেশন-এর উদ্যম, এস. কৃষ্ণনের চিন্তার স্বচ্ছতা, এবং আর. বালকৃষ্ণনের খুঁটি-নাটির প্রতি নজর। এ সব দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। জে. সি. ভট্টাচার্য এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আর. স্বামীনাথন-এর সাদা-সিধে হাব-ভাব, বিশেষত তাঁদের সামনে যখন এত জটিল একটি কাজ তখন আমার খুবই অসাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯২www.amarboi.com ~

বলে মনে হল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ভি. জে. সুন্দরমের নিজের কাজে উৎসাহ ছিল লক্ষ্য করবার মতো। এঁরা সবাই অসাধারণ মেধাসম্পন্ন, নিজের নিজের কাজে আত্মনিবেদিত মানুষ। তাঁদের মধ্যে সামরিক অফিসার যেমন ছিলেন তেমনি অসামরিক বিজ্ঞানীও ছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে নিজের নিজের আগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত করে নিয়েছেন। তাগিদটা ছিল একটি ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে উড়িয়ে দেবার।

আমাদের শেষ বৈঠকটি হল ১৯৭৫-এর মার্চের শেষ দিকে ত্রিবান্দ্রমে। আমাদের মনে হল, প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্রের উপব্যবস্থায় একটি একটি করে আমদানি দ্রব্যের স্থান দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা পূরণের ব্যাপারে, অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়েছে। একমাত্র liquid রকেট-এর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এতে সফল হওয়ার জন্য আর কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। কমিটি এ বিষয়ে এক মত হল যে, ভূমি-বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার (ground electronics complex) নকশার কাজে ও বিকাশে যে দুটি লক্ষ্য ছিল, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং পদ্ধতি বিশ্লেষণ, সে দুটিতে প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করলাম যে, একের-থেকে-এক বিয়োগের দর্শন data design-এর ক্ষেত্রে কয়েক প্রজন্ম ধরে কর্তৃত্ব করে আসছে। এর ফলে বেশির ভাগ ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের কাজে যথেষ্ট মনোযোগী হতে সমর্থ হন না, আর এই ব্যবস্থাই VSSC-তে অনুশীলিত হয়ে আসছে। তাই এই ব্যবস্থাকে হঠিয়ে সর্বাগ্রে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কার্যত, এর ফলও পাওয়া গেল হাতেনাতে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হওয়া গেল, আসলে আমাদের এখনও বহুদূর যেতে হবে। স্কুলে পড়া একটা কবিতার কথা হঠাৎই আমার মনে পড়ল:

চিন্তা কোরো না, অস্থির হোয়ো না
দুর্বলচিত্ত! সুযোগ সবে আসতে আরম্ভ করেছে
সবচেয়ে ভাল কাজ এখনও শুরু হয়নি,
সবচেয়ে ভাল কাজ এখনও করা হয়নি।

কমিটি গভর্নমেন্টের কাছে জোরালো সুপারিশ করল, "ডেভিল"-এর কাজ চলতে দেওয়া হোক। আমাদের সুপারিশ গৃহীত হল; প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলল।

এদিকে VSSC-তে SLV আকৃতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। DRDL-এ কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছিল। সে তুলনায় আমাদের অগ্রগতি ছিল ধীর। শুধু নেতাকে অনুসরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নয়, আমার টিম আলাদা-আলাদা পথেই সাফল্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। বিভিন্ন টিমের মধ্যে এবং প্রত্যেক টিমের অভ্যন্তরে যোগাযোগ, বিশেষত তথ্য বিনিময়ের ওপরে জোর দেওয়াই ছিল আমাদের কাজের পদ্ধতির মূল কথা। এই বিশাল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার জন্যে, এক হিসাবে যোগাযোগই ছিল আমার "মন্ত্র"। আমার টিমের সদস্যদের কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজটি পাওয়ার জন্যে আমি খুব ঘন ঘন তাঁদেরকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কথা বলতাম, এবং বিশেষ জোর দিতাম, সেইসব লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রত্যেক সদস্যকে ঠিক কী করতে হবে, তার ওপর। সেই সঙ্গে কোনও গঠনমূলক চিন্তা যদি আমার অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে আমি পেতাম তাও গ্রহণ করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকতাম, সে সব চিন্তা-ভাবনা আমি পাঠিয়ে দিতাম পরীক্ষা করে কার্যে পরিণত করার জন্যে। সেই সময়ে আমার ডায়েরিতে কোনও এক জায়গায় আমি লিখেছিলাম:

কাজের বেলাভূমিতে
যদি পদচিহ্ন রেখে যেতে চাও,
দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাও

AMARBOI.COM

অধিকাংশ সময়ে যোগাযোগ স্থাপন ও আলাপচারিতা এই দুইকে গুলিয়ে ফেলা হয়। আসলে ও দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। আমি বরাবর (এবং এখনও) আলাপচারিতায় অত্যন্ত অপটু। কিন্তু মনে করি, আমি যোগাযোগ স্থাপনে দক্ষ। সুমধুর বাক্যালাপে প্রায়ই দেখা যায় কাজের কথা কিছু থাকে না। পক্ষান্তরে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য তথ্য-বিনিময়। এ কথা মনে রাখা খুবই জরুরি যে, যোগাযোগ হয় উভয়পক্ষীয়, তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তথ্য জানানো অথবা জানা।

আমি যখন SLV-র কাজ করছিলাম, বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হলে সেগুলি সুনির্দিষ্ট আকারে বিবৃত করবার জন্যে এবং তার সমাধানের জন্যে কী করা প্রয়োজন সেটাকে সুনির্দিষ্ট করবার জন্যে সে বিষয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে মতৈক্য-স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া যাতে আরও ভাল হয় সেই লক্ষ্যে আমি পারস্পরিক চিন্তা ও তথ্য বিনিময় করতাম। প্রকল্পটির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রকৃত পারস্পরিক যোগাযোগের সুদক্ষ ব্যবহার একটি হাতিয়ার। আমি সে কাজ কীভাবে করতাম? প্রথমত, আমি যা সত্য তাই বলবার চেষ্টা করতাম, বাস্তবের রূঢ়তাকে আমি আপাত মধুর করে পরিবেশন করতাম না। মহাকাশ বিজ্ঞান কাউন্সিলের (SSC) একটি পর্যালোচনা বৈঠকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে অত্যধিক বিলম্বে অতিষ্ঠ হয়ে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্ট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টস এবং VSSC-র আর্থিক উপদেষ্টার অসহযোগিতা এবং আমলাতান্ত্রিক "লাল ফিতা" নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ফেটে পড়লাম। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, হিসাবরক্ষণ বিভাগের কাজের পদ্ধতি বদলাতে হবে, এবং প্রকল্প কর্মীদেরকে অধিকতর ক্ষমতা দিতে হবে। আমার খোলাখুলি ক্ষোভ প্রকাশে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ একটু হকচকিয়ে গেলেন। তিনি সিগারেট নিভিয়ে ফেলে মিটিং থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমার স্পষ্ট ভাষা যে ড. ব্রহ্মপ্রকাশের মনোবেদনার কারণ হয়েছে, সে জন্যে সারারাত আমার অনুশোচনায় কাটল। তবুও আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমাকে নিজেকে টেনে নীচে নামাবার আগেই আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমি একটা কাজের প্রশ্ন নিজেকে করলাম, এইসব আমলা, যাদের কোনও সাড়া জাগে না কিছুতেই, তাঁদের সঙ্গে কি জীবন কাটাতে পারব? অবশ্যই না। তারপর আরেকটা প্রশ্ন নিজেকে গোপনে করলাম। ড. ব্রহ্মপ্রকাশ কিসে বেশি আঘাত পাবেন, আমার এখনকার আপাত অপ্রিয় ভাষণে, না ভবিষ্যতে কোনও একটা সময়ে SLV-র অকাল মৃত্যুতে? যখন দেখলাম আমার মস্তিষ্ক ও হৃদয় একই কথা বলছে, আমি ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করলাম। তবে আমার সৌভাগ্য যে পরের দিনই ড. ব্রহ্মপ্রকাশ আমাদের প্রকল্পকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করলেন।

একটি দলকে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি একমাত্র তখনই সফল হতে পারেন, যদি তিনি নিজের অধিকারেই যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীন, ক্ষমতাসম্পন্ন এবং প্রভাবশালী হন। যাতে তাঁর ওজন থাকে, গুরুত্ব থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে সন্তোষলাভেরও সম্ভবত এটি একটি পথ, কারণ স্বাধীনতা ও দায়িত্ব ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হওয়ার একমাত্র ভিত্তি। নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কীভাবে দৃঢ় করা যায়? তার জন্যে আমি দুটি পন্থা অবলম্বন করেছিলাম, তার কথা আমি আপনাদের জানাতে পারি।

প্রথম, নিজেকে শিক্ষিত ও পারদর্শী করে তুলতে হবে। জ্ঞান একটি অবিসম্বাদিত সম্পদ, নিজের কাজে প্রায়ই যার গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান যত আধুনিক হবে, তত স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। জ্ঞান কেউ অপহরণ করতে পারে না, একমাত্র কাল ছাড়া। কালক্রমে জ্ঞান তার যুগোপযোগিতা হারাতে পারে। নিজের টিমকে স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব দেওয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন নেতা চারদিকে যা ঘটছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকেন। নেতৃত্ব দেওয়া মানে, এক হিসাবে ক্রমাগত নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা। বিদেশে, পেশাদার ব্যক্তিরা সপ্তাহে কয়েক রাত্রি নৈশ কলেজে যাচ্ছেন, এ এক সাধারণ ঘটনা; সফল দলনেতা হতে গেলে, দিনের কর্মব্যস্ততার শেষে, সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলে গেলে, কাজের জায়গায় থেকে যেতে হবে, আগামী দিনের জন্যে নিজেকে আরও ভাল করে প্রস্তুত করবার জন্যে।

দ্বিতীয় পন্থাটি হল, ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব বহন করবার জন্যে প্রবল আগ্রহ নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হল, যে-সব শক্তি তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, সে সব শক্তির নিয়ন্ত্রণে তোমার হাত থাকা চাই। সক্রিয় থাকো! দায়িত্ব গ্রহণ করো! যে কাজে তোমার বিশ্বাস আছে, সেই কাজ করো। তা যদি না করো, অন্যদের হাতে তুমি তোমার ভাগ্যকে সমর্পণ করছ। প্রাচীন গ্রিস সম্পর্কে ইতিহাসবিদ এডিথ হ্যামিলটন লিখেছেন, "যে স্বাধীনতা তারা সবচেয়ে বেশি করে চাইল সেটি যখন হল দায়িত্ব থেকে মুক্তি, অ্যাথেনসবাসীরা তখনই তাদের স্বাধীনতা খোয়াল। আর কোনও দিন সে স্বাধীনতা তারা ফিরে পেল না।" সত্য হল এই যে, আমাদের স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্যে আমরা প্রত্যেকেই অনেক কিছু করতে পারি। যে-সব শক্তি আমাদেরকে বশে আনবার চেষ্টা করছে সে সব শক্তিকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সাহায্যে আমাদের নিজেদের শক্তিশালী করতে পারি। সেভাবেই আমরা অধিকতর শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারি যে সংগঠন অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করবে।

AMARBOI.COM

SLV-র কাজ যখন জোর কদমে এগোতে লাগল, অধ্যাপক ধাওয়ান এক নতুন রীতি চালু করলেন, যে প্রকল্পে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরকে সকলকে নিয়ে বসে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হবে। অধ্যাপক ধাওয়ান এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন। তিনি অনায়াসে বিভিন্ন ছিন্নসূত্রকে এক সঙ্গে গ্রথিত করে মসৃণভাবে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। VSSC-তে অধ্যাপক ধাওয়ানের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা বৈঠকগুলোকে একটা বড় ঘটনা বলে মনে করা হত। তিনি ছিলেন ISRO নামক জাহাজের প্রকৃত ক্যাপটেন—তিনিই কমান্ডার, তিনিই হাল ধরে থাকতেন, তিনিই তার ঘর-গেরস্থালির দেখাশোনা করতেন। তবু তিনি কখনও, যতটা জানেন তার চেয়ে বেশি জানার ভান করতেন না। বরং, যখন কোনও বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হত, তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, নিজের দ্বিধা-সন্দেহ অকপটে ব্যক্ত করতেন। তাঁর কথা আমার মনে পড়ে এমন একজন নেতা হিসাবে যাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গতভাবে, অথচ দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান ছিল এক নৈতিক কর্তব্য। একবার কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তার মন হয়ে উঠত অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যন্ত সে মন থাকত কাদার তালের মতো, যাতে সহজেই তার ওপর ছাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৬www.amarboi.com ~

পড়তে পারে। তারপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তাকে ফেলে দেওয়া হত কুমোরের আগুনের মধ্যে। সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসত কঠিন, টেঁকসই, ঝকঝকে চেহারা নিয়ে; তার আর পরিবর্তন হত না।

অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। যে কোনও বিষয়ে কথা বলবার সময়ে নিজের যুক্তিবোধ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারার দ্বারা তিনি শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। ডিগ্রির এক বিচিত্র সমাবেশ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন: গণিতে ও পদার্থবিদ্যায় বি. এসসি, ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ., মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি. ই., এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এম. এস., এরোনটিকস এবং গণিতে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (Caltech) থেকে পি. এইচডি।

তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধিক বিতর্ক খুবই উৎসাহজনক হত যা আমাকে ও আমার টিমের সদস্যদেরকে মানসিকভাবে সতেজ করে তুলত। সদাই দেখতাম তিনি আশাবাদী এবং করুণাপরবেশ। নিজেকে বিচার করবার সময়ে তিনি ছিলেন অতি কঠোর, কোনও ভাবেই নিজেকে রেয়াৎ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। অন্যদের বেলায়, তিনি বিচার করে রায় দিতেন খুব কড়া, কিন্তু দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করতেও দেরি করতেন না।

১৯৭৫ সালে ISRO হল একটি গভর্নিং বডি। একটি ISRO কাউন্সিল গঠিত হল, তাতে থাকলেন বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের অধিকর্তারা এবং Department of Space (DoS)-এর বরিষ্ঠ অফিসারেরা। এক দিকে DoS, যার ছিল সরকারি ক্ষমতা, এবং আরেক দিকে যে সব কেন্দ্রে কাজগুলো হত, এই দুইয়ের মধ্যে এর দ্বারা একটি প্রতীকী সংযোগ স্থাপিত হল এবং এক ধরনের সহযোগিতামূলক অংশীদারী ব্যবস্থাপনাও প্রবর্তিত হল। সরকারি দপ্তরের ভাষায় বলতে গেলে ISRO কেন্দ্রগুলিকে বলা হত অধীনস্থ সংস্থা, কিংবা সংযুক্ত দপ্তর (attached office), কিন্তু ISRO এবং DoS-এর ক্ষেত্রে আমরা ওই জাতীয় ভাষা কখনও ব্যবহার করতাম না। ব্যবস্থাপনায় অংশীদারিত্ব, যার জন্যে প্রয়োজন হয়, প্রশাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং যে সব সংস্থা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, এই দুই পক্ষের মধ্যে সক্রিয় সম্পর্ক, ISRO-র ব্যবস্থাপনায় সেটা ছিল এক অভিনব বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় গবেষণা ও বিকাশ (R&D)-এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সুদূরপ্রসারী প্রয়োগ পরে দেখতে পাওয়া যাবে।

নতুন ব্যবস্থায় আমি টি. এন. শেষন-এর সংস্পর্শে এলাম, তিনি তখন DoS-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি। তখন পর্যন্ত তলে তলে আমার মধ্যে প্রশাসকদের সম্পর্কে একটা সন্দেহের ভাব ছিল। সেই কারণে, প্রথম যখন আমি দেখলাম SLV-3 পরিচালন বোর্ড-এর সভায় শেষনকে অংশ নিতে, তখন আমারও একটা অস্বস্তির ভাব হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দ্রুত সেই অস্বস্তি শেষনের প্রতি প্রশংসার মনোভাবে রূপান্তরিত হল। তিনি মিটিং-এর কার্যসূচি খুব যত্ন সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন এবং সর্বদা তৈরি হয়ে মিটিং-এ আসতেন। তাঁর বিপুল বিশ্লেষণী ক্ষমতায় তিনি বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

SLV প্রকল্পের প্রথম তিন বছর ছিল বিজ্ঞানের অনেক চমকপ্রদ রহস্যের উন্মোচনের কাল। আমরা যেহেতু মানুষ, অজ্ঞানতা আমাদের নিত্য সহচর। নতুন যেটা, সেটা ছিল, সেই অজ্ঞানতার গভীরতার বিষয়ে আমার অবহিত হওয়া। আমার ভ্রান্ত ধারণা ছিল বিজ্ঞানের কাজ সব কিছুর ব্যাখ্যা করা, যার ব্যাখ্যা হয় না সে সব আমার বাবার এবং লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর এলাকায় পড়ে। তবে, এ সব বিষয়ে আমার বৈজ্ঞানিক সহকর্মীদের সঙ্গে কখনও আলোচনা করতাম না, পাছে তাঁদের সযত্ন-রচিত ধারণা সমূহের একাধিপত্য এতে বিপন্ন হয়।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে, গবেষণা ও বিকাশের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে আমি অবহিত হলাম। বিজ্ঞান স্বভাবত অনুসন্ধান-ধর্মী, তার কোনও নির্দিষ্ট সীমা-রেখা নেই। বিকাশের গন্তব্য নির্দিষ্ট। বিকাশের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি অনিবার্য, প্রতি নিয়তই ঘটে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি ভুলকে কাজে লাগানো সৃষ্ট, পরিবর্তন সাধনের, উন্নয়নের, সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সৃষ্টিকর্তা সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারদের সৃষ্টি করেছিলেন, বিজ্ঞানীরা যাতে অধিকতর কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন, সে জন্যে। যতবার বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পর, সম্পূর্ণ বুদ্ধিগম্য কোনও সমাধান নিয়ে হাজির হন, ইঞ্জিনিয়ারেরা তাঁদের সামনে উপস্থিত করেন, নতুন কোনও আলো, নতুন কোনও সম্ভাবনা। আমি আমার সহকর্মীদের সাবধান করে দিয়ে বলতাম, তাঁরা যেন বিজ্ঞানী না হন। বিজ্ঞান একটা প্রবল আবেগের তাড়না—এক অন্তহীন যাত্রা, যা হতে পারে, যার আশা দেখা যাচ্ছে, তার অভিমুখে। আমাদের সময়, আমাদের সম্বল সীমিত। আমরা SLV নির্মাণ করতে পারব কি না সেটা নির্ভর করছে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা সচেতন কি না তার ওপর। এখনই যে সমাধান আমাদের নাগালের মধ্যে পাচ্ছি, আমাদের পক্ষে যেটা সর্বাপেক্ষা, সেইটাকেই আমি বেছে নিতাম। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে যে প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে হবে, তার মধ্যে নতুন কিছু ঢোকাতে গেলেই সেটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে, প্রকল্প-নেতার উচিত সর্বদা যে প্রযুক্তির উপযোগিতা প্রমাণিত হয়ে গেছে তাই নিয়েই যত দূর সম্ভব কাজ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

এই প্রকল্পটি (SLV-3) এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে বড় বড় প্রযুক্তিগত কাজের দুটি কেন্দ্র, VSSC এবং SHAR, এই দুই জায়গাতেই, তার প্রপেল্যান্ট উৎপাদন, রকেট মোটর পরীক্ষা এবং যে কোনও বড় আকারের রকেটের উৎক্ষেপণ হতে পারে। SLV-3 প্রকল্পের 'অংশীদার হিসাবে আমরা আমাদের সামনে তিনটি লক্ষ্য রেখেছিলাম, ১৯৭৫ সালের মধ্যে সাউন্ডিং রকেটের সাহায্যে সমস্ত উপব্যবস্থার বিকাশ; ১৯৭৬ সালের মধ্যে sub-orbital উড়ান এবং ১৯৭৮ সালে চূড়ান্ত orbital উড়ান। এত দিনে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাতাসে একটা উত্তেজনা। আমি যেখানেই যেতাম, দেখতাম আমার সহকর্মীরা বেশ ভাল কিছু আমাকে দেখাতে পারছেন। অনেক কিছু এ দেশে প্রথম হচ্ছিল, এবং এ ধরনের কাজের কোনও অভিজ্ঞতা ভূমিতে অবস্থিত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এর আগে হয়নি। আমার কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কাজের নতুন মাত্রা আমি গড়ে উঠতে দেখলাম।

সাফল্য যখন নতুন মাত্রা লাভ করে, নতুন সৃষ্টির পথ তখন খুলে যায়। ব্যক্তি বিশেষের কর্মকুশলতা ও জ্ঞানকে তখন তা অতিক্রম করে যায়। একজন ব্যক্তি যা অবশ্যই জানে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি কতটা সমর্থ—এর চাইতে কর্মকুশলতার মাত্রা অনেক বেশি বিস্তৃততর ও গভীরতর। এর মধ্যে থাকে আচরণ, মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে এদের অবস্থান। যাকে বলা যায় সবচেয়ে ওপরের স্তর, সেই আচরণগত স্তরে, আমরা দেখতে পাই দক্ষতাকে এবং নির্ণয় করতে পারি জ্ঞানকে। সামাজিক ভূমিকা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্ম-ভাবমূর্তির মাত্রা বিদ্যমান মধ্যবর্তী স্তরে। উদ্দেশ্য ও বিশিষ্টতার অবস্থান সবচেয়ে ভেতরের স্তরে বা অন্তঃস্তলে। যদি আমরা ওই সব কর্মকুশলতার মাত্রা নিরূপণ করতে বা চিহ্নিত করতে পারি, যা কাজের সফলতার সঙ্গে খুবই গভীরভাবে যুক্ত তাহলে আমরা এক সঙ্গে এই দুটিকে ব্যবহার করতে পারি চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রের এক অসাধারণ কর্মকুশলতার পরিকল্পনা গঠনে।

যদিও SLV-3 তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, তার বিভিন্ন উপব্যবস্থা (subsystem) তখন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। ১৯৭৪-এর জুন মাসে আমরা Centaur সাউন্ডিং রকেট উৎক্ষেপণকে আমাদের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি পরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করলাম। SLV-র একটি আনুপাতিক হারে তাপ কমানোর বর্ম (scaled down heat shield), Rate Gyro Unit এবং Vehicle Attitude Programmer-কে Centaur রকেটের অঙ্গীভূত করা হল। এই তিনটি সিসটেমে প্রয়োজন হয়েছিল নানা বিষয়ে মিশ্রিত পদার্থ, নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। এ দেশে ও সব নিয়ে পরীক্ষা আগে কখনও হয়নি। পরীক্ষা পুরোপুরি সফল হল। এতদিন পর্যন্ত ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি সাউন্ডিং রকেট ছাড়িয়ে আর এগোতে পারেনি। আবহ বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করার বেশি ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচিতে আর কিছু যে করা সম্ভব হতে পারে, এমনকী যাঁরা এসব বিষয়ের খোঁজখবর রাখেন, তাঁরাও মানতে চাননি। এই প্রথম জাতির আস্থা আমরা অর্জন করলাম। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৪ জুলাই ১৯৭৪ সংসদে বললেন, (ভারতের প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ-বাহন নির্মাণের জন্যে) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, সাব-সিসটেম সমূহ এবং হার্ডওয়্যার নির্মাণের কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগোচ্ছে। কয়েকটি শিল্প সংস্থা যন্ত্রাংশ নির্মাণের কাজ করছে, ভারতের প্রথম orbital উড়ান ১৯৭৮-এ সম্পূর্ণ হবে বলে কর্মসূচিতে ঠিক করা আছে।"

যে কোনও সৃষ্টির মতো SLV-3-র সৃষ্টির সঙ্গেও অনেক বেদনা জড়িত ছিল। এক দিন আমার সহকর্মীরা এবং আমি যখন মোটরের প্রথম পর্যায়ের একটি static test-এর প্রস্তুতিতে মগ্ন, আমার পরিবারে একটি মৃত্যুর খবর পেলাম। আমার ভগ্নীপতি এবং গুরু জনাব আহমেদ জালালুদ্দিন আর ইহজগতে নেই। মিনিট দুয়েক আমি যেন পাথর। অসাড়, অচেতন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার যখন কাজে যোগ দিতে গেলাম, দেখলাম আমার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে গেছে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম, জালালুদ্দিনের সঙ্গে আমারও খানিকটা অংশ আমি হারালাম। আমার শৈশব আমার চোখের সামনে একটা ঝিলিক দিয়ে গেল। রামেশ্বরম মন্দিরের চারপাশে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াচ্ছি, চাঁদের আলোতে বালি চিক চিক করছে, তরঙ্গের নৃত্য, অমাবস্যার রাতে অন্ধকার আকাশ থেকে তারারা নীচের দিকে তাকিয়ে আছে, আর জালালুদ্দিন আমাকে দেখাচ্ছেন দিগন্তের আকাশ কেমন করে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। তিনি আমার বই কিনবার টাকার ব্যবস্থা করছেন, সান্টাক্রুজ বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন। আমার মনে হল আমি এক স্থান-কালের ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছি। আমার বাবা, তাঁর বয়স তখন একশ' ছাড়িয়েছে, তাঁর জামাতার শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন, যে জামাতার বয়স তাঁর অর্ধেক। আমার বোন জোহ্‌রার শোকদগ্ধ হৃদয়। তার চার বছর বয়সের পুত্রকে হারাবার শোক তখনও দগদগে ঘায়ের মতো। এইসব ছবি, আবছা-আবছা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেকটর ড. এস. শ্রীনিবাসনকে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে বললাম আমার অনুপস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যেতে।

সারারাত মফঃস্বলের বাস বদল করে করে রামেশ্বরম পৌঁছলাম পরের দিন। এই সারা সময়টা আমি চেষ্টা করে গেলাম অতীত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। যে অতীতের চিন্তা, আমার মনে হল, জালালুদ্দিনের সঙ্গেই সাঙ্গ হল। কিন্তু যে মুহূর্তে বাড়ি পৌঁছলাম, মৃত্যুর বৃশ্চিক-দংশন আরম্ভ হল। জোহ্‌রাকে, আমার ভাগ্নে মেহবুবকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনও ভাষা আমার নেই। দুজনেই অঝোর ঝরে কাঁদছিল। আমি দেখলাম, আমার চোখে জল নেই। জালালুদ্দিনকে আমরা শেষশয্যায় শায়িত করে দিলাম।

আমার বাবা অনেকক্ষণ আমার হাত ধরে থাকলেন। তাঁর চোখেও অশ্রু ছিল না। বললেন, "দেখছ না আবদুল, ঈশ্বর ছায়াগুলোকে কেমন দীর্ঘ করে দিচ্ছেন? ইচ্ছে করলে তিনি ওগুলোকে একই রকম রাখতে পারতেন। তিনি ধীরে ধীরে সব ছায়াকে ছোট করে আনেন। তিনি রাত্রির চাদর দিয়ে তোমায় ঢেকে দেন, নিদ্রা দেন তোমার বিশ্রামের জন্যে। জালালুদ্দিন এখন অনেক দিন ঘুমোবে। সে ঘুমে কোনও স্বপ্ন নেই। তার সমস্ত সত্তা বিশ্রাম করবে সেই অচৈতন্যের মধ্যে। ঈশ্বরের আদেশ ছাড়া আমাদের জীবনে কিছুই ঘটে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আবদুল, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো।" ধীরে ধীরে তিনি চোখ বুজলেন। এবং সমাধিস্থ হলেন।

মৃত্যুকে আমি কোনওদিন ভয় পাইনি। প্রত্যেককেই তো একদিন যেতে হবে। জালালুদ্দিন হয়তো একটু তাড়াতাড়ি গেলেন, একটু অকালে গেলেন। আমি বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পারলাম না। মনে হল আমার সমস্ত অন্তরাত্মা এক উদ্বেগ এক অস্থিরতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত জীবন আর আমার পেশাগত জীবনের মধ্যে এক সংঘর্ষে আমি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছি। থুম্বায় ফিরে আসার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনে হত, যা কিছু করছি সবই নিরর্থক। এ রকম আগে কোনওদিন হয়নি।

অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে আমার বিস্তারিত আলোচনা হল। তিনি আমায় বললেন, SLV প্রকল্পে আমি যে অগ্রগতি করেছি তার দরুন হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি নেমে আসবে। উদ্ভ্রান্ত ভাব প্রথমে কমে আসবে, তারপর একেবারে চলে যাবে। প্রযুক্তির গৌরবোজ্জ্বল বাস্তবতার দিকে এবং উদ্বর্তনের ফলে আমরা যে সব উতুঙ্গ সাফল্যের দিকে ধীরে কিন্তু অনিবার্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি, তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করলেন।

ধীরে ধীরে নকশার বোর্ড থেকে হার্ডওয়্যার বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করল। শশীকুমার নির্মাণ-কর্মকেন্দ্রগুলিকে নিয়ে একটি অতি কার্যোপযোগী নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন। কোনও যন্ত্রাংশের নকশা তাঁর হাতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই, তাঁর হাতে যা ক্ষমতা আছে তাই দিয়েই তিনি নির্মাণ কার্য আরম্ভ করতেন। নাম্বুদিরি ও পিল্লাই রাত-দিন তাঁদের প্রপালশান ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন, একই সঙ্গে চারটি রকেট মোটর গড়ে তুলবার জন্যে। এম. এস. আর. দেব ও সন্তালাস বাহনটির যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক সংগঠনের জন্যে সযত্নে নকশা রচনা করলেন। মাধবন নায়ার এবং মূর্তি VSSC-র বৈদ্যুতিন ল্যাবরেটরিগুলিতে যে সব সিসটেম উদ্ভাবিত হয়েছে সে-সব পরীক্ষা করতেন, এবং যেখানেই সম্ভব উড়ান সাব-সিস্টেমের-এর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতেন। ইউ. এস. সিং নিয়ে এলেন প্রথম উৎক্ষেপণ গ্রাউন্ড সিসটেমটি। তার মধ্যে ছিল টেলিমেট্রি, টেলিকমান্ড এবং রাডার। উড়ান পরীক্ষার জন্যেও তিনি SHAR-এর সঙ্গে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করলেন। ড. সুন্দররাজন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। ড. শ্রীনিবাসন, একজন উত্তম উৎক্ষেপণ-বাহন নক্‌শাকার, আমার কাজের মধ্যে যত অপূর্ণতা থাকত তিনি তা পূরণ করতেন। তিনি ছিলেন SLV-র উপ-প্রকল্প-অধিকর্তা। যা আমার নজর এড়িয়ে যেত, তা তিনি খেয়াল করতেন, যে সব কথা হয়তো আমার কানে গেল না, সে সব কথা তিনি শুনতেন, এবং সে সমস্ত সম্ভাবনার কথা আমার মনে উদয়ই হয়নি, সে সব সম্ভাবনার কথা আমাকে জানাতেন।

কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা শিখলাম, প্রকল্প-ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং কর্মকেন্দ্রের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপন। ঠিকমতো সমন্বয়-সাধন করতে না পারলে কঠোর পরিশ্রমও পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়।

ওই সময়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ISRO-র সদর দপ্তরের ওয়াই. এস. রাজন-কে বন্ধু হিসাবে পাওয়ার। রাজন ছিলেন (এখনও আছেন) দুনিয়া সুদ্ধ সকলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু। তাঁর বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ত সবাই, বিজ্ঞানী ছাড়াও ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, টার্নার, কনট্রাক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, সবাই। আজ যখন খবরের কাগজে আমাকে বলা হয় 'মানুষে মানুষে জোড়া লাগানোর কারিগর' (welder of people), আমি মনে করি রাজনের সঙ্গে আমার যে অভিজ্ঞতা, সেটাই সেই জোড়া লাগানোর মাল-মশলা। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এমন একটা ঐকতানের সৃষ্টি করেছিল যে SLV-তে প্রত্যেকের কর্মপ্রচেষ্টা মিলে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী সামগ্রিক উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৭৬ সালে আমার বাবা ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর স্বাস্থ্য, বার্ধক্যের কারণে, বেশ কিছু দিন থেকেই ভাল যাচ্ছিল না। জালালুদ্দিনের মৃত্যুও তাঁর শরীর ও মন ভেঙে দিয়ে গেছে। তাঁর বাঁচবার ইচ্ছাই চলে গিয়েছিল, যেন জালালুদ্দিনকে, যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন সেই দৈবলোকে ফিরে যেতে দেখে তিনিও সেখানে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হলেন।

আমি যখনই বাবার অসুস্থতার খবর পেতাম, শহর থেকে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে রামেশ্বরম যেতাম। প্রত্যেক বার আমার অহেতুক দুশ্চিন্তার জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করতেন, ডাক্তারদের পিছনে অর্থ ব্যয় নিয়ে আমাকে উপদেশ দিতেন। বলতেন, "তুমি এলেই আমি ভাল হয়ে যাই, টাকা খরচ করে ডাক্তার আনার কী দরকার?" এবারে তিনি ডাক্তারদের হাতের বাইরে, চিকিৎসার বাইরে, অর্থ ব্যয়ের বাইরে চলে গেছেন। মাটির দেহ মাটিতে মিশে গেল। আমার পিতা জয়নুল আবেদিন, ১০২ বছরের জীবন রামেশ্বরম দ্বীপে অতিবাহিত করে ১৫ জন নাতি-নাতনি এবং একটি প্রপৌত্র রেখে চলে গেলেন। একটা আদর্শ জীবন তিনি যাপন করেছেন। তাঁর সমাধিস্থ হওয়ার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি একলা যখন বসেছিলাম, ইয়েটস-এর মৃত্যুতে তাঁর বন্ধু অডেন-এর লেখা একটি কবিতা আমার মনে পড়ে গেল:

পৃথিবী, এক সম্মানিত অতিথিকে গ্রহণ করো,
উইলিয়াম ইয়েটস বিশ্রামে শায়িত হচ্ছেন।... ...
স্বাধীন মানুষ তার দিন যাপনের কারাগারে বন্দি,
তাকে শেখাও কী করে গুণগান করতে হয়।

সাংসারিক হিসাব-নিকাশের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমার বাবার মৃত্যু একটি বৃদ্ধের মৃত্যুর বেশি আর কিছু নয়। কোনও জনসভা অনুষ্ঠিত হল না, কোনও পতাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধনমিত হল না, কোনও সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ বেরোল না। তিনি রাজনীতিক ছিলেন না, পণ্ডিত ছিলেন না, ব্যবসাদার ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সরল মানুষ, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। আমার বাবা, যা জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, তাই সারা জীবন চেয়েছেন, যা মঙ্গল তাই চেয়েছেন। যা কিছু কল্যাণকর, স্বর্গীয় যা কিছু জ্ঞানের ও আলোকের তার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আমার বাবাকে দেখে আমার সব সময়ে কিংবদন্তীর আবু বেন আদেমের কথা মনে পড়ত, এক দিন রাত্রে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠে তিনি দেখলেন, এক দেবদূত একটি সুবর্ণমণ্ডিত পুস্তকে ঈশ্বরকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের নাম লিখে নিচ্ছেন। আবু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নাম কি সেই বইয়ে আছে? দেবদূত বললেন, নেই। হতাশ আবু তবু চিত্তের প্রফুল্লতা হারালেন না, বললেন, "আমার নাম তাঁদেরই মধ্যে লিখুন, যাঁরা মানুষকে ভালবাসেন।" দেবদূত লিখে নিলেন, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরের দিন রাত্রে দেবদূত আবার এলেন, চতুর্দিক আলোকিত হয়ে উঠল। যাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছেন, তাঁদের নাম তিনি দেখলেন। সেই তালিকার শীর্ষে আবু বেন আদেমের নাম।

অনেকক্ষণ আমি মা-র সঙ্গে বসে থাকলাম। কোনও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। থুম্বায় ফিরে আসবার জন্য মা-র কাছে যখন বিদায় চাইলাম, মা আমাকে ধরা গলায় আশীর্বাদ করলেন। তিনি জানতেন, স্বামীর ঘর তাঁর ছাড়া হবে না, সে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁরই দায়িত্বে। জানতেন, আমি তাঁর সঙ্গে সেখানে থাকতে পারব না। আমাদের দুজনকেই নিজের নিজের নিয়তিতে যা আছে সেইভাবে জীবন কাটাতে হবে। তাহলে আমার জেদ, আমার একগুঁয়েমিটাই কি খুব বেশি ছিল সেদিন, না কি একমাত্র SLV-কেই আমার ধ্যান-জ্ঞান করেছিলাম? তখনকার মতো আমার কি উচিত ছিল নিজের কাজকর্মের কথা ভুলে গিয়ে মা-র কথাই বেশি করে ভাবা? মাস কয়েকের মধ্যে আমার মা-র যখন দেহান্ত হল, একমাত্র তখনই এ সব কথা মনে করে আমার দুঃখ হয়েছিল।

SLV-3 Apogee রকেট, ফ্রান্সে যার পরীক্ষামূলক উড়ান হওয়ার কথা ছিল, কতগুলো বিশ্রী সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল। আমাকে সে-সব সমস্যার সমাধানের জন্যে ফ্রান্সে ছুটতে হল। রওনা হওয়ার আগে, এক দিন সন্ধ্যেবেলা আমি খবর পেলাম, মা আর নেই। প্রথম যে বাসটি পেলাম, তাতেই আমি নগরকয়েল রওনা হলাম। সেখান থেকে ট্রেনে সারা রাত লাগল রামেশ্বরম যেতে। পরের দিন সকালে মা-র শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। দুটি আত্মাই দেহধারণ করেছিলেন, আমি যাতে দেহধারণ করতে পারি, সে জন্যে। ওঁদের যাত্রা শেষ হয়েছে, আমাদেরকে দীর্ঘ পথে ক্লান্ত চরণে এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে হবে, জীবনের খেলা চালিয়ে যেতে হবে। আমার বাবা আমাকে প্রভাতে যে মসজিদে নিয়ে যেতেন, সেখানে গিয়ে আমি প্রার্থনা করলাম। আমি ঈশ্বরকে বললাম, স্বামীর ভালবাসা ও যত্ন ছাড়া আমার মা পৃথিবীতে বেশি দিন থাকতে পারতেন না। তাই মা স্বামীর কাছে যেতে চেয়েছিলেন। আমি ঈশ্বরের ক্ষমা ভিক্ষা করলাম। "যে কাজ আমি তাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছিলাম, সে কাজ তারা পরম যত্নে, পরম সাধুতায়, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন সহকারে সম্পন্ন করে আমার কাছে ফিরে এসেছে। আজ তাদের কাজ যে সম্পূর্ণ হল, তা নিয়ে তুমি শোক করছ কেন? তোমার সামনে যে কর্তব্য, সে দিকেই মনঃসংযোগ করো। তোমার কাজ দিয়ে আমার মহিমা তোমার জীবনে প্রকাশ পাক।" এ-সব কথা কেউ উচ্চারণ করেননি, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনলাম। আত্মার দেহত্যাগ বিষয়ে কোরানের একটি বাণী আমার অন্তরাত্মা পূর্ণ করে ধ্বনিত হল, "তোমার ধনসম্পদ, তোমার সন্তানসন্ততি, এ সবই প্রলোভন ছাড়া আর কিছু নয়, আল্লাহ-র কাছেই আছে অনন্ত পুরস্কার।" মনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম, স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। আমার চিরদিন মনে থাকবে, নমাজের আহ্বান যখন শুনতাম, আমাদের বাড়ি একটি ছোট্ট মসজিদে রূপান্তরিত হত। আমার বাবা আর মা নেতৃত্ব দিতেন, আমরা সবাই তাঁদের অনুসরণ করতাম।

পর দিন সকালে আমি আবার থুম্বায়, অবসন্ন শরীর, বিধ্বস্ত চিত্ত, কিন্তু বিদেশের মাটিতে ভারতীয় রকেট উড্ডীন করার সঙ্কল্পে অনড়।

AMARBOI.COM

SLV-3 রকেটের সফল পরীক্ষার পর আমি যখন ফ্রান্স থেকে ফিরে এলাম, ড. ব্রহ্মপ্রকাশ একদিন আমায় বললেন, ভেরনার ভন ব্রাউন আসছেন। রকেট বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁরা সবাই ভন ব্রাউনকে চেনেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর V2 ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়েছিলেন, যে ক্ষেপণাস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লন্ডনে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় মিত্রশক্তির হাতে ভন ব্রাউন ধরা পড়েন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ, NASA-র রকেট সংক্রান্ত কর্মসূচিতে তাঁকে সর্বোচ্চ পদে বসানো হয়। মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্যে কাজ করবার সময় ভন ব্রাউন জুপিটার (Jupiter) তৈরি করেন। ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে সেটি ছিল এক প্রধান পদক্ষেপ, জুপিটার ক্ষেপণাস্ত্র ছিল প্রথম IRBM, যার পাল্লা ছিল ৩০০০ কিমি.। ড. ব্রহ্মপ্রকাশ যখন আমাকে মাদ্রাজ বিমানবন্দরে ভন ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে থুম্বায় নিয়ে আসতে বললেন, স্বভাবতই আমি উত্তেজিত বোধ করলাম।

V-2 ক্ষেপণাস্ত্র (জার্মান শব্দ *Vergeltungswaffe*-এর সংক্ষেপিত রূপ) ছিল রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের ইতিহাসে এক বৃহত্তম একক কীর্তি। ভন ব্রাউন এবং তাঁর সহকর্মীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২০-এর দশকে VFR (Society for Space Flight)-এর প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, তারই শেষ ফল ছিল ওই ক্ষেপণাস্ত্র। এর সূত্রপাত একটি অসামরিক প্রচেষ্টা হিসাবে যেটি অবিলম্বে সামরিক কর্মোদ্যোগ হয়ে দাঁড়াল এবং ভন ব্রাউন হলেন কুমেরসডর্ফ (Kummersdorf)-এর জার্মান মিসাইল ল্যাবরেটরির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর। ১৯৪২ সালের জুন মাসে V-2 ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম পরীক্ষা বিফল হয়েছিল। একদিকে কাত হয়ে পড়ে তার বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কিন্তু ১৯৪২-এর ১৬ অগাস্ট সে হল শব্দের গতি অতিক্রমকারী প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র । ভন ব্রাউনের তত্ত্বাবধানে জার্মানির নোর্দহাউসেন (Nordhausen) অঞ্চলের কাছাকাছি বিশাল মাপের ভূগর্ভস্থ উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল ও অক্টোবরের মধ্যে ১০,০০০-এর অধিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপন্ন হল। এই লোকটি, যিনি একাধারে বিজ্ঞানী, নক্শা প্রস্তুতকারক, উৎপাদন ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসক, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপক, তাঁর সঙ্গে আমি একত্রে ভ্রমণ করব, এর চেয়ে আর বেশি কী আর একজন চাইতে পারে?

অ্যাভ্রো (Avro) বিমানে মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রম যেতে আমাদের লাগল ৯০ মিনিটের মতো। আমাদের কাজের কথা ভন ব্রাউন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবং এমনভাবে আমার কথা শুনে গেলেন যেন তিনি রকেট বিজ্ঞানের একজন ছাত্র। আমি আশা করিনি, আধুনিক রকেট বিজ্ঞানের যিনি জন্মদাতা, তিনি এতটা বিনম্র হবেন, এত খোলা মনে আমার কথা শুনবেন, এত উৎসাহ দেবেন আমাকে। তাঁর সঙ্গে যতক্ষণ ভ্রমণ করলাম, খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। তিনি এতটাই আত্ম-বিস্মৃত মানুষ যে, আমার পক্ষে মনে রাখা কঠিন হচ্ছিল, ক্ষেপণাস্ত্রের জগতে তিনি একজন বিরাট ব্যক্তি।

তিনি বললেন, SLV3-র দৈর্ঘ্য এবং ব্যাসের অনুপাত অর্থাৎ L/D ratio, যেটা ২২ হবে বলে নকশায় দেখানো হয়েছে, সেটা একটু বেশি, এবং উড়ানের সময় যে বায়ু-স্থিতিস্থাপক (aero-elastic) অর্থাৎ বায়ুগতির বলের কারণে যাতে আকারের হেরফের হয়ে যায় সেই সমস্যা হতে পারে। তার সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন উড়ানের সময় সে সমস্যা যাতে না হয় সেটা দেখতে হবে।

তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় জার্মানিতে কাটিয়ে আমেরিকাতে তাঁর কেমন লাগছে—এ কথা আমি ভন ব্রাউনকে জিজ্ঞাসা করলাম। যে অ্যাপলো মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দিয়েছে তার Saturn রকেটটি সৃষ্টি করে তিনি আমেরিকায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তিনি বললেন, "আমেরিকা এমন একটি দেশ যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিরাট, কিন্তু আমেরিকান নয় এমন সব কিছুকেই তাঁরা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে, হেয় জ্ঞান করে। তাদের একটা গভীর NIH (Not Invented Here)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ 'এখানে উৎপন্ন নয়' মনোবিকার আছে, এবং বিদেশি প্রযুক্তিকে তারা অশ্রদ্ধা করে। তোমরা যদি কিছু করতে চাও, নিজেরা করো।" তিনি আরও মন্তব্য করলেন, "SLV-3 প্রকৃত একটি ভারতীয় সৃষ্টি। তোমাদের নিজস্ব কোনও কোনও সমস্যা হতে পারে, কিন্তু সব সময় মনে রাখবে, শুধু সাফল্যকেই ভিত্তি করে কিছু নির্মাণ করা যায় না, ব্যর্থতার ওপরেও ভিত্তি করতে হয়।"

রকেট উদ্ভাবন এবং নির্মাণে যে কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, যতটা দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে হয়, তার কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন, একটা দুষ্টুমী ঝিলিক দিয়ে গেল তাঁর চোখে। বললেন, "রকেট নির্মাণে কঠোর পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। এ এমন একটি খেলা নয় যাতে শুধু কঠিন পরিশ্রম করলে মেডেল পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্যই সামনে থাকলেই চলবে না, যত দ্রুত সম্ভব সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার কলা-কৌশলও আয়ত্তে থাকা চাই।"

"নিজেকে কোনও কাজে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ করা মানে শুধু হাড়-ভাঙা খাটুনি নয় বরং নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করে তোলা। অনেকে আছে যারা সারা জীবন পাথর দিয়ে প্রাচীর গাঁথে। মৃত্যুর সময়ে তারা রেখে যায় মাইলের পর মাইল পাথরের প্রাচীর, তারা কত কঠিন পরিশ্রম করেছিল তার মূক সাক্ষী।"

আরও বলে চললেন তিনি, "আবার অন্যেরাও প্রস্তরের প্রাচীর নির্মাণ করে, এবং যত দিন তারা একটির ওপরে আরেকটি পাথর বসিয়ে যায়, তাদের মনশ্চক্ষে একটা ভবিষ্যতের চিত্র থাকে, একটা লক্ষ্য থাকে। সেটা হতে পারে একটি চাতাল, তার পাথরের প্রাচীর দিয়ে গোলাপ ফুলের গাছ লতিয়ে উঠেছে, গ্রীষ্মের অলস অপরাহ্নে বসবার জন্য চেয়ার পাতা আছে। কিংবা সেই পাথরের প্রাচীর হয়তো একটি আপেলের বাগানকে ঘিরে রেখেছে। যখন তারা থাকবে না তখন পাথরের দেওয়াল ছাড়াও আরও কিছু তারা রেখে যাবে। লক্ষ্য দিয়েই পার্থক্য রচিত হয়। রকেট বিজ্ঞান যেন তোমার পেশা, তোমার রুজি রোজগারের উপায় না হয়, সে যেন হয় তোমার ধর্ম, তোমার ব্রত।" ভন ব্রাউনের মধ্যে আমি কি অধ্যাপক সারাভাইয়ের খানিকটা দেখতে পেলাম? সে কথা মনে হওয়াতে আমার একটু আনন্দ হল।

আমার পরিবারের তিনজনের পর পর তিন বছর মৃত্যু হওয়ায় আমাকে সমস্ত মন আমার কাজে ঢেলে দিতে হল। তা না হলে কাজ করতেই পারতাম না। আমার সমগ্র সত্তাকে SLV নির্মাণের কাজে ডুবিয়ে দিতে চাইলাম। আমার মনে হল আমার পথ যেন আমি খুঁজে পেলাম, উপলব্ধি করলাম ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগতে কী জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন, কী আমার জীবনের উদ্দেশ্য। মনে হল, একটি বোতাম টিপে জীবনটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন ভাবে সাজালাম, সন্ধ্যেবেলা ব্যাডমিন্টন খেলা চলবে না, শনি-রবি নেই, ছুটি নেই, পরিবার নেই, আত্মীয়পরিজন নেই, SLV-র বৃত্তের বাইরে বন্ধু বলেও কিছু নেই।

জীবনের ব্রত সফল করতে গেলে লক্ষ্যের দিকে একাগ্রতা চাই। আমার মতো লোককে প্রায়ই "কাজ-পাগলা" আখ্যা দেওয়া হয়। ওই শব্দটিতে আমার আপত্তি আছে, কারণ শব্দটির মধ্যে অসুস্থতার, অপ্রকৃতিস্থতার একটা ইঙ্গিত আছে। পৃথিবীর মধ্যে যে কাজটি করতে আমি সবচাইতে বেশি করে চাই, যে কাজ করে সবচাইতে বেশি আনন্দ পাই, সেই কাজ যখন আমি করি, তাকে কখনওই বিকার বলা যায় না। কাজ করবার সময়ে আমার মনে পড়ে যায় ষড়বিংশ "সাম"-এর এই কথাগুলি, "হে প্রভু, আমাকে পরীক্ষা করো, যাচাই করো।"

নিজের পেশায় সর্বোচ্চ শিখরে একজন উঠতে পারবে কি না সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সমগ্র সত্তাকে সে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়োগ করল কি না, তার ওপরে। সর্বশক্তি দিয়ে যে কাজ করতে চায়, অন্য কিছু চাইবার তার আর অবকাশ থাকে না। আমার সঙ্গে এমন কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা, যে কাজের জন্য তাঁরা বেতন পাচ্ছেন, সে কাজ সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করার কথা ভাবতেও পারেন না। আবার এমন লোকও আমি দেখেছি, যাঁরা সপ্তাহে ৬০, ৮০, এমনকী ১০০ ঘণ্টাও কাজ করেছেন, কারণ নিজের কাজ তাঁদের মনোগ্রাহী, তৃপ্তিদায়ক মনে হয়েছে। জীবনে যাঁরা সফল তেমন সমস্ত পুরুষ ও নারীর জীবনেই এই একটি জিনিস দেখা যায়, তাঁরা সবাই নিজের নিজের কাজে আত্মনিবেদিত। যে সব মানসিক চাপ জীবনে আসে, তুমি কি তার মোকাবিলা করতে সক্ষম? একজন কর্মব্যস্ত-কর্মক্ষম মানুষ, আর একজন, যে কী করবে বুঝতে পারছে না, এই দুজনের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের জীবনে যা ঘটে, তা নিয়ে তারা কী করবে তার কিনারা করতে না পারা। মানুষই চায় বাধা-বিঘ্ন, অসুবিধা ইত্যাদি। চায়, কারণ সফলতাকে উপভোগ করাটাও তার পক্ষে কম জরুরি নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক ধরনের পরাবুদ্ধি (super-intelligence) থাকে। তাকে উদ্দীপিত করতে হবে, যাতে নিজের যে-সব গভীরতম চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস তাকে পরীক্ষা করা যায়।

সে কাজ একবার করা হয়ে গেলে, অর্থাৎ নিজেকে নিজের কাজের প্রতি পূর্ণ একাগ্রতা দান করতে পারলে, তখন ভাল স্বাস্থ্য এবং অপরিমেয় কর্মশক্তিরও দরকার হয়। সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে শক্তি প্রয়োজন, তা সে এভারেস্টের শিখরেই হোক আর নিজের পেশার শিখরেই হোক। বিভিন্ন লোক জন্মের সময় বিভিন্ন পরিমাণ শক্তির ভাণ্ডার নিয়ে আসে। যার শক্তি সবচেয়ে আগে পুড়ে শেষ হয়ে যায়, যে সবচেয়ে আগে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তার উচিত যত শিগ্‌গির সম্ভব নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে নতুন করে সংগঠিত করা।

১৯৭৯ সালে এক ছয় সদস্যের দল একটি জটিল দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর উড়ানের সংস্করণ প্রস্তুত করছিল, static test এবং মূল্যায়ন (evaluation)-এর জন্য। দলটি T-15 মিনিটে, অর্থাৎ পরীক্ষার ১৫ মিনিট আগে কাউন্টডাউনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখবার সময়ে দেখা গেল ১২টি ভালভের মধ্যে একটি সাড়া দিচ্ছে না। টিমের সদস্যেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষার জায়গায় গেলেন, সমস্যাটা কী হচ্ছে দেখবার জন্য। হঠাৎ লাল নাইট্রিক অ্যাসিড ভর্তি অক্সিডাইজার আধার অর্থাৎ ট্যাঙ্কটি ফেটে গেল। টিমের সদস্যেরা অ্যাসিডে পুড়ে গেলেন বেশ ভাল মতো। আহত হয়ে পড়া সদস্যদের ভোগান্তি দেখাটা আমাদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল খুবই মর্মান্তিক এক অভিজ্ঞতা। কুরুপ আর আমি ছুটে গেলাম ত্রিবান্দ্রম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, আর বলতে গেলে সবাইকে হাতেপায়ে ধরলাম আমাদের সহকর্মীদের ভর্তি করে নেওয়ার জন্য, যদিও সেই সময়টাতে হালপাতালে ছটি খালি বেড ছিল না।

সেই ছ'জন আহত ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন শিবরামকৃষ্ণন নায়ার। তাঁর শরীরের কয়েক জায়গায় অ্যাসিড লেগে গিয়েছিল। যতক্ষণে হাসপাতালে বেড খালি পাওয়া গেল, তার মধ্যে তাঁর তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। আমি তাঁর বিছানার পাশে বসে থাকলাম। ভোর তিনটে নাগাদ শিবরামকৃষ্ণনের জ্ঞান ফিরে এল। তাঁর প্রথম কথাই হল, দুর্ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ এবং আমাকে এই বলে আশ্বাসদান করলেন যে, দুর্ঘটনায় পরীক্ষাটি যতখানি পেছিয়ে গেল সে সময়টুকুর ক্ষতি তিনি পূরণ করে দেবেন। সেই তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর আন্তরিকতা এবং আশাবাদ আমার মনে গভীর রেখাপাত করল।

শিবরামকৃষ্ণনের মতো মানুষ যাঁরা, তাঁরা এক আলাদা জাত। তাঁরা সব সময়েই সংগ্রাম করেন, প্রত্যেকবারই আগের বারের চেয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এবং যেহেতু তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন তাঁদের স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, তাই তাঁরা যে আনন্দ লাভ করেন বা যে পুরস্কার পান, সেটা আর কিছু নয়, প্রবাহের মধ্যে থাকার আনন্দ। এই ঘটনায় আমার টিমের ওপর আস্থা আরও অনেক বেড়ে গেল যে, টিম সাফল্যে এবং বিফলতায় পাহাড়ের মতো অটল থাকবে।

'প্রবাহ' শব্দটি আমি অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছি, কিন্তু তার অর্থ বুঝিয়ে বলিনি। "প্রবাহ" কী? আর প্রবাহের যে সব আনন্দ, তাই বা কী? আমি বলতে পারতাম, সে সব যাদু করা মুহূর্ত। সে সব মুহূর্ত, ব্যাডমিন্টন খেলার সময়ে কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জগিং" করার সময়ে যে নেশার মতো লাগে, অনেকটা সেই রকম। প্রবাহের অনুভূতি জাগে যখন আমরা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করি। প্রবাহের সময়ে, একটার পর একটা কাজ আসে যেন নিজস্ব কোনও নিয়মে, যে কাজ করছে তার যেন তাতে কোনও হাত থাকে না। কোনও তাড়াহুড়ো থাকে না, মনোযোগ কোনও দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না। অতীত এবং ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে না। যে কাজ করছে সে, আর তার কাজ এক হয়ে যায়। আমরা সবাই SLV-র প্রবাহের স্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, খুবই কঠিন পরিশ্রম করতাম আমরা, কিন্তু খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। প্রাণশক্তিতে ভরপুর, খুব তাজা লাগত নিজেদেরকে। এ রকম কী করে হল? এই প্রবাহ কে সৃষ্টি করল?

সেটা সম্ভব হয়েছিল বোধ হয় এই কারণে যে, আমাদের সামনে যে-সব লক্ষ্য ছিল সেগুলোকে আমরা একটা অর্থবহ আকারে গ্রথিত করতে পেরেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্যকে প্রথমে আমরা যতদূর সম্ভব প্রশস্ত পরিচয়ে চিহ্নিত করতাম, তারপর অনেকগুলি বিকল্পের মধ্যে থেকে এমন একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতাম যেটি অর্জন করা সম্ভব। এই যে সমস্যার সমাধানে পিছনে হেঁটে একটা সৃজনধর্মী পরিবর্তনের উদ্ভাবন, এতেই আমরা একটি প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করতাম।

SLV-3-র ভারী ভারী যন্ত্রপাতি যখন আসতে আরম্ভ করল, তখনই আমাদের নিজেদের কাজে একাগ্র মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়তে থাকল। আমার নিজের মধ্যে একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস অনুভব করলাম, মনে হল আমার নিজের ওপর এবং SLV-3 প্রকল্পের ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারার একটি ফল হল প্রবাহ। তার জন্যে প্রথম প্রয়োজন যতদূর সাধ্য পরিশ্রমে এমন কোনও কাজ করা যা সহজ নয় এবং যা করতে মন চায়। সে কাজ এত কঠিন হওয়ার দরকার নেই যা একেবারেই অসাধ্য, কিন্তু এমন হওয়া চাই যাতে একটু কষ্ট করতে হয়, যে-কাজ করবার সময়ে মনে হয়, গতকালের চাইতে আজ আবার কাজ আরেকটু ভাল হচ্ছে, কিংবা আগের বার যখন এ-কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম তখনকার চেয়ে আজ আরেকটু ভাল করে করতে পারছি। প্রবাহের মধ্যে থাকার জন্য আরেকটি প্রয়োজন হল, বেশ খানিকটা নিরবচ্ছিন্ন সময়। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কোনও প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে অন্তত আধ-ঘণ্টা সময়ের দরকার হয়। এবং অনবরত যদি বিঘ্ন ঘটতে থাকে, তা প্রায় সম্ভবই হয় না।

এরকম কি কোনও কৌশল আছে, যাতে একটি প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া যায়? এর উত্তর হল "হ্যাঁ" তা আছে। আগে যতবার প্রবাহের মধ্যে থাকা হয়েছে, সেই ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে, তার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকের একটা নিজস্ব সহজাত কম্পাঙ্ক (frequency) থাকে তার ফলে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক (stimuli) তার মধ্যে সাড়া জাগায়। কেউ নিজে নিজেই তাকে চিহ্নিত করতে পারে যদি কোনও একটি সাধারণ অংশ তার হাতে থাকে। একবার যখনই এই সাধারণ অংশ পাশে সরিয়ে দেওয়া যায়, তখনই সেই প্রবাহের পর্যায়ে এসে পড়তে পারবে।

SLV-র কাজ করবার সময় আমি বহুবার সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি, প্রায় প্রতিদিনই। সে সময় এমন দিন ছিল যে আমি কাজ করতে করতে চোখ-তুলে দেখেছি ল্যাবরেটরি খালি হয়ে গেছে। অর্থাৎ ছুটির সময় পেরিয়ে গেছে। অনেক দিন এমনও হয়েছে, আমার সহকর্মীরা এবং আমি কাজের মধ্যে এমন ডুবে আছি যে, লাঞ্চের সময় এসে চলে গেছে, আমাদের কারও মনে হয়নি যে ক্ষিদে পেয়েছে।

আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে যখন সেই সব ঘটনার বিশ্লেষণ করি তখনও সেই একই অর্থই আমি দেখতে পাই যে, এই প্রবাহের অভিজ্ঞতা তখনই হত, যখনই কোনও প্রকল্প সম্পূর্ণ তার কাছাকাছি পৌঁছত; কিংবা প্রকল্পটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছত যখন সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগৃহীত হয়ে গেছে এবং সমস্যাটিকে গুটিয়ে ফেলার কাজ শুরু হব হব সময়ে, সংঘাতের মধ্যে থেকে উঠে আসা যে-সব ভাবনা তাকে চিহ্নিত করা গেছে এবং বিরুদ্ধবাদী স্বার্থের তুলে ধরা ভাবনা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমাদের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমি এও বুঝতে পারতাম যে, এসব ঘটত সেইসব দিনে, যখন অফিসে শান্তি বিরাজ করছে, কোথাও কোনও সংকট নেই, কোনও বৈঠক নেই। এই অবস্থাই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৯-র মাঝামাঝি নাগাদ SLV-3-র স্বপ্ন সফল হল।

আমাদের কর্মসূচি অনুযায়ী SLV-3-র প্রথম পরীক্ষামূলক উড়ান হওয়ার কথা ছিল ১৯৭৯-র ১০ আগস্ট। সেই অভিযানের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল একটি সম্পূর্ণ রূপে একাঙ্গীভূত উৎক্ষেপণ বাহন নির্মাণ, তার মধ্যেকার বিভিন্ন ব্যবস্থা, স্টেজ মোটর, গাইডেন্স এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিন উপব্যবস্থার মূল্যায়ন; এবং শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের বিভিন্ন ভূমিস্থ ব্যবস্থা, যথা checkout, tracking, টেলিমেট্রি এবং real time data facilities-এরও মূল্যায়ন। ২৫ মিটার দীর্ঘ চার পর্যায়ের ১৭ টন ওজনের SLV রকেটটি অবশেষে সকাল ৭টা ৫৮ মিনিটে সুন্দরভাবে ভূমি ত্যাগ করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নির্দিষ্ট পথ ধরে যাত্রা করল।

পর্যায়-১ কাজ করল নিখুঁতভাবে। এরপর প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছল খুবই মসৃণভাবে, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছি, SLV-3-র আকারে আমাদের আশা ডানা মেলেছে। হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠলাম। দ্বিতীয় পর্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে! ৩১৭ সেকেন্ডের পর উড়ানটি বাতিল করা হল। শ্রীহরিকোটার ৫৬০ কিলোমাটির দূরে বাহনের ধ্বংসাবশেষ, যার মধ্যে পেলোড সহ আমার প্রিয় চতুর্থ পর্যায় ছিল, সমুদ্রে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

এই ঘটনায় গভীর হতাশায় আমাদের মন পূর্ণ হল। আমার মনে আশাভঙ্গের সঙ্গে এল রাগ। হঠাৎই আমি অনুভব করলাম আমার হাঁটু দুটি যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছে, যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। সমস্যাটা আমার শরীরের নয়; আমার মনের ভেতরে যেন কিছু একটা ঘটছে।

আমার হোভারক্রাফট "নন্দী"র অকাল মৃত্যু, RATO-কে পরিত্যাগ, SLV-Diamont-এর বাতিল হয়ে যাওয়া চতুর্থ পর্যায়, এক ঝলকে সে বই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেক বছর ধরে আমি এই সব ধরনের ব্যর্থতা, প্রচেষ্টার অপমৃত্যু সহ্য করতে শিখেছি, আবার নতুন স্বপ্ন নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছি। সেইদিনটাতে ওই সব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা যেন আবার আমাকে গভীরভাবে গ্রাস করেছিল।

ব্লক হাউস-এ কে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেন ওরকম হল বলে আপনার মনে হয়?" আমি একটা উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এত ক্লান্ত ছিলাম যে ভাববারও ক্ষমতা ছিল না। সারা রাত ধরে শেষ মুহূর্তের প্রহর গোণার পর, উৎক্ষেপণ হয়েছিল ভোরবেলা। তার ওপরে গত এক সপ্তাহ আমি প্রায় ঘুমোইনি বললেই হয়। যেমন দেহে তেমনি মনে সম্পূর্ণ অবসন্ন অবস্থায় আমি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

কার যেন কোমল স্পর্শ অনুভব করলাম আমার কাঁধে। জেগে উঠে দেখি তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ড. ব্রহ্মপ্রকাশ আমার শয্যার পাশে বসে। জিজ্ঞাসা করলেন, "খেতে যাওয়া হবে না কি?" তাঁর স্নেহ, তাঁর ভাবনা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। পরে জেনেছিলাম, ড. ব্রহ্মপ্রকাশ তার আগেও দুবার আমার ঘরে এসেছিলেন, আমাকে নিদ্রিত দেখে ফিরে গিয়েছেন। অতক্ষণ ধরে তিনি আমার ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষা করেছেন, আমাকে খেতে নিয়ে যাবেন। আমি বিষণ্ণ বোধ করছিলাম, কিন্তু একাকী বোধ করিনি। ড. ব্রহ্মপ্রকাশের সাহচর্য আমার মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ভরে দিল। খাবার সময়ে তিনি হালকা কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন, ভুলেও একবারও SLV-3-র নামও করলেন না। কিন্তু আমার মনে যেন শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালোরে ADE-তে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট হোভারক্রাফটের নমুনা। উদ্ভাবক ও পাইলট-হিসাবে আমি এটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম।

থুম্বার খ্রিস্টান অধিবাসীদের সহৃদয় আনুকূল্যে, এই গির্জায় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি স্থাপিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

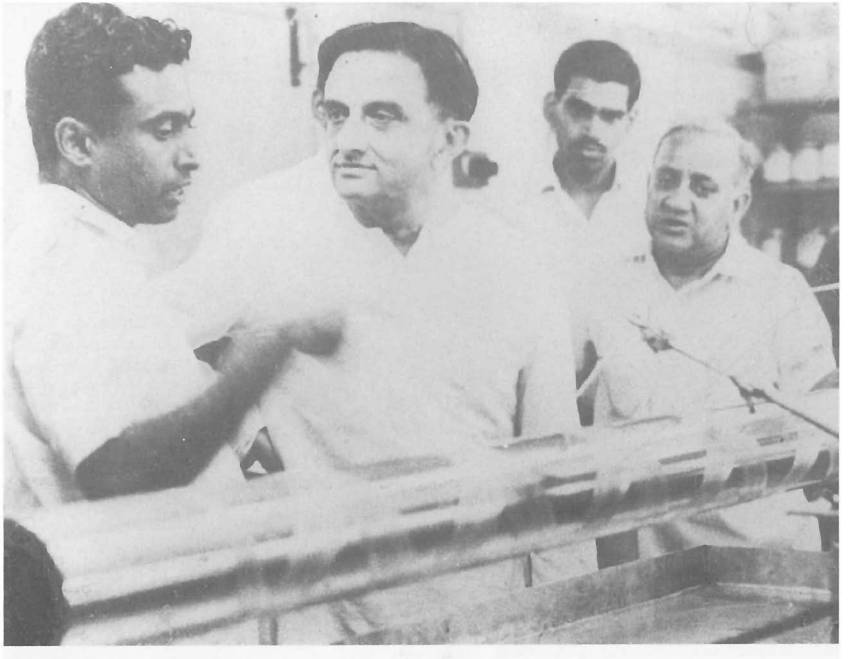

থুম্বায় ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের প্রধান ব্যক্তিত্ব, মহান দূরদ্রষ্টা অধ্যাপক বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসএলভি-3-এর একটি পর্যালোচনা বৈঠকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার দুই গুরুস্থানীয় বিজ্ঞানী—অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান এবং ড. ব্রহ্মপ্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসএলভি-3-এর টিমের একজন সদস্য তাঁর গবেষণার ফল ব্যাখ্যা করছেন। প্রচলিত প্রথা ভেঙে আমি প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁর কাজের বিষয়ে বলবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এসএলভি-3-এর ফলাফল ব্যাখ্যারত অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান ও আমি। পাশে দণ্ডায়মান অধ্যাপক সারাভাই।

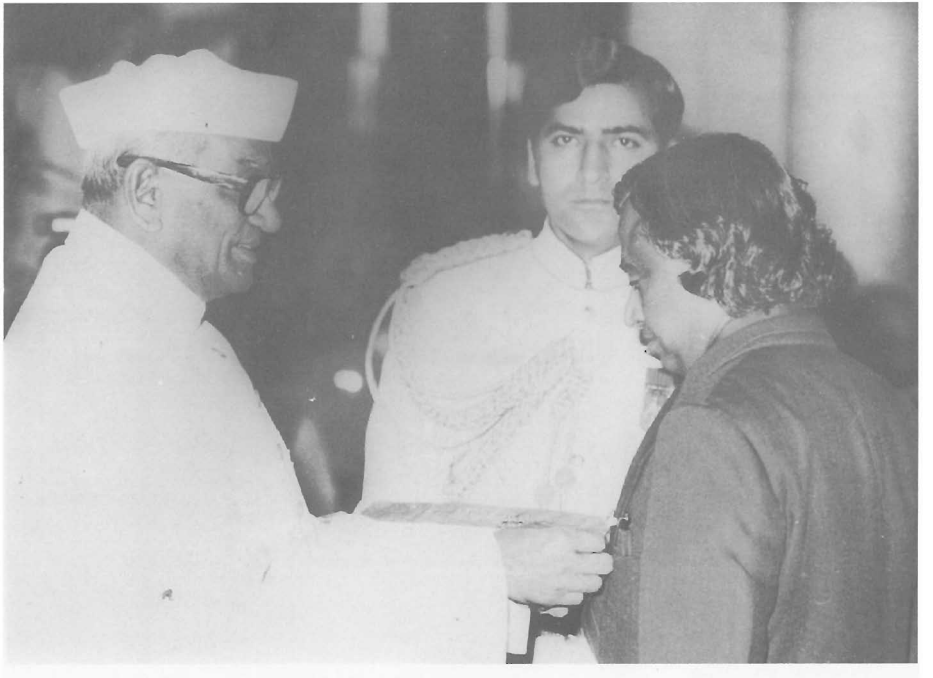

রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির কাছ থেকে 'পদ্মভূষণ' গ্রহণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

You said it
By LAXMAN

Nothing to be discouraged! We have postponed it again because we want to be absolutely certain!

"অগ্নি"-র প্রথম দুটি উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হওয়ায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

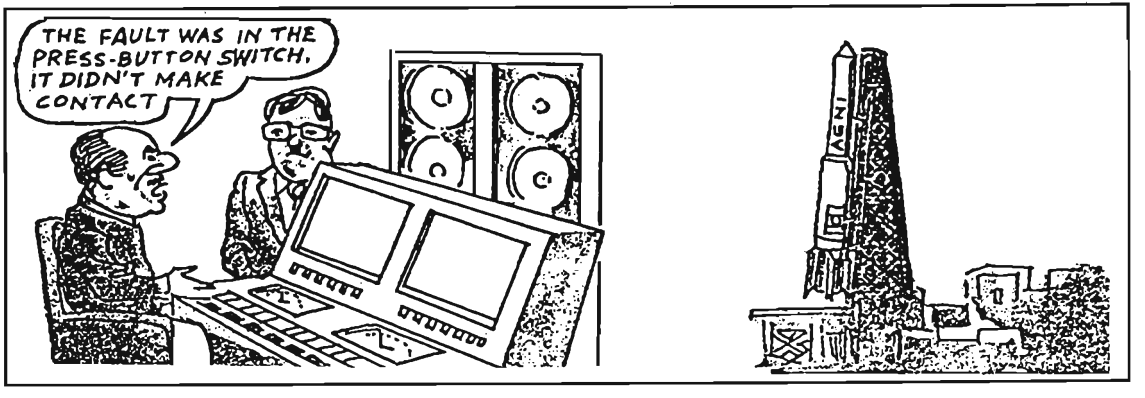

আর একটি ব্যঙ্গচিত্র—ব্যর্থ উৎক্ষেপণ সম্পর্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক ব্রহ্মপ্রকাশ এসএলভি-3-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে সংযুক্তির কাজ পরিদর্শন করছেন। এর প্রাথমিক উৎক্ষেপণ ব্যর্থ হওয়ায় যখন আমি হতাশাগ্রস্ত তখন তিনিই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

উৎক্ষেপণের পূর্ব-মুহূর্তে এসএলভি-৩। সবাই উদ্বেগ ও আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পৃথ্বী"র সফল উৎক্ষেপণ। ভূমি থেকে ভূমি অস্ত্রব্যবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন "অগ্নি" উৎক্ষেপণের প্রতীক্ষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অগ্নি"-র সফল উৎক্ষেপণের পর আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দর্শকদের উল্লাস।

রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণনের কাছ থেকে "ভারতরত্ন" সম্মান গ্রহণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন সেনাপ্রধানের সঙ্গে। আমার বাঁদিকে অ' ' ভি ' শেখাওয়াত। তাঁর ডানদিকে জেনারেল বি. সি. যোশি, এবং এয়ার চিফ মার্শাল এস. কে. কল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

এই কঠিন সময়ে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ আমাকে সাহায্য করেছিলেন। কার্যত, ড. ব্রহ্মপ্রকাশ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন শুরুতেই ক্ষত নিয়ন্ত্রণের নীতি: "স্বস্থানে এখনই ফিরিয়ে নিয়ে গেলে, ঠিক সেরে উঠবে।" SLV টিমের সবাইকে তিনি কাছে ডেকে নিলেন, আমাকে দেখালেন SLV-3-র ব্যর্থতার শোক শুধু আমার একারই নয়। "তোমার সব সহকর্মীরা তোমার পাশে আছেন," তিনি বললেন। এই ঘটনাই আমাকে জোগাল অপরিমেয় মানসিক সহায়তা, উৎসাহ ও ভরসা।

১১ আগস্ট ১৯৭৯-তে একটি পর্যালোচনা হল, তাতে উপস্থিত ছিলেন সত্তর জনের মতো বিজ্ঞানী। ব্যর্থতার একটি বিস্তারিত কারিগরিগত মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হল। পরে, এস. কে. অথিথানের নেতৃত্বে গঠিত, উড়ান-পরবর্তী একটি বিশ্লেষণ কমিটি বাহনটির ঠিকমতো কাজ না করার কারণগুলি নির্দেশ করল। দেখা গেল দুর্ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলে। উড়ানের দ্বিতীয় পর্যায়ে কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সেই জন্যে বাহনটি তার ভারসাম্য হারায়, এবং তার ফলে উচ্চতা এবং গতিবেগ হ্রাস পায়। তার পরিণামে পরবর্তী পর্যায়গুলো চালু হওয়ার আগেই সেটি সমুদ্রে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

আরও কিছু কিছু কারণ, গভীরতর বিশ্লেষণের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যথা, ওই পর্যায়ে জ্বালানি শক্তির জন্যে যে oxidiser প্রয়োজন তার জন্যে ব্যবহৃত Red Fuming Nitric Acid (RFNA) অনেকটা বেরিয়ে গিয়েছিল। এর ফলে, যখন নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলের প্রয়োজন হল, কেবল জ্বালানি ভেতরে ঢুকে গেল যাতে তার বল শূন্য হয়ে গেল। 'T-৪ মিনিটের প্রথম নির্দেশের পর পরেই দূষণের কারণে অক্সিডাইজার ট্যাঙ্কের একটি সোলেনয়েড ভাল্‌ব শুধু খুলে গিয়েছিল'—এই অবস্থাই RFNA বেরোনোর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

অধ্যাপক ধাওয়ান ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে এইসব তথ্য ISRO-র শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের একটি বৈঠকে উপস্থিত করেন, এবং তাঁর সে বিবরণ সভায় গৃহীত হয়। প্রযুক্তিগত কার্যকারণ সম্পর্কে সে বিবৃতি সকলেই মেনে নিলেন, এবং সাধারণভাবে সবাই সন্তুষ্ট হলেন যে, ব্যর্থতার সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। আমার মন কিন্তু তবু বুঝল না, অস্থির হয়েই থাকল। আমার মতে, দায়িত্বের গুরুত্ব মাপা উচিত, যদি কারও এক মুহূর্ত দেরি না করে বা কোনও বিচ্যুতি না ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বিরোধিতা করার মতো যোগ্যতা থাকে, সেটাই দিয়ে।

আমি থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক ধাওয়ানকে বললাম, "স্যার, আমার বন্ধুরা যদিও প্রযুক্তিগত ব্যর্থটার কথাটাই মেনে নিয়েছেন, তবুও 'কাউন্টডাউন'-এর শেষ পর্যায়ে RFNA-র যে ছিদ্রটা দেখা গিয়েছিল তাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হল না, তার জন্যে আমি নিজেকে দায়ী করছি। মিশন ডিরেকটর অর্থাৎ অভিযানের অধিকর্তা হিসেবে আমার উচিত ছিল উৎক্ষেপণ মুলতুবি রাখা, এবং সম্ভব হলে উড়ানটিকে বাঁচানো। বিদেশে এই রকম পরিস্থিতিতে মিশন ডিরেকটরের চাকরি চলে যেত। অতএব আমি অভিযান ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব স্বীকার করছি।" বেশ খানিকক্ষণ হল-এর মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করল। তারপর অধ্যাপক ধাওয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি কালামকে তার নিজস্ব কক্ষপথে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি স্থানত্যাগ করলেন অর্থাৎ সভার সেখানেই সমাপ্তি।

বিজ্ঞানের চর্চায় যেমন আনন্দ আছে তেমনি অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক আশাভঙ্গও আছে, এ রকম অনেক ঘটনার কথা আমি মনে মনে স্মরণ করলাম। জোহান্‌স কেপলার যাঁর তিনটি কক্ষপথ সংক্রান্ত সূত্র মহাকাশ গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছে, সূর্যের চারিদিকে গ্রহের সঞ্চরণের দুটি নিয়ম আবিষ্কার করার পর তৃতীয় নিয়মটি, সূর্য প্রদক্ষিণের যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথ (elliptical orbit) তার আকারের সঙ্গে সেই প্রদক্ষিণের কাল, এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক যে নিয়মে নির্ণীত হয়েছে তার আবিষ্কার করতে সেই কেপলারের ১৭ বছর সময় লেগেছিল। তার মধ্যে কতবার তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, কতবার আশাহত হয়েছিলেন? মানুষ যে চন্দ্রে অবতরণ করতে পারবে, রুশ গণিতজ্ঞ কনস্টানটাইন শিওলকোভস্কি (Konstantin Tsiolkovsky) যে ধারণাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটির কার্যে পরিণত হতে লেগেছিল চারটি দশক, এবং তাও হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন "চন্দ্রশেখর সীমা" ("Chandrasekhar Limit") আবিষ্কারের জন্যে এবং সে আবিষ্কারটি তিনি করেছিলেন ১৯৩০ সালে যখন তিনি কেমব্রিজে স্নাতক স্তরের ছাত্র ছিলেন। তারপর প্রায় ৫০ বৎসর তাকে নোবেল পুরস্কারের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁর কাজ যদি সেই আবিষ্কারের সময়েই স্বীকৃতি পেত, কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole)-এর আবিষ্কার অনেক দশক আগেই হতে পারত। ভন ব্রাউনের Saturn-এর উৎক্ষেপণ যখন মানুষকে চন্দ্রে পৌঁছে দিল, তার আগে কতবার তাঁকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল! এই সব চিন্তাই আমাকে শেষপর্যন্ত, আপাত দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় এমন ব্যর্থতা যা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও আশা নেই, তাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা দিয়েছিল।

১৯৭৯-র নভেম্বর প্রথম দিকে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ অবসর গ্রহণ করলেন। VSSC-এর নানারকম উথালপাথালের মধ্যে তিনি ছিলেন আমার সহায়, আমার সম্বল। একত্রে মিলেমিশে কাজ করার যে মানসিকতা, "টিমস্পিরিট" যাকে বলে, তাতে তাঁর যে আস্থা ছিল, SLV-র প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তার দ্বারা যেভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে দেশে বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে সেটি আকর পরিকল্পনা (blue print) হয়ে দাঁড়ায়। ড. ব্রহ্মপ্রকাশ ছিলেন প্রাজ্ঞ পরামর্শদাতা। যখনই আমি আমাদের মিশনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি, তিনি আমাকে অতি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

অধ্যাপক সারাভাইয়ের কাছ থেকে আমি যা অর্জন করেছিলাম ড. ব্রহ্মপ্রকাশ শুধু যে তাকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন তাই নয়, তাকে নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিতেও সহায়ক হয়ে উঠেছিলেন। সর্বদা তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন তাড়াহুড়ো না করতে। তিনি আমাকে বলতেন, "বৃহৎ বৈজ্ঞানিক প্রকল্প পর্বতের মতো। তাতে আরোহণ করতে হবে যতদূর সম্ভব কম আয়াসে, এবং মনে কোনও আকাঙ্ক্ষা না রেখে। তোমার অগ্রগতি কত দ্রুত হবে, সেটা নির্ভর করছে নিজের প্রকৃতির ওপর। যখন অস্থির লাগবে গতি বাড়িয়ে দাও; যখন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বেশি হচ্ছে গতি কম করো। পর্বত আরোহণ করবে অস্থিরতা এবং অবসন্নতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে। তোমার প্রকল্পের প্রত্যেকটি কাজ যখন, কোনও লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় না হয়ে নিজেই হয়ে উঠবে একটি ঘটনা, তখনই বুঝবে, সব ঠিক ঠিক মতো চলছে।" ড. ব্রহ্মপ্রকাশের উপদেশের প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'ব্রহ্ম' সম্পর্কে এমারসনের কবিতায়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি রক্তমাখা খুনী মনে করে সে খুন করে,
কিংবা যদি নিহত মনে করে সে নিহত,
তারা জানে না আমার দুর্নিরীক্ষা নীতি,
কেমনভাবে আমি যাই, কেমন ভাবে আবার ফিরে আসি।

শুধু কোনও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্যেই বাঁচা, তার মধ্যে কোনও গভীরতা নেই। এ-যেন পর্বতের শিখরে পৌঁছোবার জন্যেই পর্বতারোহণ, পর্বতাগাত্রের কোনও অভিজ্ঞতা ছাড়াই। শিখরে নয় পর্বত্রগাত্রেই জীবনের অস্তিত্ব। নানা জীবের সেখানেই জন্ম, অভিজ্ঞতা সেখান থেকেই আসে, প্রযুক্তি সেখানেই আয়ত্ত হয়। শিখরের মূল্য একমাত্র এই কারণে যে পর্বতগাত্রের সীমা তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব আমি এগিয়ে চললাম, শিখরের অভিমুখে, কিন্তু যে পর্বতগাত্র বেয়ে উঠছি, অভিজ্ঞতায় সেটাও ধরা থাকছে। অনেক অনেক দূর আমাকে যেতে হবে, কিন্তু আমার কোনও তাড়া ছিল না, শুধু একটির পর একটি পা ফেলে যাওয়া, কিন্তু প্রত্যেকটি পদক্ষেপ শিখরের দিকে।

AMARBOI.COM

প্রত্যেক পর্যায়ে SLV-3-র কর্মীগোষ্ঠীর এই একটা সৌভাগ্য ছিল যে, কয়েকজন অসাধারণ সাহসী মানুষ, তাঁরা নিজেদের মধ্যে পেয়েছিলেন। সুধাকর এবং শিবরামকৃষ্ণন ছাড়াও ছিলেন শিবকামিনাথন। SLV-3-কে অঙ্গীভূত করার জন্যে C-Band ট্রান্সপন্ডারটিকে ত্রিবান্দ্রম থেকে SHAR-এ নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁকে ন্যস্ত করা হয়েছিল। ট্রান্সপন্ডার এমন একটি যন্ত্র যাকে রকেট ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেটির কাজ হল রাডার সংকেত পাঠানো, সে রাডার সংকেত এত শক্তিশালী যে, উৎক্ষেপণ স্থল থেকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো পর্যন্ত সারাক্ষণ উৎক্ষিপ্ত বাহনের হদিশ সে দিতে পারবে। SLV-3-র উৎক্ষেপণ কর্মসূচি ওই যন্ত্রটির পৌঁছোনো ও সংযুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল। মাদ্রাজ বিমানবন্দরে অবতরণ করেই শিবকামির বিমানটি পিছলে গিয়ে রানওয়ে থেকে বেরিয়ে গেল। ঘন ধোঁয়ায় বিমানটি ঢেকে গেল, আপৎকালীন নিষ্ক্রমণ দ্বার দিয়ে সবাই বিমান থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন, সবারই আপ্রাণ চেষ্টা কী করে প্রাণ বাঁচানো যায়। একমাত্র শিবকামি ব্যতিক্রম। শিবকামি বিমানের ভিতরেই বসে থাকলেন, যতক্ষণ না নিজের মালপত্র থেকে ট্রান্সপনডারটিকে বের করে আনতে পারলেন। বিমান কর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাদ দিলে শেষ যাঁরা সেই ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন, শিবকামি ছিলেন তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যতম, ট্রান্সপন্ডারটি তিনি বুকে জাপটে ধরে ছিলেন।

সে-সব দিনের আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। অধ্যাপক ধাওয়ান SLV-3-র সন্নিবেশ-ভবনে (assembly building) এসেছিলেন। তিনি, মাধবন নায়ার এবং আমি SLV-3-র সন্নিবেশ সম্পর্কিত কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বাহনটি উৎক্ষেপকের ওপর আনুভূমিক ভাবে শায়িত ছিল। আমরা যখন, ঘুরে ঘুরে সংযোজিত ভারী যন্ত্রপাতির ক্ষিপ্রতা তাকে দেখাচ্ছিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম, দুর্ঘটনা ঘটলে আগুন নেভানোর জন্যে যে বড় বড় জলাধার রাখা আছে তা SLV-3-র দিকে মুখ ফেরানো। সেই জলাধারগুলো দেখে আমার অস্বস্তিবোধ হল। আমি মাধবন নায়ারকে বললাম সেগুলোর মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে, যাতে কোনও কারণে হঠাৎ যদি সেগুলো থেকে জল বেরোতে আরম্ভ করে, তাহলে সে জল রকেটের ওপর পড়ে তার ক্ষতি করতে পারবে না। অবাক কাণ্ড। মাধবন নায়ার জলাধারের মুখগুলো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে বিপুল তোড়ে জল বেরিয়ে এল। বাহন-নিরাপত্তা অফিসার অগ্নি-নিরূপণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু তাঁর এ-কথা মনেই হয়নি যে, সমগ্র রকেট তাতে জখম হয়ে যেতে পারত। এই ঘটনাটি কি ভবিষ্যৎ সৃষ্টির একটি উদাহরণ, নাকি "রাখে হরি মারে কে?"

দ্বিতীয় SLV-3-র উৎক্ষেপণের ৩০ মিনিট আগে, ১৭ জুলাই ১৯৮০-র খবরের কাগজে নানা রকম ভবিষ্যৎবাণী দেখা গেল। একটি সংবাদপত্রে বেরোল "প্রকল্প অধিকর্তা নিখোঁজ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।" অনেকে প্রথম SLV-3-র ইতিহাস ঘেঁটে মনে করিয়ে দিলেন, তৃতীয় পর্যায়টি অকেজো হয়ে পড়েছিল জ্বালানির অভাবে এবং রকেটটি তার ফলে সমুদ্রে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কেউ কেউ SLV-3-র সম্ভাব্য সামরিক তাৎপর্যের ওপর জোর দিলেন, IRBMs নির্মাণ ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা চিন্তা করে। অনেকে আবার আমাদের দেশের নানারকম ত্রুটি দুর্বলতার পরিণতি কী হতে পারে, এবং SLV-3-রই বা নিয়তি কী হবে, তাই নিয়ে ভবিষ্যৎদ্বাণী করলেন। আমি জানতাম আগামী কালের উৎক্ষেপণের ওপর নির্ভর করবে ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ। এক কথায়, সমগ্র জাতি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পরদিন, ১৮ জুলাই ১৯৮০ সকাল ৮.৩০ মিনিটে ভারতের প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান (SLV-3) SHAR-থেকে ভূপৃষ্ঠ ত্যাগ করল। তার ৬০০ সেকেন্ড আগে কম্পিউটারে সাজানো উপাত্ত-য় আমি দেখলাম, "রোহিণী" উপগ্রহ (পেলোড হিসেবে যাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল) যাতে কক্ষপথে প্রবেশ করতে পারে তার জন্য ৪র্থ পর্যায়ে তাকে প্রয়োজনীয় বেগ সরবরাহ করা হচ্ছে। এর পরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'মিনিটের মধ্যে রোহিণী স্বল্প উচ্চতার কক্ষপথে স্থাপিত হল। তীব্র আওয়াজের মধ্যে আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলাম, 'মিশন ডিরেক্টর সমস্ত স্টেশনকে বলছি: একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করুন। মিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায় নিজের নিজের কাজ করছে। ৪র্থ পর্যায়ের apogee মোটর রোহিণী উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্যে প্রয়োজনীয় বেগ দান করেছে।' সর্বত্র আনন্দ কলরব উঠল, ব্লক হাউস থেকে আমি যখন বেরিয়ে এলাম, আমার উৎফুল্ল সহকর্মীরা আমাকে কাঁধে তুলে শোভাযাত্রা শুরু করলেন।

সমগ্র জাতি উত্তেজিত, ভারত এখন সেই স্বল্প সংখ্যক জাতির অন্যতম হল যারা উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ ক্ষমতার অধিকারী। রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হল, খবরের কাগজে বড় বড় হেড লাইনে খবর বেরোল। সংসদে টেবিল চাপড়ে সেই সাফল্যকে অভিনন্দিত করা হল। একটি জাতীয় স্বপ্ন যেমন বাস্তবায়িত হল, তেমনি জাতির ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় আরম্ভ হল। ISRO-র চেয়ারম্যান অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান, সাধারণত মিতি কথাবার্তায় অতি সতর্ক তিনিও সেই সতর্ক ভাব ত্যাগ করে ঘোষণা করলেন, মহাকাশে অনুসন্ধান চালানো এখন ভাল মতোই আমাদের ক্ষমতার মধ্যে এসে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী টেলিগ্রাম করে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান প্রতিক্রিয়া হল ভারতের বিজ্ঞানী মহলে—তাঁরা প্রত্যেকেই উদ্দীপ্ত হলেন; শতকরা ১০০ ভাগ এই ভারতীয় প্রচেষ্টায় তাঁরা গর্ব অনুভব করলেন।

আমার প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র ধরনের, যে সাফল্য বিগত দুটি দশক ধরে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল, তা করায়ত্ত হওয়াতে যেমন আমি খুশি হলাম, বিষণ্ণও বোধ করলাম এই কারণে যে, আমাকে যাঁরা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, আমার আনন্দের ভাগ নেওয়ার জন্যে তাঁরা আর ইহজগতে নেই। আমার বাবা, আমার ভগ্নিপতি জালালুদ্দিন এবং অধ্যাপক সারাভাই।

SLV-3-র সফল উড়ানের জন্যে প্রথম কৃতিত্ব ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচির সেই বিরাট পুরুষদের, যাঁরা ছিলেন সেই প্রচেষ্টার পূর্বসূরী, বিশেষত অধ্যাপক সারাভাই। তারপর নাম করতে হয় শতশত VSSC কর্মীর যাঁরা নিছক ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের জাতি কী ধাতুতে গড়া এবং সর্বশেষে তাঁদের, যাঁদের অবদান কোনও অংশে অন্যদের চেয়ে খাটো ছিল না, অধ্যাপক ধাওয়ান এবং ড. ব্রহ্মপ্রকাশ, যাঁরা সে-প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সে-দিন আমাদের ডিনার দেরিতে হল। ধীরে ধীরে উৎসবের আওয়াজ থেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল। আমি যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন প্রায় সমস্ত শক্তিই নিঃশেষিত। খোলা জানালা দিয়ে মেঘের মধ্যে চাঁদ দেখতে পাচ্ছিলাম, সমুদ্রের বাতাস যেন সেদিন শ্রীহরিকোটা দ্বীপের মনের স্মৃতির আভাষ।

SLV-3-র সাফল্যের এক মাসের মধ্যে আমি এক দিনের জন্যে মুম্বাইয়ের নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্রে এসেছিলাম। SLV-3 সংক্রান্ত আমার অভিজ্ঞতার কথা শোনবার জন্যে তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে আমি দিল্লি থেকে অধ্যাপক ধাওয়ানের একটি টেলিফোন পেলাম। তিনি বললেন, পরদিন সকালে আমি যেন তাঁর কাছে যাই, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের দেখা করতে হবে। নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্রে আমি যাঁদের অতিথি হয়েছিলাম তাঁরা অনুগ্রহ করে আমার দিল্লি যাওয়ার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু আমার ছোট্ট একটি সমস্যা হল। সেটা ছিল আমার পোশাক সংক্রান্ত। আমার অভ্যাস মতো আমি এখানেও ঘরোয়া ধরনের পোশাক পরে ছিলাম, পায়ে ছিল স্লিপার। কোনওক্রমেই তাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উপযুক্ত বেশবাস বলা যায় না! অধ্যাপক ধাওয়ানকে যখন সে-সমস্যাটির কথা বললাম, তিনি আমার পোশাক নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলেন। তাঁর সরস জবাব, "তোমার যে সাফল্য, সেটিই তোমার সুন্দর পোশাক।"

পরদিন সকালবেলা অধ্যাপক ধাওয়ান ও আমি সংসদভবন অ্যানেক্স-এ হাজির হলাম। প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সংসদীয় সমিতির একটি বৈঠক হবে বলে ঠিক ছিল। কক্ষে লোকসভা ও রাজ্যসভার জনা ত্রিশেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আর জমকালো একটি ঝাড়বাতি জ্বলছিল সেই ঘরে। অধ্যাপক এম. জি. কে. মেনন ও ড. নাগ চৌধুরীও ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী SLV-3-র সাফল্যের কথা সদস্যদের বললেন এবং আমাদের কাজের উচ্চ প্রশংসা করলেন। অধ্যাপক ধাওয়ান সমবেত শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানালেন, দেশে মহাকাশ গবেষণায় তাঁরা যে উৎসাহ দান করেছেন সে জন্যে। ISRO-র বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের কৃতজ্ঞতা তাঁদের জ্ঞাপন করলেন। হঠাৎ, আমি দেখলাম শ্রীমতী গান্ধী আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, বলছেন, "কালাম! আমরা তোমার কথা শুনতে চাই।" অধ্যাপক ধাওয়ান তো আগেই তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন। তার পরে আবার আমাকে প্রধানমন্ত্রী সে অনুরোধ করবেন, আমি ভাবিনি!

একটু ইতস্তত করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর বললাম, "যাঁরা জাতি-গঠন করছেন তাঁদের এই মহতী সমাবেশে উপস্থিত থেকে আমি অতিশয় সম্মানিত বোধ করছি। আমি শুধু জানি কী করে আমাদের দেশে এমন একটি রকেট-সিস্টেম তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয় যা আমাদের দেশে নির্মিত একটি উপগ্রহকে প্রতি ঘণ্টায় ২৫,০০০ কিমি বেগ প্রদান করে কক্ষপথে প্রবেশ করিয়ে দেবে।" হাততালিতে হল্ ফেটে পড়ল। SLV-3-র মতো একটি প্রকল্পে কাজ করবার এবং আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা প্রমাণ করবার সুযোগ আমাদের দেওয়ার জন্যে সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানালাম। সমগ্র হল্ খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

SLV-3 প্রকল্প তো সাফল্য সহকারে সম্পূর্ণ করা হল, এখন VSSC-র কাজ আমাদের নানাবিধ সম্পদকে নতুনভাবে সংগঠিত করে নিজেদের লক্ষ্য আবার নতুন করে নির্ধারিত করা। প্রকল্পের দায়িত্ব থেকে আমি মুক্তি চাইলাম, অতএব আমারই টিমের বেদপ্রকাশ সন্ডলাস্‌কে SLV-3 Continuation Project-এর ডিরেকটর করা হল। সেই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল একই শ্রেণীর কার্যোপযোগী উপগ্রহ উৎক্ষেপণ বাহন নির্মাণ। এদিকে, কিছুদিন থেকে কয়েকটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সাহায্যে SLV-3-কে উন্নততর রূপদানের জন্যে Augmented Satellite Launch Vehicles (ASLVs) নির্মাণ করার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল। উদ্দেশ্য ছিল SLV-3-র পেলোড বহন ক্ষমতা ৪০ কেজি থেকে বাড়িয়ে ১৫০ কেজি করা। আমার টিম থেকে এম.এস.আর. দেব-কে ASLV-র প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিয়োগ করা হল। এরপর সৌর সমতার কক্ষে (sun synchronous orbit) (৯০০ কিমি) পৌঁছবার জন্যে একটি PSLV নির্মাণ করতে হবে। Geo Satellite Launch Vchile (GSLV)-এর কথাও চিন্তা করা হল, সুদূর স্বপ্ন হিসাবে। আমি নিযুক্ত হলাম Aerospace Dynamics and Design Group-এর অধিকর্তার পদে যাতে আমি আগামীদিনের যে-সব উৎক্ষেপণ বাহন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রয়োজন তার পরিকল্পনা রচনা করতে পারি।

তখন যে VSSC পরিকাঠামো ছিল, ভবিষ্যতের উৎক্ষেপণ বাহন সিস্টেমের আয়তন ও ওজন নিয়ে কাজের পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। ওই সব প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। VSSC-র বর্ধিত কাজ কর্মের জন্য নতুন নতুন স্থান নির্বাচন করা হল বত্তিয়ূরকভু এবং বালিয়ামালা-তে। যে-সব ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন তার বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করলেন ড. শ্রীনিবাসন। ইতিমধ্যে, শিবথানু পিল্লাই-এর সঙ্গে মিলে আমি SLV-3 এবং তাঁর বিভিন্ন প্রকারভেদের প্রয়োগের একটি বিশ্লেষণ প্রস্তুত করলাম, এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের জন্যে পৃথিবীর তখনকার বিভিন্ন প্রক্ষেপণ বাহনের তুলনা করলাম। আমরা প্রমাণ করলাম, স্বল্প ও মধ্য পাল্লার (৪০০০ কি.মি.) জন্যে জাতির পেলোড ডেলিভারি বাহন (payload delivery vchicle)-এর প্রয়োজন, SLV-3 সলিড রকেট সিস্টেম (solid rocket system) সে প্রয়োজন মেটাতে পারবে। আমরা বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

SLV-3-র বিভিন্ন সাবসিস্টেম সহ ৩৬ টন প্রপেল্যান্ট থাকলে ১.৮ মিটার ব্যাসযুক্ত একটি অতিরিক্ত সলিড বুস্টার-এর নির্মাণ ICBM-এর (১০০০ কেজি পেলোড-এর জন্যে ৫০০০ কিমি-র অধিক) জন্যে যথেষ্ট হবে। তবে এই প্রস্তাব অবশ্য কোনওদিন বিবেচিত হয়নি। কিন্তু যে Re-entry Experiment (REX) বহুদিন পরে "অগ্নি" রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আমাদের ওই প্রস্তাবই তার পথ প্রশস্ত করেছিল।

পরবর্তী SLV-3 উড়ান SLV-D1 রওনা হয় ৩১ মে ১৯৮১। আমি দর্শকদের গ্যালারিতে বসে দেখলাম। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের বাইরে বসে উৎক্ষেপণ দেখা আমার সেই প্রথম। অপ্রিয় হলেও এই সত্যটির মুখোমুখি আমাকে হতেই হল যে, বিভিন্ন গণমাধ্যম আমার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার দরুন, আমার কোনও কোনও বরিষ্ঠ সহকর্মীর মনে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, যদিও SLV-3-র সাহায্যের পিছনে তাঁদের কারওরই অবদান কম ছিল না। অন্তরের স্পর্শ রহিত এই নতুন পরিবেশে কি আমি আহত বোধ করেছিলাম। হবেও বা। তবে যাকে আমি বদলাতে পারব না, তা মেনে নিতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম।

AMARBOI.COM

অন্যদের মস্তিষ্কের ফসলের লাভে জীবন-ধারণ আমি কখনওই করিনি। আমার স্বভাবই এমন যে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মায়া-দয়া বিসর্জন কোনও দিনই দিইনি। SLV-3-র নির্মাণ জোর-জবরদস্তি করে হয়নি, কায়দা-কৌশল করে হয়নি, হয়েছে ক্রমাগত সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে। তা হলে কেন এই অসন্তোষ? সে কি শুধু VSSC-র উচ্চস্তরেই ছিল, না কি সর্বত্রই বিদ্যমান? বিজ্ঞানী হিসেবে আমি শিক্ষা পেয়েছিলাম, যা বাস্তব তা নিয়েই বিচার করতে। বিজ্ঞানে সেইটেই সত্য যার অস্তিত্ব আছে। এবং যেহেতু এই তিক্ততা বাস্তব সত্য, যুক্তি দিয়ে তাকে আমায় বুঝতে হবে। কিন্তু এসব জিনিস কি যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়?

আমার SLV পরবর্তী অভিজ্ঞতা কি আমাকে একটা সংকটের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছিল? হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ এই কারণে যে, SLV-3-র জন্যে কৃতিত্ব যাঁদের পাবার কথা তাঁরা সকলে পাননি। কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ কিছু করবার ছিল না। না, তার কারণ একটা পরিস্থিতিকে সংকট আখ্যা দেওয়া যায় তখনই যখন তার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনটা উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়। এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই তা নয়। বস্তুত, এই মূল ভাবনার ওপরেই গড়ে ওঠে সংঘাতের ধারণা। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে আজ আমি শুধু বলতে পারি যে, যথার্থতার জন্যে এর এক বিরাট প্রয়োজন আছে এবং তার পুনরারম্ভের ব্যাপারেও আমি সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮১-র জানুয়ারিতে দেরাদুনের High Altitude Laboratory-র [এখন যার নাম Defence Electronics Application Laboratory (DEAC)] ড. ভগীরথ রাও আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন SLV-3-র বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিতে। প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক রাজা রামান্না, তাঁর সম্পর্কে আমি বরাবরই উচ্চধারণা পোষণ করে এসেছি, যিনি তখন ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, তিনি সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন। তিনি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে ভারতের প্রচেষ্টা এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর যে চ্যালেঞ্জ, তার বিষয়ে বক্তৃতা করলেন। আমি যেহেতু SLV-3-র সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম, স্বাভাবিক ভাবেই সে বিষয়ে কথা বলতে আমার কোনও অসুবিধা হল না। অধ্যাপক রাজা রামান্না আমাকে চা-খাবার নিমন্ত্রণ করলেন, একান্তে আলাপের জন্য।

প্রথমেই যা আমার মনে হল, সেটা হল আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে অধ্যাপক রাজা রামান্না সত্যিসত্যিই খুশি হয়েছেন। তাঁর কথা বলবার আগ্রহ ছিল, একটা সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুত্বের মনোভাব ছিল। সেই সন্ধ্যায় আমার মনে পড়ছিল অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা—এ যেন একেবারে গতকালের কথা। অধ্যাপক সারাভাইয়ের জগতের ভিতরে ছিল সারল্য, বাইরে ছিল স্বাচ্ছন্দ্য। আমরা যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করতাম তাদের প্রত্যেকেই ঐকান্তিক প্রয়োজন বোধ করতাম, কিছু একটা সৃষ্টি করতে হবে, এবং আমাদের পরিবেশ এমন ছিল যে মনে হত সেই প্রয়োজনের বস্তু আমরা নিশ্চয়ই হাতে পাব। আমাদের স্বপ্নের পক্ষে সারাভাইয়ের জগৎ ঠিক একেবারে খাপ খেয়ে যেত। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার সবই সেখানে ছিল সঠিক পরিমাণে, খুব বেশিও নয়, খুব কমও নয়। নিজের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সে-সব আমরা ভাগ করে নিতাম, কিছুই পড়ে থাকত না।

ততদিন আমার জগতে আর সরলতা বলে কিছু ছিল না। তার বাইরের দিকটা যত জটিল, ভিতরটা তত দুরূহ হয়ে উঠেছিল। রকেট-নির্মাণে আমার প্রচেষ্টা এবং দেশে রকেট নির্মাণের লক্ষ্যে পৌঁছোবার চেষ্টা বাইরের নানা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাধা পাচ্ছিল, ভিতর থেকে দৃঢ় সংকল্পের অভাব তাকে জটিল করে তুলেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে নিজের নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে গেলে একটা বিশেষ উদ্যমের প্রয়োজন হবে। আমার অতীতের সঙ্গে আমার বর্তমানের সংহতি-সাধন বরাবরই অনিশ্চিত ছিল। আমার বর্তমানের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের সংহতি-সাধনের কথাটাই আমার বেশি করে মনে জাগছিল, যখন অধ্যাপক রামান্নার সঙ্গে আমি চা খেতে গেলাম।

আসল কথায় আসতে তিনি দেরি করলেন না। নারায়ণন এবং DRDL-এ তাঁর

সহকর্মীদের বিপুল কৃতিত্ব সত্ত্বেও "ডেভিল" ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পটি মুলতুবি রাখা হয়েছিল। সামরিক রকেট সংক্রান্ত সমগ্র কর্মসূচিটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে উদ্যোগের অভাবে। DRDO-র ক্ষেপণাস্ত্র-কর্মসূচি drawing board এবং static test bed অবস্থায় বেশ কিছুদিন আটকে আছে। এখন সে-কর্মসূচির দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে কারও এগিয়ে আসা দরকার। অধ্যাপক রামান্না আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন আমি DRDL-এ যোগ দিতে এবং তাদের Guided Missile Development Programme (GMDP) প্রকল্পটিকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে নিতে ইচ্ছুক কিনা। তাঁর প্রস্তাবে আমার মনে মিশ্র ভাবের উদয় হল।

রকেট-বিদ্যা সংক্রান্ত আমাদের যাবতীয় জ্ঞান সংহত করে তার প্রয়োগের এমন সুযোগ আবার কবে আমি পাব?

আমাকে যে উচ্চ মর্যাদা অধ্যাপক রামান্না দিলেন তাতে আমি সম্মানিত বোধ করলাম। পোখরানের পারমাণবিক পরীক্ষায় তাঁর ভূমিকাই ছিল পথ-নির্দেশকের এবং ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতার সম্পর্কে যে ধারণা তিনি বহির্জগতে সৃষ্টি করেছিলেন, তার যা ফল, সেদিন তাতে আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল। আমি জানতাম তাঁর প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না। অধ্যাপক রামান্না আমাকে এ-বিষয়ে অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে কথা বলতে বললেন, যাতে তিনি ISRO থেকে DRDL-এ আমার স্থানান্তরের নিয়মনীতির বিষয়টি ঠিক করে দেন।

১৯৮১ সালের ১৪ জানুয়ারি আমি অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার কথা তিনি খুব ধৈর্য সহকারে শুনলেন তাঁর সেই টিপিক্যাল পছন্দ সহকারে। তাঁর এই সব কিছুতে খুবই যত্ন সহকারে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ এটা নিশ্চিত করা যে, শোনার সময় তাঁর কান একটি শব্দও বাদ দেয়নি। তিনি বললেন, "আমার লোকের যে মূল্যায়ন তাঁরা করেছেন, তাতে আমি খুশি।" তারপরেই মুখে একটা হাসির ঝিলিক। অধ্যাপক ধাওয়ানের মতো করে হাসতে পারে এমন দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি আমার-চোখে পড়েনি। সে-হাসি ঠিক যেন নরম পেঁজা তুলোর মতো একখণ্ড মেঘ— তাকে যেমন খুশি তেমন কোনও আকারে কল্পনা করে নিলেই হল।

আমি ভাবছিলাম কীভাবে এগোব। অধ্যাপক ধাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি যথানিয়মে একটা দরখাস্ত করব, যাতে DRDL আমাকে একটা নিয়োগপত্র পাঠাতে পারে? অধ্যাপক ধাওয়ান বললেন, "না, ওদের ওপর কোনও চাপ দিও না। আমি নয়াদিল্লি যাচ্ছি, সেখানে বড় কর্তাদের সঙ্গে আমাকে আগে কথা বলতে দাও। আমি জানি তোমার এক পা সব সময়েই DRDO-তে ছিল, এখন তোমার সমস্ত ভারকেন্দ্র ওদের দিকে চলে গেল।" বোধহয় অধ্যাপক ধাওয়ানের কথায় কিছু সত্যতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল, কিন্তু আমার মন সব সময়েই ISRO-তেই পড়ে থাকত, তিনি কি তা জানতেন না?

১৯৮১-র প্রজাতন্ত্র দিবসে একটা অপ্রত্যাশিত খুশির খবর পেলাম। ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলা অধ্যাপক ইউ.আর. রাওয়ের সেক্রেটারি মাধবন দিল্লি থেকে টেলিফোন করে আমায় খবর দিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঘোষণা করেছে আমাকে 'পদ্মভূষণ' প্রদান করা হয়েছে। তার পরের টেলিফোনই অধ্যাপক ধাওয়ানের। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন। আমি স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করলাম, কেন না তিনি আমার গুরু। অধ্যাপক ধাওয়ান পেলেন 'পদ্মবিভূষণ'। তাঁর আনন্দে আমিও যোগ দিলাম। সর্বান্তকরণে আমি তাঁকে অভিনন্দিত করলাম। তারপর ফোন করে আমি ড. ব্রহ্মপ্রকাশকে ধন্যবাদ জানালাম। আমি ভদ্রতা করছি বলে তিনি আমায় বকলেন, বললেন, "আমার মনে হচ্ছে যেন আমার ছেলে 'পদ্মভূষণ' পেল।" তাঁর ভালবাসা আমায় এমন উদ্বেল করে তুলল যে আমিও আমার ভাবাবেগ সামলাতে অক্ষম হলাম।

আমার ঘরটি আমি ভরিয়ে দিলাম বিসমিল্লাহ্ খানের সানাইয়ে। সেই সংগীত আমাকে নিয়ে গেল অন্য এক কালে, অন্য এক স্থানে। যেন আমি চলে গেছি রামেশ্বরম, মাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছি। বাবা আমার চুলে তাঁর সস্নেহ আঙুল বুলিয়ে দিলেন, আমার গুরু জালালুদ্দিন মস্ক স্ট্রিটে সমবেত জনতার সামনে খবরটি ঘোষণা করলেন। আমার বোন জোহরা আমার জন্য বিশেষ বিশেষ মিষ্টি বানাল। পক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী আমার কপালে তিলক এঁকে দিলেন। ফাদার সলোমন পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন হাতে নিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি দেখলাম, অধ্যাপক সারাভাই হাসছেন, জয়ের আনন্দে। যে চারাগাছটি তিনি রোপণ করেছিলেন বিশ বছর আগে, সেটি আজ বড় হয়ে উঠেছে দেশের লোক তার ফল পাচ্ছে।

আমার 'পদ্মভূষণে' VSSC-তে প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র ধরনের। অনেকে যেমন আমার আনন্দে আনন্দিত হলেন, তেমনি আবার অন্যরাও ছিলেন, যাঁদের মনে হল আমার প্রতি অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হলেন। জীবনের যে-সব প্রকৃত মূল্যবান বস্তু সেগুলোকে কেউ কেউ কেন দেখতে পায় না, তাদের বিকৃত চিন্তাধারার জন্যে? জীবনে আনন্দ, সন্তোষ, সাফল্য নির্ভর করে সঠিক নির্বাচনের ওপর, যে-নির্বাচন সাফল্য এনে দেবে তার ওপর। কোনও কোনও শক্তি আছে সেগুলো একজনের সপক্ষে কাজ করে, আবার কোনও কোনও শক্তি কাজ করে একজনের বিপক্ষে, কোন শক্তি অনুকূল আর কোন শক্তি প্রতিকূল তাকে চিনে নিতে হয় আর তাদের মধ্যে থেকে সঠিকটিকে নির্বাচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয়।

আমি নিজের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম, কে যেন বলছে অনেকদিন ধরে আমি যার প্রয়োজন অনুভব করেছি, কিন্তু উপেক্ষা করেছি, তার এখন সময় এসেছে—সেটা হল নতুন করে আরম্ভ করা। আমাকে স্লেট মুছে ফেলে নতুন করে অঙ্ক কষতে হবে। আগেকার অঙ্কগুলো কি আমার ভুল হয়েছিল? নিজের জীবনের উন্নতির মূল্যায়ন করা সহজ কাজ নয়। এখানে ছাত্রকে নিজেই নিজের জন্যে প্রশ্নরচনা করতে হয়, নিজেই তার উত্তর খুঁজে বার করতে হয়, আর নিজের সন্তুষ্টির জন্যে নিজেকেই সে উত্তরের মূল্যায়ন করতে হয়। ভাল-মন্দের বিচার ছাড়াও, আঠারো বছর ISRO-তে কাটানোর পরে সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার কাজটি কখনওই বেদনাবিহীন হতে পারে না। আমার বন্ধুরা, যাঁরা ব্যথিত হলেন তাঁদের প্রতি যদি আমি লুইস ক্যারলের এই লাইনগুলি উদ্ধৃত করি, তা হলে বোধহয় খুব বেমানান হবে না:

আমাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করো—
কিংবা আমাকে নির্বোধ আখ্যা দিতে পার
(কারণ প্রত্যেকেই আমরা কখনও কখনও বড় দুর্বল)
কিন্তু সামান্যতম মিথ্যে ভান
কখনওই আমার ভেতরে ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

স্বস্ত্যয়ন

[১৯৮১ - ১৯৯১]

যত কৌশল, যত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যত বিদ্বেষ,
নিমজ্জিত হোক যুক্তির দিনবসানে,
যখন দুর্বলতা হবে শক্তি, যা ছিল অন্ধকার
তা আলোকিত হবে, যা মন্দ তা ভাল হয়ে উঠবে।

লুইস ক্যারল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

এই সময়ে আমার চাকরি নিয়ে একটা ছোটখাটো টানাটানি আরম্ভ হল। একদিকে ISRO আমাকে ছাড়তে একটু গররাজি, আরেক দিকে DRDO আমাকে চাইছে। মাসের পর মাস কেটে গেল, ISRO এবং DRDO-র মধ্যে প্রচুর চিঠিপত্র চালাচালি হল, আলোচনা অনেক হল প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মহাকাশ বিভাগের সচিবালয়ে, যাতে উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক কোনও পন্থা বেরোয়। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টার পদ থেকে অধ্যাপক রামান্না অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁর জায়গায় এসেছেন, তখনও পর্যন্ত যিনি হায়দ্রাবাদে প্রতিরক্ষা ধাতুবিদ্যা গবেষণা ল্যাবরেটরির (Defence Metallurgical Research Laboratory) (DRML) ডিরেক্টর ছিলেন, ড. ভি. এস. অরুণাচলম। ড. অরুণাচলম তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক আমলাতন্ত্রের নানা সূক্ষ্ম কায়দা-কানুনের তিনি পরোয়া করতেন না। ইতিমধ্যে, আমি শুনলাম, তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর. ভেঙ্কটরমন অধ্যাপক ধাওয়ানের সঙ্গে আমার ক্ষেপণাস্ত্র ল্যাবরেটরির দায়িত্ব গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মনে হচ্ছিল অধ্যাপক ধাওয়ানও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উচ্চতম স্তরে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যে সব তুচ্ছ দ্বিধা সন্দেহের দরুন বছরখানেক ধরে ব্যাপারটা বিলম্বিত হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তার অবসান ঘটিয়ে ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-তে আমাকে DRDL-এর ডিরেকটর পদে নিয়োগ করা হল।

ISRO-তে অধ্যাপক থাকা কালে ধাওয়ান প্রায়ই আমার ঘরে আসতেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশ উৎক্ষেপণ যান প্রকল্পের বিকাশ সম্পর্কে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলতেন। অত বড় একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করা একটা মস্ত সৌভাগ্য। আমি ISRO ত্যাগ করবার আগে, ২০০০ সাল নাগাদ ভারতে মহাকাশ কর্মসূচি কী রকম চেহারা নেবে, যে বিষয়ে অধ্যাপক ধাওয়ান আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে বললেন। ISRO-র পরিচালক এবং কর্মীরা প্রায় সবাই আমার বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেটা একটা বিদায়-সভার মতোও হয়েছিল।

ড. ভি. এস. অরুণাচলমের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ১৯৭৬ সালে যখন আমি SLV-র [মহাকাশ যানের] জাড্যগতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ মঞ্চ (inertial guidince platform)-এর জন্যে অ্যালুমিনিয়াম সংকরে বহিরাবরণ ঢালাই (aluminium alloy investment casting)-এর ব্যাপারে DMRL-এ গিয়েছিলাম। এই বহিরাবরণ ঢালাই ছিল ভারতে প্রথম সেই জাতীয় কাজ। ড. অরুণাচলম তাকে একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের মতো করে নিয়ে, অবিশ্বাস্য কম সময়ে, দু-মাসে সেটি তৈরি করেছিলেন। তাঁর যৌবনোচিত প্রাণশক্তি এবং উৎসাহ দেখে সব সময়ে আমার বিস্ময়ের উদ্রেক হত। সেই তরুণ ধাতুবিজ্ঞানী অল্প সময়ের মধ্যে ধাতু-প্রস্তুতের বিজ্ঞানকে ধাতু-নির্মাণের উন্নততর প্রযুক্তিতে উন্নীত করেছিলেন, পরে যা হয়ে উঠল সংকর-ধাতু বিকাশের একটি বিশিষ্ট কলা। দীর্ঘকায়, সুঠাম-দেহী ড. অরুণাচলম নিজেই ছিলেন একটি বিদ্যুৎশক্তি সম্পন্ন ডায়নামো। আমি দেখলাম বলিষ্ঠ আচরণ সম্পন্ন তিনি একজন অসাধারণ বন্ধুভাবাপন্ন মানুষও বটে, আর সহকর্মী হিসাবেও তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট।

১৯৮২-র এপ্রিলে আমি DRDL-এ গেলাম। উদ্দেশ্য, যেখানে আমাকে কাজ করতে হবে সে জায়গাটা কী রকম একবার দেখে আসব। DRDL-এর তখনকার ডিরেকটর এস. এল. বনসাল আমাকে ঘুরিয়ে দেখালেন এবং ল্যাবরেটরির বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। DRDL তখন পাঁচটি কর্মী প্রকল্প নিয়ে এবং ১৬টি এমন প্রকল্প যাতে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তা নিয়ে কাজ করছিল। তাছাড়া এঁরা কয়েকটি প্রযুক্তি-সংক্রান্ত কাজও করছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের কাজে খানিকটা এগিয়ে থাকা। আমার বিশেষ নজর কাড়ল ৩০ টনের জোড়া Liquid Propellant Rocket Engine-সংক্রান্ত প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজের আন্না বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি প্রদান করেছে। এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমার ডিগ্রি পাওয়ার পর প্রায় বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রকেট-বিদ্যার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টাকে আন্না বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দেওয়াতে আমি খুশি হলাম। তবে সবচেয়ে আনন্দ হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বৎমহলে আমাদের কাজের মূল্য স্বীকৃত হওয়ায়। আরও আনন্দ হল যখন দেখলাম, যে-সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপাধিটি আমাকে দেওয়া হল তাতে পৌরোহিত্য করলেন অধ্যাপক রাজা রামান্না।

১৯৮২-র ১ জুন আমি DRDL-এ যোগ দিলাম। অনতিবিলম্বে আমি টের পেলাম ল্যাবরেটরিটি "ডেভিল" ক্ষেপণাস্ত্র বাতিল হওয়ার জের তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অনেক ভাল ভাল পেশাজীবী (professionals) তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁদের হতাশা। একজন বিজ্ঞানী যখন দেখেন, তাঁর বোধগম্য নয়, তাঁর আগ্রহের অভাবের জন্যে নয়, অন্য কোনও কারণে যে-কাজ তিনি করছিলেন তার সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল, তাঁর তখন কেমন লাগে, বিজ্ঞানের জগতের বাইরের কোনও লোকের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। DRDL-এ সকলের মানসিক অবস্থা এবং কাজের গতি দেখে আমার মনে পড়ল স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের "The Rime of the Ancient Mariner":

দিনের পর দিন, দিনের পর দিন আমরা
এক জায়গাতেই অনড়, বায়ু নেই, গতি নেই;
ছবিতে আঁকা সমুদ্রে
ছবিতে আঁকা জাহাজের মতো কর্মহীন।

AMARBOI.COM

আমি দেখলাম আমার বরিষ্ঠ সহকর্মীরা সবাই আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এই একটা ধারণা সেখানে ব্যাপ্ত হয়ে ছিল যে, সেই ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পদস্থ অফিসারেরা তঞ্চকতা করেছেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, একমাত্র "ডেভিল"-কে কবরস্থ করলে তবেই আশা এবং ভবিষ্যতের কল্পনা আবার জাগতে পারে।

প্রায় মাসখানেক পরে তদানীন্তন নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল ও. এস. ডসন DRDL-এ এলেন। তখন আমার একটা সুযোগ হল একটা বিষয় উত্থাপন করবার। Tactical Core Vehicle (TCV) সংক্রান্ত একটি প্রকল্প বেশ কিছুদিন ধরে ঝুলে ছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ উপব্যবস্থাসহ একটি একক core vehicle হিসেবে দ্রুত ক্রিয়াশীল ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র, একটি অ-তেজস্ক্রিয় আকাশ-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র—যা উৎক্ষেপণ করা যায় হেলিকপ্টার থেকে বা নির্দিষ্ট চালু বায়ুযান থেকে, তার আনুষঙ্গিক কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন, এই ব্যাপারটি তাদের বোঝানো

গিয়েছিল। তবে আমি তার কারিগরিগত জটিলতার কথা বাদ দিয়ে শুধু সমরক্ষেত্রে তার উপযোগিতার কথাটাই অ্যাডমিরাল ডসনকে বিশেষ করে বললাম এবং তার উৎপাদনের প্রসঙ্গটাও সামনে নিয়ে এলাম। আমার নতুন সহকর্মীরা আমার কথার তাৎপর্য ঠিকই বুঝলেন: এমন কিছু নির্মাণ কোরো না যা পরে বিক্রি করতে পারবে না, কিংবা একটি মাত্র জিনিস তৈরি করতেই সারা জীবন কাটিয়ে দিও না। ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন এক বহুমাত্রিক কর্মধারা—তার শুধু একটি দিক নিয়েই যদি দীর্ঘকাল পড়ে থাক, তাহলে আর এগোতে পারবে না।

DRDL-এ আমার প্রথম কয়েক মাস প্রধানত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই কাটল, আমি সেন্ট জোসেফ-এ পড়েছিলাম, একটি ইলেকট্রনকে কণাও মনে হতে পারে, তরঙ্গও মনে হতে পারে। তুমি কী ভাবে সেটিকে দেখছ, তার ওপর সেটা নির্ভর করে। তুমি যদি কণা-ভিত্তিক প্রশ্ন কর, কণা-ভিত্তিক উত্তর পাবে, যদি তরঙ্গ-ভিত্তিক প্রশ্ন কর, তরঙ্গ-ভিত্তিক উত্তর পাবে। আমি শুধু যে আমাদের কী লক্ষ্য তাই বুঝিয়ে বললাম তা নয়, এক দিকে আমরা, আর অন্যদিকে আমাদের কাজ এই দুয়ের পরস্পরের মধ্যে সেই লক্ষ্যগুলো যেন একটা খেলা। এই ভাবেই সেগুলোর কথা বললাম। রোনাল্ড ফিশার একবার একটা সভায় কী বলেছিলেন, আমার মনে পড়ল। "শর্করার কোনও দানায় আমরা যে মিষ্টতার স্বাদ পাই, সেটা শর্করারও গুণ নয়, আমাদেরও গুণ নয়, শর্করার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় আমরা সেই মিষ্টত্বের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে থাকি।"

ততদিনে উর্ধ্বমুখী সরলরেখা বরাবর ক্ষেপণাস্ত্র পথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে খুব ভাল কাজ হয়েছিল। DRDL-এর কর্মীদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হলাম। তাঁদের আগেকার প্রকল্পগুলি অকালে বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও তারা কাজ করে যেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন উপ-ব্যবস্থাসমূহর পর্যালোচনার ব্যবস্থা আমি করলাম, আমরা যা চাই তার ঠিক-ঠিক পরিমাপ কী হবে, তা জানার জন্যে। DRDO-র পুরনো দিনের অনেকে হতচকিত হয়ে দেখলেন, আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেমন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউড অফ সায়েন্স, কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পাওয়া যেতে পারে, সেখান থেকে সেই সব বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে আনতে আরম্ভ করলাম। আমার মনে হল DRDL-এর বিভিন্ন কর্মকেন্দ্র, যেখানে একটা বদ্ধ আবহাওয়া ছিল সেখানে একটু খোলা হাওয়ার প্রয়োজন। একবার আমরা জানালাগুলো যখন পুরোপুরি খুলে দিলাম, বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আলোয় সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আবারো একবার আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলরিজের "Ancient Mariner"-এর মনে পড়ল: "দ্রুত থেকে দ্রুততর হল জাহাজের গতি, মসৃণভাবে পেরোতে লাগল একটির পর একটি এগিয়ে আসা ঢেউ।"

১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে অধ্যাপক ধাওয়ান DRDL-এ এলেন। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিলাম প্রায় এক দশক আগে আমাকে তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমার স্বপ্ন যে সত্যি হবে, তার আগে তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। অনেকে আছে, যারা তাদের জীবনের লক্ষ্যের দিকে জোর কদমে এগিয়ে যায়। অন্যরা পা ওঠায় নামায় কিন্তু চলা যেন শুরু করতে চায় না, কারণ তারা কী চায় তারা নিজেরাই জানে না, এবং কী করে তা পাবে, তাও জানে না।" ISRO-র ভাগ্য ভাল যে তাদের হাল ধরবার জন্যে তারা অধ্যাপক সারাভাই ও অধ্যাপক ধাওয়ানকে পেয়েছিল। তাদের জন্যে লক্ষ্য তাঁরা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে বিরাট আকার দান করেছিলেন এবং তাদের সমগ্র কর্মীসংঘকে উদ্দীপিত করেছিলেন। DRDL-এর সে সৌভাগ্য হয়নি। তাদের উৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরিকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে, অথচ তার ক্ষমতা কম ছিল না, সম্ভাবনাও কম ছিল না এবং তাদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রত্যাশাও কম ছিল না। আমার যে টিম, উচ্চ পেশাদারী গুণসম্পন্ন, অথচ একটু যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তার কথা আমি অধ্যাপক ধাওয়ানকে বললাম। অধ্যাপক ধাওয়ানের মুখে তাঁর পরিচিত আকর্ণবিস্তৃত হাসিটি দেখা গেল। সে হাসির অর্থ নানারকম হতে পারে।

DRDL-এ গবেষণা ও বিকাশ সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত করবার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত অবিলম্বে গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সারা জীবন আমি বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে খোলাখুলি কাজ করেছি। খুব কাছ থেকে আমি দেখেছি, গোপনে শলাপরামর্শ করা, গোপনে হের-ফের করা, এসবের পরিণতিতে কী অবক্ষয় আসতে পারে, কেমন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে পারে সব কিছু। আমি চিরকাল এই ধরনের প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞা করেছি, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছি। অতএব আমাদের প্রথম বড় সিদ্ধান্ত হল, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি ফোরাম তৈরি করা হবে, সেখানে সমবেত ভাবে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হবে। এ ভাবে DRDL-এর মধ্যেই একটি উচ্চপর্যায়ের সমিতি গঠিত হল, যার নাম দেওয়া হল, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি কমিটি (Missile Technology Committee)। পরিচালনায় অংশীদারত্ব-র ধারণা কার্যকর করা হল এবং ল্যাবরেটরির কাজকর্মের পরিচালনায় মধ্যস্তরীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের টেনে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করা হল।

অনেক দিন তর্কবিতর্ক এবং অনেক সপ্তাহ ধরে ভাবনা-চিন্তার পরিণতিতে পাওয়া গেল দীর্ঘমেয়াদি দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ কর্মসূচি ("Guided Missile Development Programme.") কোথায় যেন আমি পড়েছি, "তুমি কোথায় যাচ্ছ সেটা জানো। কোথায় তুমি আছ, সেটা জানার চেয়ে অনেক বড় জিনিস হল, কোন দিকে চলেছ সেটা জানা।" পাশ্চাত্য দেশগুলির যে প্রযুক্তিগত শক্তি তা যদি আমাদের না থেকে থাকে, তাতে কী? আমরা জানতাম, সেই শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে, এবং এই সঙ্কল্পই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের দেশে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র-বিকাশ কর্মসূচি রচনা করবার জন্য আমার নেতৃত্বে একটি সমিতি গঠিত হল। তার সদস্যেরা হলেন, জেড. পি. মার্শাল, যিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদের ভারত ডায়নামিকস্ লিমিটেড-এর প্রধান, এন. আর. আয়ার, এ. কে. কাপুর এবং কে. এস. বেঙ্কটরমন। আমরা একটি খসড়া প্রস্তুত করলাম, রাজনৈতিক বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে (Cabinet Committee for Political Affairs) (CCPA) বিবেচনার জন্যে। এই খড়সার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল তিনটি প্রতিরক্ষা বিভাগের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে। আনুমানিক খরচের আমরা একটা হিসাব করলাম, বারো বছরের একটি সময়সীমার মধ্যে ব্যয় ধরা হল ৩৯০ কোটি টাকা।

অর্থের অভাবে বিকাশ কর্মসূচি প্রায়শই উৎপাদনের মুখে এসে বন্ধ হয়ে যায়। আমরা চাইলাম দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন ও নির্মাণের জন্যে অর্থ মঞ্জুর করা হোক, একটি নিচু স্তরের ত্বরিৎ-প্রতিক্রিয়ার ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিকেলস এবং একটি মাঝারি পাল্লার ভূমি-থেকে-ভূমি অস্ত্র ব্যবস্থা। আমরা পরিকল্পনা করলাম, দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি বহু লক্ষ্য ভেদ করার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা সহ মাঝারি পাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ অস্ত্র ব্যবস্থা নির্মাণ করব। ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম সারির সংস্থা বলে DRDL-এর সুনাম ছিল। তাই একটি তৃতীয় প্রজন্মের ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র, যার 'fire and forget' যোগ্যতা থাকবে, তার বিকাশের প্রস্তাব দিলাম আমি। আমার সহকর্মীরা সকলেই এই প্রস্তাবে খুশি হলেন। অনেকদিন আগে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, আবার নতুন করে তা আরম্ভ করায় তাঁরা সুযোগ দেখতে পেলেন। কিন্তু আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমার নিজের একটি স্বপ্ন ছিল, একটি Re-entry Experiment Launch Vehicle (REX)-এর। সেটি এতদিন ধামা-চাপা দেওয়া ছিল। তাকে পুনরুদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মনে। আমি আমার সহকর্মীদের একটি প্রযুক্তি বিকাশ প্রকল্প হাতে নিতে রাজি করলাম, তাপ-বর্মের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য যাতে পাওয়া যায়, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে। ভবিষ্যতে দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের ক্ষমতা গড়ে তুলতে এই তাপ-বর্মের খুবই প্রয়োজন পড়বে।

সাউথ ব্লকে (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক) আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করলাম। সেই উপস্থাপনায় পৌরোহিত্য করলেন তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর. ভেঙ্কটরমন এবং উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনী-প্রধান, জেনারেল কৃষ্ণ রাও, এয়ার চিফ মার্শাল দিলবাগ সিং এবং অ্যাডমিরাল ডসন। ক্যাবিনেট সচিব কৃষ্ণ রাও, প্রতিরক্ষা সচিব এস. এম. ঘোষ, এবং ব্যয়-বিভাগের সচিব আর. গণপতিও উপস্থিত ছিলেন। সকলেরই দেখলাম নানারকম সন্দেহ। সন্দেহ আমরা কতটা কী পারব সে বিষয়ে, প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো যেমন-যেমন প্রয়োজন পাওয়া যাবে কি না সে-বিষয়ে, আমাদের প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া যাবে কি না কিংবা তার খরচ কত পড়বে সে বিষয়ে। প্রশ্নোত্তর কালে ড. অরুণাচলম আমার সমর্থনে অবিচল থাকলেন, সদস্যরা সন্দিগ্ধ, এমন ভরসাও পাচ্ছেন না যে আমরা উদ্যম হারাব না, হাত গুটিয়ে বসে পড়ব না, বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রায়শই যা দেখা যায়। যদিও কয়েকজন আমাদের এই অত্যধিক উচ্চাশা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। ভারত যে তার নিজস্ব একটি ক্ষেপণাস্ত্রতন্ত্র লাভ করবে, এই চিন্তা কিন্তু সকলকেই অতিশয় উত্তেজিত করে তুলল, এমনকী সন্দেহবাতিকগ্রস্তদেরকেও। শেষকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেঙ্কটরমন আমাদেরকে ঘণ্টা তিনেক বাদে, সন্ধ্যাবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

AMARBOI.COM

ততক্ষণ আমরা সবরকম প্রক্রিয়ায় হিসেব-নিকেশ করলাম। যদি তাঁরা মোটে ১০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেন, সে টাকাটা কীভাবে ভাগ হবে? যদি ২০০ কোটি টাকা পাই, কী করব? সন্ধ্যাবেলা যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছে গেলাম আমার মন বলল, যত যাই হোক, কিছু টাকা আমরা পাবই। কিন্তু মন্ত্রী যখন বললেন, পর্যায়ে-পর্যায়ে ক্ষেপণাস্ত্র না বানিয়ে আমরা একটা অখণ্ড দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ কর্মসূচি আরম্ভ করতে পারি—সে-সময় আমরা যেন আমাদের নিজেদের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে আমরা হতবাক। অনেকক্ষণ সবাই নিশ্চুপ, তারপর ড. অরুণাচলম উত্তর দিলেন, "দয়া করে আমাদের একটু সময় দিন, স্যার! আমরা একটু নতুন করে ভেবে দেখে আবার ফিরে আসব।" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন, "হ্যাঁ, দয়া করে কাল সকালেই ফিরে আসুন।" আমার মনে পড়ল অধ্যাপক সারাভাইয়ের কর্মোৎসাহ ও ভবিষ্যৎ কল্পনার কথা। সেই রাত্রে ড. অরুণাচলম এবং আমি একযোগে কাজ করে আমাদের পরিকল্পনাটিকে নতুন রূপ দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আমাদের প্রস্তাবটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নতি ঘটালাম। সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন ধরা যাক, নকশা, নির্মাণ, একীকরণ ব্যবস্থা, যোগ্যতা, পরীক্ষামূলক উড়ান, মূল্যায়ন, সমসাময়িক করে তোলা, পরীক্ষামূলক প্রয়োগ, উৎপাদন যোগ্যতা, গুণমান, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সবরকম অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। এই সমগ্র বিষয়টিকে আমরা একটি একক, অখণ্ড কাজ হিসেবে খাড়া করলাম এই কারণে যে, সম্পূর্ণ দেশজ পদ্ধতিতে, দেশজ প্রচেষ্টায় যাতে দেশের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা যায়। নকশা, উন্নয়ন, উৎপাদন একত্রিত-করণের ধারণাকে আমরা স্থির করলাম এবং একেবারে ড্রইংবোর্ড পর্যায় থেকে প্রয়োগ ও তদারকি মাধ্যমের যোগদান-বিষয়ে প্রস্তাব দিলাম। এছাড়াও এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছোনোর লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট বছরগুলির কাজকর্মের উন্নতি বোঝার জন্যে একটি পদ্ধতিতত্ত্বের সপক্ষে মত প্রকাশ করলাম। আমরা চাইলাম আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীত্রয়কে আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র দান করতে, কোনও সেকেলে অস্ত্র সম্ভার নয়। এটা ছিল আমাদের সামনে ফেলে দেওয়া একটা অত্যন্ত চমকপ্রদ চ্যালেঞ্জ।

যখন আমাদের কাজ শেষ হল, সকাল হয়ে গেছে। হঠাৎই, প্রাতরাশ খাবার টেবিলে বসে আমার মনে পড়ল, সেই রাত্রেই আমার ভাইয়ের মেয়ে জামিলার বিয়েতে রামেশ্বরমে যাওয়ার কথা। মনে হল, বড় দেরি হয়ে গেছে, আর কিছু করবার নেই। সেদিন বেশি রাত্রে মাদ্রাজের বিমান যদি বা ধরতে পারি, মাদ্রাজ থেকে রামেশ্বরম পৌঁছব কী করে? মাদ্রাজ থেকে মাদুরাই যাবার কোনও বিমান নেই যে তাতে করে আমি সন্ধ্যাবেলা রামেশ্বরমের ট্রেন ধরতে পারি। একটা অপরাধবোধে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। এটা কি ঠিক হল, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব কী এইভাবে ভুলে যাওয়া আমার উচিত হয়েছে? জামিলা আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বেশি। তার বিয়েতে আমি যাব না, দিল্লিতে কাজ নিয়ে থাকব, এ-চিন্তা বড়ই বেদনাদায়ক। যাইহোক, প্রাতরাশ সেরে আমি মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য রওনা হলাম।

তাঁর সঙ্গে দেখা করে যখন আমাদের সংশোধিত প্রস্তাব তাঁকে দেখালাম, বোঝাই গেল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেঙ্কটরমন খুশি হয়েছেন। ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ প্রকল্পটি রাতারাতি ভোল পাল্টে হয়েছে একটি সুসংহত কর্ম পরিকল্পনার নকশায়, যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। তা থেকে উৎপন্ন হবে বহু প্রকারের বাড়তি সব লাভজনক বস্তু। আগের দিন সন্ধ্যায় ঠিক এই রকমটির কথাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, তবুও আমি প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত ছিলাম না যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সমগ্র প্রস্তাবটিকে তিনি ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি ঠিক তাই করলেন। আমার আনন্দের কোনও সীমা-পরিসীমা রইল না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, অর্থাৎ বৈঠক শেষ। আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনাকে যখন আমি এখানে এনেছিলাম তখন থেকেই আমি আশা করে আছি এ-রকম কিছু একটা আপনি দেবেন। আপনার কাজ দেখে আমি খুশি।" এক লহমায় ১৯৮২ সালে আমার DRDL-এর ডিরেক্টর পদে নিয়োগের রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। তা হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেঙ্কটরমনই আমাকে নিয়ে এসেছেন! নত হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দরজার দিকে ফিরে যেতে যেতে শুনলাম ড. অরুণাচলম মন্ত্রীকে সেই সন্ধ্যায় রামেশ্বরমে আমার ভাইঝি জামিলার বিয়ের কথা বলছেন। মন্ত্রীর সামনে ড. অরুণাচলম সে কথা তোলাতে আমি বিস্মিত হলাম। তাঁর মতো মর্যাদার একজন মানুষ যিনি সাউথ ব্লকের মতো শক্তি-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, কোথায় সুদূর কোন দ্বীপের মস্ক স্ট্রিটে কার বিয়ে হচ্ছে, তাতে তাঁর কী এসে যায়?

আমি বরাবর ড. অরুণাচলমকে অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন বলে মনে করে এসেছি। তাঁর একই সঙ্গে আছে ভাষার ওপর দখল, যেটা এখন বোঝা গেল, আর অসম্ভব রকম উপস্থিত বুদ্ধি। আমি অভিভূত হলাম, যখন দেখলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারের কথা জানালেন। সেই হেলিকপ্টারটি মাদ্রাজ এবং মাদুরাইয়ের মধ্যে যাওয়া-আসা করে। এক ঘণ্টা বাদে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের নিয়মিত উড়ানের যে বিমানটির মাদ্রাজ থেকে রওনা হওয়ার কথা, মাদ্রাজে সেটি থেকে আমি অবতরণ করা মাত্র সেই হেলিকপ্টার আমাকে মাদুরাই নিয়ে যাবে। ড. অরুণাচলম আমাকে বললেন, গত ছ'মাস তুমি যে পরিশ্রমটা করেছ, তাতে এটুকু তোমার পাওনা।

আকাশ পথে মাদ্রাজ যাওয়ার সময়ে আমার বোর্ডিং পাসের পিছন দিকে আমি লিখলাম:

ক্লান্ত পদে যে কখনও মাইলের পর মাইল
অতিক্রম করেনি,
সে কি কখনও রামেশ্বরমের তটভূমিতে
প্রবেশ করতে পারবে?

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানটি দিল্লি থেকে পৌঁছনো মাত্র বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার তার কাছেই নামল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি মাদুরাইয়ের পথে। সেখানকার বিমান বাহিনীর কমান্ডান্ট অনুগ্রহ করে আমাকে রেল স্টেশনে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন। সেখানে রামেশ্বরমের ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব করছে। আমি জামিলার বিয়ের জন্যে অনেক সময় থাকতেই রামেশ্বরম পৌঁছে গেলাম। ভাইঝিকে আমি পিতৃস্নেহে আশীর্বাদ করলাম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাদের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করলেন এবং পাশ করিয়ে নিলেন। আমাদের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ সমূহ গৃহীত হল এবং সে উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হল তা আগে কোনওদিন হয়নি, ৩৮৮ কোটি টাকা। এইভাবে জন্ম নিল ভারতের উঁচু দরের Integrated Guided Missile Development Programme, পরবর্তীকালে যাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হত IGMDP.

সরকারের মঞ্জুরি-পত্র যখন আমি DRDL-এ ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি কমিটিতে (Missile Technology Committee)-তে পেশ করলাম তাঁরা উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন, কাজে নামবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের নামকরণ হল ভারতের আত্মনির্ভরতার সঙ্কল্প অনুযায়ী। ভূমি-থেকে-ভূমি অস্ত্র-ব্যবস্থার নাম হল "পৃথ্বী" এবং ট্যাকটিক্যাল কোর ভেহিকেলসটির নাম হল "ত্রিশূল" (দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূল)। ভূমি-থেকে-আকাশ—এই অঞ্চল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হল "আকাশ" এবং ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্রকে বলা হল "নাগ"। আমার দীর্ঘ-লালিত স্বপ্নের REX-এর নাম আমি দিলাম "অগ্নি"। ড. অরুণাচলম DRDL-এ এলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ জুলাই ১৯৮৩ IGMDP-র উদ্‌বোধন করলেন। সে এক বিরাট ঘটনা যাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন DRDL-এর সবচেয়ে নিচুতলার কর্মীটিও। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় যাঁদের কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তাঁরা সবাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এলেন অন্য নানা ল্যাবরেটরি ও সংগঠন থেকে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধ্যাপকবৃন্দ। যাঁরা আমাদের কাজের অংশীদার ছিলেন, সেই সামরিক বাহিনী থেকে, উৎপাদন কেন্দ্র থেকে, উপস্থিত হলেন পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে একটি ক্লোজড সারকিট টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বসানো হল, কেন না সকলকে একসঙ্গে থাকতে দেওয়ার মতো জায়গা আমাদের ছিল না।

আমার কর্মজীবনের এটি ছিল দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ দিন, যে দিন SLV-3 ভূ-কেন্দ্রিক কক্ষপথে "রোহিণী" স্থাপন করেছিল সেই ১৮ জুলাই ১৯৮০-র পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

ভারতের বিজ্ঞান আকাশে IGMDP-র আরম্ভটি ছিল একটা আলোর ঝলকানি। মনে করা হয়ে এসেছিল ক্ষেপণাস্ত্র-প্রযুক্তি পৃথিবীর অল্প কয়েকটি বাছাই করা জাতির বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন। সেই সময়ে ভারতের সম্বল বলতে যা ছিল তাই নিয়ে, আমরা যা করব বলে সঙ্কল্প করেছি কী করে তা করতে পারি লোকের সেটা একটা কৌতূহলের বিষয় ছিল। IGMDP যে মাপের কাজ, এ-দেশে তত বড় কাজ কখনও এর আগে হয়নি, এবং ভারতীয় গবেষণা ও বিকাশ সংস্থা সমূহের কাজের যে মান, যেভাবে তারা কাজ করে থাকে, তাতে ওইরকম সময়সূচি অনুযায়ী কাজ করার পরিকল্পনাকে আকাশকুসুম মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলাম যে কর্মসূচির অনুমোদন লাভ করাটা মোট কাজের দশ শতাংশের বেশি কোনও ক্রমেই মনে করা যায় না। কাজটা চালু করে দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। কাজ যত এগোবে, কাজের গতি বজায় রাখার দায়িত্ব তত গুরুভার হবে। অগ্রসর হওয়ার মতো অর্থ যখন পুরোপুরি আমাদের দেওয়া হয়েছে, অনুমতি যখন পেয়েছি, এবারে আমাকে সহকর্মীদের নিয়ে কাজে এগিয়ে যেতে হবে, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা পালন করতে হবে।

ক্ষেপণাস্ত্র-কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করতে, তার নকশা থেকে আরম্ভ করে তাকে উৎক্ষেপণ স্থলে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কী কী প্রয়োজন হবে? উৎকৃষ্ট মানবসম্পদ আমাদের হাতে ছিল, অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে, পরিকাঠামোও খানিকটা ছিল, তবে অভাব কীসের? একটি প্রকল্পের আর কী প্রয়োজন হয়, ওই তিনটি অপরিহার্য বস্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া? আমার SLV-3-র অভিজ্ঞতার পরে, আমার মনে হল সে প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। সবচেয়ে মারাত্মক প্রয়োজন হবে আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্থার ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে নিগূঢ় অধিকার। বিদেশ থেকে কোনও প্রত্যাশা আমার ছিল না। প্রযুক্তি যেহেতু গোষ্ঠীর কাজ, আমাদের প্রয়োজন ছিল এমন নেতার যাঁরা নিজেরাই শুধু ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে মন-প্রাণ ঢেলে দেবেন তাই নয়, অন্য শত শত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারকেও সঙ্গে নিয়ে চলবেন। আমরা জানতাম বহু প্রতিবন্ধকতা আমাদের সামনে আসাবে, বিভিন্ন অংশীদার ল্যাবরেটরির নানা অদ্ভুত নিয়ম-কানুনের সম্মুখীনও আমাদের হতে হবে। আমাদের নানা সরকারি শিল্পোদ্যোগের ধারণা, তাদের কাজকর্মকে কোনওদিন বাস্তবতার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাদের সে মনোভাবের প্রতিবিধান করা দরকার। সমগ্র ব্যবস্থাটিরই—কর্মীদের, কর্মপদ্ধতির, পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে যত দূর সাধ্য পূর্ণ ব্যবহার। আমরা এমন কিছু সম্ভব করে তুলতে চাইছিলাম যা আমাদের সমবেত জাতীয় সাধ্যের নাগালের অনেকটা বাইরে। এবং, এ বিষয়ে আমার কোনও ভুল ধারণা ছিল না যে, আমাদের টিম যদি সম্ভাবনার অনুপাতের ভিত্তিতে কাজ না করে কোনও লক্ষ্যই পূরণ হবে না।

DRDL-এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এইটে ছিল যে, সেখানে অসাধারণ মেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি সুবৃহৎ ভাণ্ডার ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁদের অনেকে ছিলেন আত্মাভিমান ও বিদ্রোহী মনোভাবে পূর্ণ। আরও দুঃখের কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এমন ছিল না যে, নিজেদের বিচারশক্তির ওপরে তাঁরা পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। ফলে কী হত, তাঁরা আলোচনায় খুব সোৎসাহে যোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত অল্প কয়েক জন যা বলতেন তাতেই রাজি হয়ে যেতেন। তাঁরা নিঃসংশয় আস্থা স্থাপন করতেন বহিরাগত বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও মেধাশক্তির ওপর।

DRDL-এ একজন অতিশয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম, তাঁর নাম এ. ভি. রঙ্গ রাও। কথোপকথনে পটু ছিলেন তিনি এবং তার ব্যক্তিত্ব ছিল মনে ছাপ ফেলবার মতো। সাধারণত তাঁর পোশাক ছিল লাল নেকটাই, চেক-কাটা কোট এবং ঢিলে-ঢালা প্যান্ট। হায়দ্রাবাদের গরমেও ওই তাঁর পোশাক, যেখানে এমনকী ফুল-হাতা শার্ট এবং জুতোও খুব অস্বস্তিকর মনে হয়। সাদা চাপ দাড়ি এবং দাঁতের ফাঁকে পাইপ নিয়ে তাঁর চেহারা এমন ছিল যে বিশেষ একটা পরিমণ্ডল যেন সব সময়ে সেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং একটু আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিটিকে ঘিরে থাকত।

ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আমি রঙ্গ রাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, যাতে আমাদের মানব সম্পদের আমরা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি। রঙ্গ রাও আমাদের বিজ্ঞানীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৪৩www.amarboi.com ~

সঙ্গে পর পর কয়েকটি বৈঠক করলেন। দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তাঁদের জানালেন, এবং IGMDP-র কাজের বিভিন্ন দিক তাঁদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। দীর্ঘ আলোচনা এবং মত-বিনিময়ের পর আমরা ঠিক করলাম আমরা ল্যাবরেটরিটিকে পুনর্গঠিত করে তাকে একটু প্রযুক্তিমুখী সংগঠনে রূপান্তরিত করব। প্রকল্পের নানাবিধ কাজকর্মের জন্যে আমাদের একটি ম্যাট্রিক্স ধরনের ব্যবস্থা দরকার ছিল। চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে চার শত বিজ্ঞানী সেই ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন।

সেই সময়ে আমাদের সামনে সব চাইতে দরকারি কাজ ছিল কয়েকজন প্রকল্প-পরিচালক নির্বাচন করা, যাঁরা এক-একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবেন। মেধা-সম্পন্ন বিজ্ঞানী আমাদের অনেক ছিলেন, প্রশ্ন ছিল, কাকে নেব—এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে সদা-আগ্রহী এমন কাউকে, না যিনি পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন, তাঁকে, না কি যিনি সকলের থেকে অন্য পন্থায় বিশ্বাসী তাঁকে, না সকলের ওপর যিনি কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসেন তাঁকে, না এমন একজনকে যিনি অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে পারেন? আমার এমন একজনকে দরকার ছিল যিনি লক্ষ্যটিকে পরিষ্কার দেখতে পাবেন, এবং বিভিন্ন কর্ম কেন্দ্রে যাঁরা নিজের নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে কাজ করছেন আমাদের সেই-সব সহকর্মীদের কর্মশক্তিকে ঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন।

কঠিন খেলা। তার কিছু কিছু নিয়ম আমি শিখেছিলাম ISRO-তে দু-দশক ধরে অত্যন্ত জরুরি কিছু কাজ করবার সময়ে। নির্বাচন ঠিক না হলে আমাদের কর্মসূচির সমস্ত ভবিষ্যৎ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে যাঁরা কাজ করবেন এমন সম্ভাবনাময় অনেক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম। আমি চাইলাম ওই পাঁচজন প্রকল্প পরিচালক আরও পঁচিশজন আগামীকালের প্রকল্প-পরিচালক ও দলনেতাকে প্রশিক্ষণ দিন।

আমার বরিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে (তাঁদের নাম করা ঠিক হবে না, কেন না এ আমার কল্পনাও হতে পারে) আমার সঙ্গে সে সময়ে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলেন। একজন নিঃসঙ্গ মানুষকে নিয়ে তাঁদের ভাবনার আমি সম্মান করতাম, কিন্তু কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমি পরিহার করে গিয়েছি। আসলে একজন বন্ধুর প্রতি আনুগত্য কাউকে হয়তো সহজেই অন্যায় কাজ করতে প্ররোচিত করতে পারে, যার ফলে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

আমি যে একাকী থাকতে চেয়েছিলাম তার প্রধান কারণ সম্ভবত ভালবাসার বেদনা এড়িয়ে চলবার বাসনা, আমার বিবেচনায় রকেট তৈরির চেয়ে সে আরও কঠিন কাজ।

আমি শুধু চেয়েছিলাম আমি যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করছি, তাতে আমি যেন সৎ থাকি, আমার দেশের রকেট-বিদ্যার চর্চা যেন আমি চালিয়ে যেতে সাহায্য করি এবং মাথা উঁচু করে, পরিষ্কার বিবেক নিয়ে যেন আমি যেতে পারি। পাঁচটি প্রকল্পের নেতা কে-কে হবেন তা ঠিক করতে আমি অনেক সময় নিলাম, অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমি অনেকের কাজের ধরণ-ধারণ পরীক্ষা করে দেখলাম। এ বিষয়ে আমার কোনও কোনও পর্যবেক্ষণ আপনাদের জানতে ইচ্ছা হতে পারে।

একজনের কাজের ধরণ-ধারণের গোড়ার কথা হল, তার কাজটাকে কীভাবে সে পরিকল্পনা করে, কিংবা কীভাবে তাকে সংগঠিত করে। এক প্রান্তে, যে সতর্কভাবে সবকিছু পরিকল্পনা করে, আগে থেকে ভেবে নিয়ে তবে এগোয়। যদি কোনও কিছু ভুল-চুক হয়, আগে থেকে সে তার ব্যবস্থা ভেবে রাখে। আরেক প্রান্তে, যে দ্রুত কাজ করে। তার কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা থাকে না, যখন যেমন দরকার সেই কৌশল অবলম্বন করে। কোনও একটা ধারণা যদি তাকে অনুপ্রাণিত করে, সে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত।

কাজের ধরণ-ধারণের আরেকটি দিক হল নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ সব কিছু যাতে ঠিক মতো চলে সেইটি নিশ্চিত করতে সে কতটা মনোযোগ, কতটা শক্তি নিয়োগ করতে প্রস্তুত। তার এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, দৃঢ় হাতে সে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে; খুব কড়া প্রশাসক, ঘনঘন দেখে সব-কিছু ঠিক মতো চলছে কিনা। তার মতে নিয়মকানুন সব কঠোর ভাবে মানতে হবে। আরেক প্রান্তে, যারা অত কড়াকড়ি নিয়মকানুনের ধার ধারে না, তাদের কাজের ধারা অনেকটা স্বাধীন, নমনীয়। আমলাতান্ত্রিক ধরণ-ধারণ তারা বরদাস্ত করে না। অধীনস্থদের হাতে তারা সহজেই দায়িত্ব ছেড়ে দেয়, স্বীধানতা দেয়। আমি চেয়েছিলাম এমন নেতাদের যাঁরা এই দুই-এর মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, যাঁরা ভিন্ন মত চাপা দেন না, কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন না।

আমি এমন লোক চাইছিলাম, নতুন নতুন সম্ভাবনা যত উন্মুক্ত হবে, যাঁদের কর্মক্ষমতাও তত বাড়বে, সম্ভাব্য সমস্ত বিকল্প অনুসন্ধান করার ধৈর্য যাঁদের থাকবে এবং নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো নীতি প্রয়োগ করতে যাঁরা সক্ষম হবেন; এমন লোক যাঁরা বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ করে এগিয়ে যেতে পারবেন। আমি চেয়েছিলাম, তাঁরা যা নতুন বা অনভ্যস্ত বা বহিরাগত, প্রয়োজনে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন, অন্যদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ কবে নেবেন, অন্যদের সঙ্গে মিলে কাজ করবেন, অন্যদেরকে কাজের দায়িত্ব দেবেন, নতুন মতামত গ্রহণ করবেন, সু-পরামর্শে কান দেবেন। তাঁরা যেন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিতর্ক মিটিয়ে নিতে পারেন, ভুলভ্রান্তি হলে তার দায়িত্ব অস্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না করেন। সর্বোপরি, ব্যর্থতা এলে তাঁরা যেন হতাশ না হন; সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুইই যেন তাঁরা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

"পৃথ্বী" প্রকল্পটির জন্যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ব্যক্তির খোঁজ আমার শেষ হল কর্নেল ভি. জে. সুন্দরমকে পেয়ে। তিনি ভারতীয় সেনা বাহিনীর EME Corps-এ ছিলেন। তাঁর এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল, যান্ত্রিক কম্পন (mechanical vibrations) সম্পর্কেও তাঁর বিশেষজ্ঞতা ছিল। তিনি DRDL-এ গঠন-সংক্রান্ত গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে এমন একজনকে পেলাম যিনি বিভিন্ন মতের মধ্যে বিরোধ মেটাবার নতুন নতুন পথ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সর্বদাই প্রস্তুত। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিষয়ে তিনি ছিলেন নতুন নতুন পন্থার উদ্ভাবক। কাজ করার বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতির কোনটা কতটা ভাল সে ব্যাপারে মূল্যায়নের তাঁর এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পরামর্শ দিতেন এবং তার ফলে এমন সমাধান পাওয়া যেত যেটা আগে কখনও চোখে পড়েনি। কোনও একটি বিশেষ লক্ষ্য হয়তো প্রকল্পের নেতার চোখে পরিষ্কার হতে পারে এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশও যথেষ্ট পরিমাণে তিনি দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিরা যদি সেই লক্ষ্যের অর্থ কিছু বুঝতে না পারেন, তাঁদের দিক থেকে বাধা আসতে পারে। সেই জন্যেই এমন নেতা দরকার যিনি এমন নির্দেশ দেবেন যাতে কাজ হয়। আমার মনে হল "পৃথ্বী"-র প্রকল্প অধিকর্তাই, উৎপাদন এজেন্সি সমূহ এবং সামরিক বাহিনী সমূহের সঙ্গে প্রথম সিদ্ধান্তগুলি নেবেন, এবং যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার জন্যে সুন্দরমকে নির্বাচন করাই সবচাইতে ভাল হবে।

"ত্রিশূল"-এর জন্যে আমি একজনকে চাইছিলাম ইলেকট্রনিকস্ এবং ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধেই শুধু যে তাঁর যথার্থ জ্ঞান থাকবে তাই নয়, যিনি সে সব জটিল বিষয় তাঁর টিমকেও বুঝিয়ে বলতে পারবেন, যাতে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক মতো হয়, যাতে তিনি তাঁর টিমের সমর্থন ও সহায়তাও পেতে পারেন। আমি সে-সব গুণ যাঁর মধ্যে পেলাম সেই কমান্ডার এস. আর. মোহন প্রতিরক্ষা গবেষণা ও বিকাশ-এ এসেছিলেন ভারতীয় নৌবহর থেকে। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়েও মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল, এবং অন্যদেরকে স্বমতে আনয়ন করার অদ্ভুত প্রতিভাও তাঁর ছিল।

আমার যে স্বপ্নের প্রকল্প, "অগ্নি" তার জন্যে আমার দরকার ছিল এমন একজনের যিনি প্রকল্প পরিচালনায় মাঝে মাঝে আমার হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন। আমি ঠিক তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটিই পেলাম, তিনি আর. এন. আগরওয়াল। তিনি MIT-র পাশ করা, তাঁর শিক্ষা-জীবন অতিশয় সমুজ্জ্বল। তিনি DRDL-এর Aeronautical Test Facilities অতিশয় যোগ্যতার সঙ্গে চালাচ্ছিলেন।

কিছু কিছু প্রযুক্তিতে জটিলতার কারণে "আকাশ" এবং "নাগ"-কে তখন মনে করা হত ভবিষ্যতের ক্ষেপণাস্ত্র। আশা করা হত যে, এই দুটির কাজকর্ম সর্বোচ্চ শিখরে উঠবে অর্ধদশক পরে। অতএব "আকাশ" এবং "নাগ"-এর জন্যে আমি নির্বাচন করলাম যথাক্রমে দুই অপেক্ষাকৃত তরুণ বিজ্ঞানী প্রহ্লাদ এবং এন. আর. আয়ারকে। অন্য দুই তরুণ বিজ্ঞানী ভি. কে. সারস্বত এবং এ. কে. কাপুরকে করা হল যথাক্রমে সুন্দরম ও মোহনের সহকারী।

সে-সব দিনে DRDL-এ এমন কোনও মঞ্চ ছিল না যেখানে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্ক করা যেত। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞানীরা মূলত ভাবপ্রবণও বটেন। একবার হোঁচট খেয়ে পড়লে তাঁদের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে। হতাশা, বিফলতা, যে কোনও লোকের জীবনেরই অঙ্গ, আর এ সব চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবেও। বিজ্ঞানেও তাই। তবু, আমি চাইনি আমার কোনও বিজ্ঞানীর সামনে এমন কোনও হতাশা আসুক যাতে তিনি এমন নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যা আর ফেরানো যায় না। আমি আর এই একটি জিনিস নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যে, তারা কেউ যেন, যখন তাঁদের মন দমে থাকে সেই সময়ে কোনও লক্ষ্য স্থির না করেন। সেই রকম ঘটনা নিবারণ করতে একটি বিজ্ঞান সমিতি বা সায়েন্স কাউন্সিল গঠন করা হল, অর্থাৎ একটি পঞ্চায়েত গোছের যেখানে সব বিজ্ঞানী, বরিষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ, প্রবীণ কিংবা নবীন, সবাই একসঙ্গে বসে যাঁর যাঁর মনের ভার লাঘব করতে পারেন।

সমিতির প্রথম সভাটিই ঘটনাবহুল হল। কেউ কেউ কোনও রকমে এক-আধটা প্রশ্ন উত্থাপন কিংবা সন্দেহ ব্যক্ত করবার পর একজন বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী এম. এন. রাও একটি প্রশ্ন করে বসলেন, "এই পঞ্চ-পাণ্ডবকে (অর্থাৎ পাঁচজন প্রকল্প-পরিচালককে) আপনি কীসের ভিত্তিতে নিয়োগ করলেন?" বস্তুত, আমি এই প্রশ্নটিই প্রত্যাশা করছিলাম। আমি তাঁকে বলতে চাইলাম, আমি দেখেছি এই পঞ্চ-পাণ্ডব সদর্থক চিন্তা নামক দ্রৌপদীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ। তার বদলে আমি রাওকে বললাম, ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখুন। এই প্রকল্প পরিচালকদের আমি শুধু আজকের কাজ করবার জন্যে বেছে নিইনি, আমি তাঁদেরকে দীর্ঘকালীন কর্মসূচির জন্যে নির্বাচিত করেছি, যখন নিত্যনতুন ঝড় ঝঞ্ঝা উঠবে।

প্রত্যেকটি আগামীকাল, আমি রাওকে বললাম, এইসব উৎসাহী মানুষ—এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগরওয়াল, প্রহ্লাদ, আয়ার এবং সারস্বতদের সামনে নতুন নতুন সুযোগ এনে দেবে, তাঁদের যে লক্ষ্য, আরও দৃঢ়ভাবে তাকে আয়ত্ত করতে, তাদের যে দায়বদ্ধতা তাকে আরও দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে।

একজন উৎপাদনশীল নেতার মধ্যে কী কী থাকা দরকার? আমার মতে, একজন উৎপাদনশীল নেতাকে কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে খুব পারদর্শী হতে হবে। সর্বক্ষণ তাঁকে সংগঠনের মধ্যে নতুন রক্ত সঞ্চালিত করে যেতে হবে। বিবিধ জটিলতা, বিবিধ সমস্যার সম্পর্কে যা করা দরকার তাঁকে দক্ষতা সহকারে করতে হবে। গবেষণা ও বিকাশ সংস্থার সামনে যে সব সমস্যা আসে সেগুলি প্রধানত বিচারের অনেক রকম মাপকাঠির মধ্যে, কোনটিকে রাখব, কোনটিকে ছাড়ব, সেই সংক্রান্ত হয়ে থাকে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা লাভের জন্যে এইসব জটিল সমস্যার সমাধানে দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজন। নিজের টিমের মধ্যে নেতার উৎসাহ সঞ্চার করতে পারা চাই। যোগ্য স্থানে তিনি যথাযথ কৃতিত্ব দিতে কসুর করবেন না। পিঠ চাপড়ে দেবেন সকলের সামনে কিন্তু সমালোচনা করবেন গোপনে, সমালোচনার-যোগ্য ব্যক্তিটির উপস্থিতিতে।

AMARBOI.COM

কঠিন প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম একটি উঠে এসেছিল এক তরুণ বিজ্ঞানীর মুখ থেকে: "ডেভিল কতদূর পর্যন্ত চলার পর এইসব প্রকল্প বন্ধ করে দেবেন?" আমি তাকে IGMDP-র পেছনের দর্শন ব্যাখ্যা করে বললাম—এটা শুরু হবে নকশার কাজ দিয়ে এবং শেষ হবে ঠিক ভাবে প্রয়োগের পর। উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রয়োগ সংক্রান্ত এজেন্সির অংশগ্রহণ একেবারে নকশার পর্যায় থেকে নিশ্চিত এবং যতদিন না ক্ষেপণাস্ত্র পদ্ধতি সফলভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে ততদিন এখান থেকে পেছু হটার কোনও প্রশ্নই নেই।

টিম গড়ার প্রক্রিয়া ও সাংগাঠনিক কাজ চালু হওয়ার মধ্যেই আমি দেখতে পেলাম যে, DRDL-এ যে-পরিমাণ জায়গা আছে তা IGMDP-র বিশাল পরিমাণ জায়গার চাহিদা মেটানোর পক্ষে একান্তই অনুপযোগী। প্রকল্পের কিছু কিছু অংশের কাজ তাই ব্যবস্থা করতে হবে কাছাকাছি অন্য কোনও জায়গায়। ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজনা এবং চেক-আউটের জন্যে "ডেভিল"-এর কাজের সময় যে বন্দোবস্ত স্থাপন করা হয়েছিল সেটি ছিল ১২০ বর্গমিটার একটি সেড-এ, যার মধ্যে আবার বসতি ছিল অসংখ্য পায়রার। অল্প দিনের মধ্যেই যে পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র এখানে একীকরণের জন্যে আসবে তার কাজ কোথায় হবে? একই অবস্থা Environmental Test Facility এবং

Avionics Laboratory-রও।

আমি নিকটবর্তী ইমরত কাঞ্চা অঞ্চলে গেলাম। কয়েক দশক আগে DRDL-এর উদ্ভাবিত ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা এখানে হত। সেটা ছিল একটা বৃক্ষহীন শূন্য প্রান্তর, জায়গায় জায়গায় বড় বড় পাথরের চাঁই, দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে যেমনটি দেখা যায়। আমার মনে হল যেন প্রচণ্ড কোনও শক্তি ওই সব পাথরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। আমি একীকরণ এবং check-out facility ওখানেই স্থাপন করব সিদ্ধান্ত করলাম। পরবর্তী তিন বছরে সেটাই হল আমার জীবনের লক্ষ্য, আমার ধ্যান-জ্ঞান।

আমরা একটি আদর্শ উচ্চ-প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রচনা করলাম। তাতে থাকবে অতিশয় উচ্চ-পর্যায়ে প্রযুক্তিগত বিবিধ সুযোগ-সুবিধা, যথা একটি inertial instrumentation laboratory, পরিবেশগত ও বৈদ্যুতিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার (EMI/EMC) জন্যে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা ব্যবস্থা, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র, হাই-এনথালপি ফেসিলিটি এবং একটি সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজনা ও চেক-আউট কেন্দ্র। যেভাবেই দেখুন না কেন, সে ছিল একটা বিরাট কাজ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রয়োজন হল এক অন্য ধরনের পারদর্শিতা, মানসিক দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আগেই নির্ধারিত হয়েছিল। এখন দরকার সে-সব বুঝে নেওয়ার এবং অনেক এজেন্সির সঙ্গে সে-সব ভাগ করে নেওয়ার। তার জন্যে সমস্যা সমাধান এবং যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা ও তা চালিয়ে যাওয়ার কাজ টিমের নেতাকে করতে হবে। এ কাজ করবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিটি কে? আমি দেখলাম, এর প্রায় সমস্ত গুণই বর্তমান এম. ভি. সূর্যকান্ত রাও-এর মধ্যে। তারপর, যেহেতু RCI-এর সৃষ্টিতে অনেক প্রতিষ্ঠানকে জড়িত করতে হবে, তাই এমন একজনের দরকার হবে যিনি তাদের মধ্যে কে কার ওপরে থাকবেন তা নিয়ে সকলের সূক্ষ্ম ঔচিত্যবোধ রক্ষা করে চলতে পারবেন। আমি সেই সময়ে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের সূর্যকান্ত রাওয়ের কাজে পূর্ণতা দানের জন্যে নির্বাচিত করলাম বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের যুবা কৃষ্ণমোহনকে। আনুগত্যের ওপরে বিশ্বাসের চেয়ে বরং কৃষ্ণমোহন জোর দেবেন কাজের প্রতি একাগ্রতার ওপর এবং কর্মস্থলে কর্মীদেরকে সঠিকপথে চালিত করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী RCI-এর পুনর্গঠনের জন্যে আমরা Military Engineering Service (MES)-এর দ্বারস্থ হলাম। তারা হিসাব করল যে, সে কাজ সম্পূর্ণ করতে তাঁদের প্রায় পাঁচ বছর লাগবে। ব্যাপারটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উচ্চতম মহলে খতিয়ে দেখা হল এবং একটি দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হল: প্রতিরক্ষার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হবে বাইরের নির্মাণ কোম্পানিকে। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কোথায় স্থাপিত হবে, সেটা স্থির করার এবং সেখানে পৌঁছোবার জন্যে রাস্তা কী হবে তার পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্যে ইমরত কাঞ্চার ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র পরীক্ষা করার এবং আকাশ থেকে ফটো নেওয়ার জন্যে ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগ (Survey of India), ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং এজেন্সি-র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হল। সেইসব পাথরের মধ্যে জলের উৎস সন্ধানের জন্যে কেন্দ্রীয় ভূজল পর্ষদ (Central Ground Water Board) কুড়িটি স্থান আবিষ্কার করল। চল্লিশ MVA বিদ্যুৎশক্তি এবং ৫০ লক্ষ লিটার জল যাতে পাওয়া যায় সে-জন্যে পরিকাঠামোর পরিকল্পনা করা হল।

এই সময়েই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন কর্নেল এস. কে. সালওয়ান। তিনি ছিলেন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, অফুরন্ত ছিল তাঁর কর্মশক্তি। নির্মাণের শেষ পর্যায়ে তিনি সেই প্রস্তরাকীর্ণ ভূমিতে একটি প্রাচীন দেবস্থান খুঁজে পেলেন। আমি ভাবলাম, জায়গাটির কি এখনও কোনও মাহাত্ম্য আছে? যাই হোক, এখন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার এবং ক্ষেপণাস্ত্রের একাঙ্গীকরণ ও চেক আউট নিয়ে উন্নয়নের খতিয়ান যখন ঘোষিত হয়ে গেছে, এবং নকশা নিয়ে কাজ যখন আরম্ভ হয়েছে, সুতরাং এর পরের যথার্থ কাজটি হল, সেগুলির উড়ান-পরীক্ষার জন্যে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা। অন্ধ্রপ্রদেশে তখন SHAR ছিল, কাজেই এবারে জায়গার খোঁজ চলল ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে এবং খোঁজা শেষ হল ওড়িশার বালেশ্বরে। উত্তর-পূর্ব উপকূলে National Test Range-এর জন্যে একটি স্থান নির্বাচিত হল। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র প্রকল্পটি একটা ঝঞ্ঝা-বাত্যার মুখে পড়ে গেল, কেন না সে অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থানান্তরণকে একটা রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় করে তোলা হল। আমরা তাই ঠিক করলাম, ওড়িশার বালেশ্বর জেলার চাঁদিপুরে Proof Experimental Establishment (PXE)-র পাশে একটি অস্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে। Interim Test Range (ITR) অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের জন্যে ৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ড. এইচ. এস. রামারাও ও তাঁর টিম অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ট্র্যাকিং ইনস্ট্রুমেন্ট, একটি ট্র্যাকিং টেলিস্কোপ ব্যবস্থা এবং একটি ইনস্ট্রুমেন্টেশান ট্র্যাকিং রাডার বসানোর জন্যে স্বল্প খরচে কাজ করার উপায় খুঁজে বার করলেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর. এস. দেশওয়াল ও মেজর জেনারেল কে. এন. সিং উৎক্ষেপণ মঞ্চ ও পাল্লা-র পরিকাঠামো (range infrastructure) নির্মাণের দায়িত্ব নিলেন। চাঁদিপুরে একটি সুন্দর পক্ষীরালয় ছিল, আমি ইঞ্জিনিয়ারদের বললাম, টেস্ট রেঞ্জ নির্মাণের সময়ে তাঁরা যেন তার কোনও ক্ষতি না করেন।

আমার সবচেয়ে সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা সম্ভবত RCI-এর সৃষ্টি। ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা, সাধারণ মাটি থেকে কুম্ভকারের একটি সুন্দর বস্তু গড়ে তোলার মতো আনন্দদায়ক হয়েছিল আমার কাছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর. বেঙ্কটরমন ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে DRDL-এ এলেন, উদ্দেশ্য IGMDP-র কাজকর্ম কেমন চলছে সে বিষয়ে নিজেকে অবহিত করা। তিনি আমাদের যা কিছু সম্পদ প্রয়োজন তার তালিকা করতে পরামর্শ দিলেন। বললেন, কিছুই যেন বাদ না পড়ে। আরও বললেন, আমাদের কল্পনা এবং বিশ্বাসকেও যেন আমরা সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করি। বললেন, "আপনারা যা কল্পনা করবেন, তাই সত্য হবে, আপনারা যাতে বিশ্বাস করেন, তাই আপনাদের দ্বারা সম্ভব হবে।" ড. অরুণাচলম এবং আমি, আমরা দুজনেই দেখলাম IGMDP-র সামনে অনন্ত সম্ভাবনা দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। আমাদের উৎসাহ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ল। আমরা উদ্দীপিত হয়ে উঠলাম, উৎসাহিত হলাম, যখন দেখলাম, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি IGMDP-র দিকে আকৃষ্ট হলেন। কে না চায় একজন জয়ীর সঙ্গে হাত মেলাতে? চারিদিকে রটে গেছে, IGMDP-র জন্মই হয়েছে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

আমরা একটি মিটিংয়ে ১৯৮৪ সালের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করছিলাম। এমন সময়ে খবর এল ৩ জানুয়ারির সন্ধ্যায় মুম্বাইতে ড. ব্রহ্মপ্রকাশের মৃত্যু হয়েছে। আমার কাছে সে ছিল এক প্রচণ্ড মানসিক আঘাত, কেন না আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, তাঁর মানবিকতা এবং তাঁর নম্রতা ছিল অনুকরণীয়। SLV-E1 উড়ানটির বিফল হওয়ার দিনে তাঁর কোমল সান্ত্বনার কথা আমার মনে উঁকি দিয়ে দুঃখের মাত্রাকে আরও ভারী করে তুলল।

অধ্যাপক সারাভাই যদি হয়ে থাকেন VSSC-র সৃষ্টিকর্তা, তা হলে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ হলেন তার সম্পাদনকারী। প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে তিনি তার লালন পালন করেছিলেন। নেতৃত্ব প্রদানের বিদ্যা আমাকে তিনিই শিখিয়েছিলেন, বস্তুত, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গিয়েছিল। তাঁর নম্রতা আমার চরিত্রের উগ্রতা দূর করেছিল। তাঁর বিনয়-নম্রতা শুধু তাঁর নিজের বিবিধ গুণ বিবিধ ক্ষমতাই আড়াল করে রাখত না, তার এই একটা দিকও ছিল যে, যাঁরা তাঁর অধীনে কাজ করতেন তাঁদের সকলের আত্মমর্যাদাকেও তিনি মর্যাদা দিতেন এবং তিনি এও জানতেন যে ভুলভ্রান্তি সকলেরই হতে পারে, এমন কী নেতারও। বিরাট ছিল ড. ব্রহ্মপ্রকাশের মেধাশক্তি, যদিও দৈহিক শক্তিতে তিনি দুর্বল ছিলেন। তাঁর সারল্য ছিল শিশুর মতো। বিজ্ঞানীদের মধ্যে আমি তাঁকে এক সাধুপুরুষ হিসাবে দেখতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময়টাতে, যখন DRDL-এর পুনরুজ্জীবন ঘটছিল পি. ব্যানার্জি, কে. ভি. রামান্না সাই এবং তাঁদের টিম দ্বারা উদ্ভাবিত একটি attitude control system এবং on board computer-কে ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এই প্রচেষ্টার সাফল্য দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ কর্মসূচির জন্যে মারাত্মক রকম জরুরি ছিল। সেই সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমটি পরীক্ষার জন্যে আমাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র থাকা দরকার ছিল।

সবাই মিলে একসঙ্গে বসে মাথা খাটানোর পর আমরা ঠিক করলাম সিস্টেমটি পরীক্ষা করবার জন্যে একটি "ডেভিল" ক্ষেপণাস্ত্রকে নিজেদের মতো করে তৈরি করতে হবে। একটি "ডেভিল" ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে তাকে খণ্ড-খণ্ড করা হল, তার অনেক অদল বদল করা হল, সাব-সিস্টেম নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল এবং ক্ষেপণাস্ত্র চেক-আউট সিস্টেমকে সংশোধিত ও বিস্তৃত করে বিন্যাস করা হল। একটি অস্থায়ী উৎক্ষেপক স্থাপন করে ২৬ জুন ১৯৮৪ সংশোধিত ও বিস্তৃত "ডেভিল" ক্ষেপণাস্ত্রটিতে বিস্ফোরণ ঘটানো হল। প্রথম দেশীয় Strap-down Inertial Guidance System-এর উড়ান পরীক্ষার জন্যে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সবই সিস্টেমটি সমাধা করল। ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশের ইতিহাসে সেই ছিল প্রথম এবং অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। DRDL-এর বিজ্ঞানীরা যে সুযোগ দীর্ঘকাল পাননি, সেই সুযোগের অবশেষে সদ্ব্যবহার করা হল। একটি বার্তা সকলেই পরিষ্কার শুনতে পেলেন, "আমরা পারি!"

একটি বার্তা দিল্লিতেও পৌঁছতে দেরি হল না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজে যাচাই করতে চাইলেন, IGMDP-তে অগ্রগতি কেমন হয়েছে। উৎসাহ-উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে আমরা সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে কাজ করতে চাইলাম। ১৯ জুলাই ১৯৮৪ শ্রীমতী গান্ধী DRDL পরিদর্শনে এলেন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছিল অসাধারণ গর্ববোধ। নিজের সম্পর্কে, নিজের কাজ নিয়ে এবং নিজের দেশকে নিয়ে। DRDL-এ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো আমার কাছে অতিশয় সম্মানের ছিল, কেন না, যে আমি নিজেকে কোনও দিনই বড় ভাবিনি, আমার মনেও তিনি তাঁর গর্ববোধের খানিকটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন যে, ৮০ কোটির মানুষের তিনি নেত্রী। তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি তাঁর হাতের প্রত্যেকটি ভঙ্গি তিনি এমনভাবে করতেন যা দেখতে সর্বোত্তম। দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের কাজের তিনি এমন গুণগ্রাহী ছিলেন যে তার ফলে আমাদের মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

যে এক ঘণ্টা তিনি DRDL-এ কাটালেন, তার মধ্যে তিনি উড়ান ব্যবস্থার পরিকল্পনা (flight system plan) থেকে আরম্ভ করে বিবিধ বিকাশ গবেষণাগার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(multiple development laboratory) পর্যন্ত IGMDP-র বহু দিক দেখলেন। সব শেষে, ২০০০ কর্মীবিশিষ্ট DRDL-এর উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পৃথ্বী"-র উড়ান পরীক্ষা আপনারা কবে করবেন?" আমি বললাম, "জুন ১৯৮৭"। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "উড়ান কর্মসূচি ত্বরান্বিত করতে কী কী লাগবে আমাকে জানাবেন।" বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তিনি দ্রুত ফল পেতে চাইলেন। তিনি বললেন, "আপনাদের কাজের দ্রুতগতি সমগ্র জাতির আশার কারণ।" এছাড়াও তিনি আমাকে বললেন, শুধু কর্মসূচি অনুসরণ করাই নয়, IGMDP-র কাজ হবে উৎকর্ষের সাধনা। "আপনারা যতই ভাল কাজ করুন না কেন, সম্পূর্ণ সন্তোষ যেন কখনওই আপনাদের না আসে, সব সময়ে আপনাদের চেষ্টা করা উচিত, আরও ভালভাবে কী করে কাজ করতে পারেন।" এক মাসের মধ্যেই আমরা তাঁর আগ্রহ এবং সমর্থনের পরিচয় পেলাম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে সদ্য ক্ষমতা পাওয়া, এস. বি. চ্যবনকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প পর্যালোচনা করবার জন্যে। শ্রীমতী গান্ধীর পরবর্তী পর্যালোচনা আমাদের শুধু উৎসাহিত করল তাই নয়, তাতে যথেষ্ট ফলও লাভ হল। আজ মহাকাশ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, IGMDP-র সমার্থক শব্দ উৎকর্ষ।

আমাদের নিজেদের দেশে উদ্ভাবিত কিন্তু কার্যকর, বিবিধ ব্যবস্থাপনা-কৌশল ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল, প্রকল্পের যে কাজ-কর্ম তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ-সংক্রান্ত। এর মধ্যে মূলত থাকত সম্ভাব্য সমাধানের কার্যোপযোগিতা কতদূর, তার প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের সহযোগিতায় তার পরীক্ষা, সহযোগীদের সঙ্গে একত্রে তার আলোচনা এবং সকলের সমর্থন লাভের পর তাকে কাজে লাগানো। বিভিন্ন অংশগ্রহণকারী কর্মকেন্দ্রের তৃণমূল স্তর থেকে অনেক নতুন নতুন 'আইডিয়া' পাওয়া গিয়েছিল। সেই সফল কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা-কৌশলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কোনটি ছিল, যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি বলব, প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পর সক্রিয়ভাবে তার যে অনুসারী ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল, তার কথা। এই অনুসারী ক্রিয়া-কলাপের জন্যে, বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে নকশা তৈরি, পরিকল্পনা রচনা, পরিদর্শক সংস্থা সমূহের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কাজ করা হয়েছিল, তার জন্যে অত্যন্ত সুসমন্বিতভাবে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কার্যালয়ে কাজের বিধি ছিল এইরকম: কোনও কর্মকেন্দ্রে যদি চিঠি লিখতে হয়, ফ্যাক্স করো; টেলেক্স কিংবা ফ্যাক্স যদি পাঠাতে হয়, টেলিফোন করো; এবং যদি টেলিফোন করবার দরকার হয়, সেক্ষেত্রে নিজেই সেখানে যাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধরনের মানসিকতা কী করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন ড. অরুণাচলম ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪-তে IGMDP-র একটি সর্বাঙ্গীন অবস্থা পর্যালোচনার (comprehensive status review) ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন সংস্থা, যথা DRDO গবেষণাগার সমূহ, ISRO, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং উৎপাদন কেন্দ্র সমূহ থেকে বিশেষজ্ঞরা এসে একত্র হলেন প্রথম বছরে কী অগ্রগতি হয়েছে, এবং কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবার জন্যে। এই পর্যালোচনার সময়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। যথা ইমরত কাঞ্চা-তে সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন এবং একটি পরীক্ষার সুবিধা স্থাপন। ইমরত কাঞ্চার ভবিষ্যৎ পরিকাঠামোর নাম দেওয়া হল Research Centre Imarat (RCI)।

পর্যালোচনা পর্ষদে একজন চেনা লোক টি. এন. শেষনকে দেখতে পেয়ে আমার আনন্দ হল। SLV-3 থেকে আজ, এই সময়ের মধ্যে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা পারস্পরিক সৌহাদ্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখন প্রতিরক্ষা সচিব হিসাবে টি. এন. শেষন আমাদের কর্মসূচি এবং উপস্থাপিত আর্থিক প্রস্তাব সমূহ কতদূর বাস্তবসম্মত; ইত্যাদি যে-সব প্রশ্নগুলি করলেন সে-সব প্রশ্ন ছিল অনেক বেশি চাঁছা-ছোলা। শেষন এমন একজন মানুষ, যিনি প্রতিপক্ষকে কাবু করবার জন্যে বাক্যকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর সুতীক্ষ্ণ কৌতুক প্রতিপক্ষকে হাস্যাস্পদ করে তোলে। যদিও উচ্চকণ্ঠে কথা বলা তাঁর অভ্যাস এবং কখনও কখনও তর্ক তোলেন, শেষ পর্যন্ত একটা সমাধানে পৌঁছোনোর জন্যে যাবতীয় সম্পদের যাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় তাও তিনি সুনিশ্চিত করেন। ব্যক্তিগত স্তরে তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়, সুবিবেচক। IGMDP-তে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল সে বিষয়ে তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সহকর্মীদের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। কার্বন-কার্বন-মিশ্রণগুলি সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস্য ঔৎসুক্যের কথা আমার আজও মনে পড়ে। এবারে আপনাদের একটি ছোট্ট গোপন কথা জানাই: পৃথিবীতে শেষনই সম্ভবত একটি মাত্র মানুষ, যিনি ৩১টি বর্ণ এবং ৫টি শব্দ সমন্বিত আমার পুরো নাম ধরে আমাকে ডেকে থাকেন, আবুল পাকির জয়নুলআবেদিন আব্দুল কালাম (Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam).

বারোটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং DRDO, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (CSIR), ISRO এবং শিল্পসংস্থার ৩০টি ল্যাবরেটরিতে যুগপৎ ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের কাজ হয়েছে; নকশা প্রস্তুত, বিকাশ এবং উৎপাদনের কাজে তারা ছিল অংশীদার। বস্তুত ৫০ জন অধ্যাপক এবং ১০০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ

গবেষক নিজের নিজের প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষাগারে ক্ষেপণাস্ত্র-সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ নিয়ে কাজ করেছেন। সেই এক বছর যৌথভাবে যে কাজ হল তার গুণমান দেখে আমার স্থির প্রত্যয় জন্মাল যে, আমাদের কর্মসূচির লক্ষ্য যদি আমরা ঠিক করতে পারি, দেশের মধ্যেই যে কোনও বিকাশ কর্মধারা আমরা হাতে নিতে পারব। এই পর্যালোচনার চার মাস আগে, মনে হয় ১৯৮৪-র এপ্রিল-জুন মাসে ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের আমরা ছ'জন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে গিয়ে যে সব তরুণ স্নাতকদের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছি তাঁদেরই আমাদের কাজে যুক্ত করে নিয়েছি। অধ্যাপক এবং ৩৫০ জনের মতো উচ্চাভিলাষী ছাত্রদের কাছে আমরা ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের একটা রূপরেখা উপস্থিত করেছি, এবং তাঁদের অনুরোধ করেছি সে কাজে যোগ দিতে। পর্যালোচকদের আমি জানালাম, শ'তিনেক তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ল্যাবরেটরিগুলিতে যোগ দেবেন বলে আমরা আশা করি।

ন্যাশনাল এরোনটিক্যাল ল্যাবরেটরির ডিরেকটর তখন ছিলেন রোড্ডাম নরসিংহ। সেই পর্যালোচনার সুযোগে তিনি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন। তিনি "সবুজ বিপ্লব"-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, এতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বড় বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার মতো প্রতিভা দেশে যথেষ্ট আছে।

যখন ভারত শান্তিপূর্ণ লক্ষ্যে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল, আমরা ঘোষণা করেছিলাম, পৃথিবীতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ যারা ঘটিয়েছে আমরা তাদের মধ্যে ষষ্ঠ দেশ। যখন আমরা SLV-3 উৎক্ষেপণ করলাম আমরা হলাম উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ করার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চম দেশ, কোনও প্রযুক্তিতে কীর্তি স্থাপনকারী প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দেশ আমরা কবে হব?

পর্যালোচনা পর্ষদের সদস্যেরা তাঁদের মতামত এবং সন্দেহ ইত্যাদি যখন ব্যক্ত করলেন, আমি মন দিয়ে শুনলাম এবং তাঁদের সম্মিলিত প্রজ্ঞা থেকে আমার প্রচুর লাভ হল। আমার পক্ষে সে ছিল প্রকৃতই একটি শিক্ষা, আমরা যতদিন ইস্কুলে পড়ি, পড়তে শিখি, লিখতে শিখি, বলতে শিখি, কিন্তু শুনতে কখনও শিখি না এবং সারাজীবনই সেই অবস্থা আমাদের থেকে যায়। এই ধারাটাই পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। তারা বলতে পারেন খুব ভাল কিন্তু শ্রবণের বিদ্যা তাঁদের তেমন আয়ত্ত হয় না। আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম, মনোযোগী শ্রোতা হব। কার্যোপযোগিতার ভিত্তির ওপর কী প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নির্মিত হয় না? কারিগরি জ্ঞান কি তার নিজের এক একটি ইটের ভেতর থেকে আসে না? আর, গঠনমূলক সমালোচনার মশলা কি ইটের সঙ্গে মেশানো হয় না? ভিত্তি স্থাপিত হয়ে

গেছে, পোড়ানো হয়ে গেছে ইট, এবং এইবার আমাদের কাজকে একত্র করে গাঁথার সব মশলা মেশানো শুরু হল।

আগের মাসের পর্যালোচনা থেকে যে কর্মপরিকল্পনা বেরিয়ে এসেছিল আমরা তাই নিয়ে কাজ করছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ শ্রীমতী গান্ধীর নিহত হওয়ার সংবাদ এল। তার পরেই খবর এল ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার। হায়দ্রাবাদ শহরে সান্ধ্য-আইন জারি হল। PERT-এর সব নকশা গুটিয়ে ফেলে আমরা টেবিলের ওপর শহরের মানচিত্র পেতে নিয়ে বসলাম। সব কর্মীদের জন্যে যান-বাহনের ব্যবস্থা করতে হবে, নিরাপদে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ল্যাবরেটরি দেখে মনে হল জনশূন্য। আমি আমার অফিসে একা বসেছিলাম। যেভাবে, যে পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যু হল সেটা অতিশয় অমঙ্গলজনক। সবে তিন মাস হয়েছে, তিনি এসেছিলেন। সেই স্মৃতি আমার বেদনাকে আরও নিবিড় করে তুলল। বড় বড় মানুষের জীবনের অবসান এমন ভয়ংকরভাবে কেন হবে? এই রকমই কোনও প্রসঙ্গে আমার বাবার একটি কথা আমার মনে পড়ল, "ভাল লোক মন্দ লোক পাশাপাশি থাকে কাপড়ে যেমন সাদা সুতো কালো সুতো বোনা হয়। তার সাদা কিংবা কালো সুতো যদি ছিঁড়ে যায়, তাঁতি সমস্ত কাপড়টিই ভাল করে দেখে, আর তাঁতটাও দেখে।" ল্যাবরেটরি থেকে আমি যখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলাম, রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না। আমার মনে পড়তে লাগল সেই ছেঁড়া সুতোর, তাঁতের কথা।

www.amarboi.com

বিজ্ঞানীমহলের কাছে শ্রীমতী গান্ধীর মৃত্যু এক প্রচণ্ড ক্ষতি। দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু ভারত সহজে ভেঙে পড়বার, হাল ছেড়ে দেওয়ার দেশ নয়। ধীরে ধীরে শ্রীমতী গান্ধীর হত্যার আঘাত সে সইয়ে নিল, যদিও তার ফলে হাজার হাজার প্রাণ গেল। ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হল। তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধী ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি নির্বাচনে গেলেন, শ্রীমতী গান্ধীর নীতিসমূহ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জনাদেশ প্রাপ্ত হলেন। দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশ কর্মসূচিও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৮৫-র গ্রীষ্মকালের মধ্যে ইমরতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী Research Centre Imarat (RCI)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ৩ অগাস্ট ১৯৮৫। অগ্রগতি দেখে উনি খুব খুশি হয়েছেন মনে হল। তাঁর মধ্যে একটা শিশু-সুলভ অনুসন্ধিৎসা ছিল যেটা দেখে খুব ভাল লাগে। এক বছর আগে তাঁর মা যখন এসেছিলেন তাঁর মধ্যে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, যে সংকল্পের দৃঢ়তা দেখেছিলাম, তাও রাজীবের ছিল, যদিও কিছু পার্থক্য

ছিল। শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ছিল এমন যে, মনে হত কাজে কোনও শৈথিল্য বরদাস্ত করবেন না, অপরপক্ষে রাজীব গান্ধীর ছিল জনমোহিনী শক্তি, ক্যারিশমা। তারই প্রভাবে সকলকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। DRDL পরিবারকে বললেন, তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দুঃখ-কষ্টের কথা জানেন, এবং যাঁরা বিদেশে আরামের জীবনের সন্ধানে না গিয়ে মাতৃভূমিতেই কাজ করবার জন্যে থেকে গেছেন তাঁদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি থেকে মুক্তি না পেলে এই ধরনের কাজে মনোসংযোগ করতে কেউ পারে না এবং আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, বিজ্ঞানীর জীবন অধিকতর আরামদায়ক করবার জন্যে যা কিছু করা সম্ভব উনি করবেন।

তাঁর আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আমি মার্কিন বিমানবাহিনীর আমন্ত্রণে ড. অরুণাচলমের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গী হলেন ন্যাশনাল এরোনটিক্যাল ল্যাবরেটরির রোড্ডাম নরসিংহ এবং HAL-এর কে. কে. গণপতি। ওয়াশিংটনে পেন্টাগনে আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা নরথ্রোপ কর্পোরেশন দেখতে লস এঞ্জেলেস যাওয়ার পথে স্যান ফ্রানসিসকোতে গিয়ে নামলাম। আমি সেই সুযোগে আমার প্রিয় লেখক রবার্ট শুলার-এর নির্মিত ক্রিস্টাল ক্যাথিড্রালটিও দেখে নিলাম। সম্পূর্ণ কাচে তৈরি এই ৪০০ ফুট আয়তন বিশিষ্ট তারকার আকৃতি গির্জাটির সৌন্দর্য আমাকে আশ্চর্যান্বিত করল। এর কাচের ছাদটি, ফুটবল মাঠের চেয়ে যেটি ১০০ ফুট বেশি দীর্ঘ, মনে হয় যেন হাওয়ায় ভাসমান। বহু লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই গির্জাটির জন্যে অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শুলার। তিনি লিখেছেন, "ঈশ্বর অনেক বড় বড় কাজ করতে পারেন তাঁদের হাত দিয়ে, যারা সে কাজের কৃতিত্ব কে পেল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ঈশ্বর সাফল্য দিয়ে তোমায় যে পুরস্কৃত করবেন, তার আগে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, অত বড় পুরস্কার ঠিকভাবে গ্রহণ করবার মতো নম্রতা তোমার আছে।" শুলার-এর গির্জায় আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, ইমরত কাঞ্চাতে একটি গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করতে যেন তিনি আমায় সাহায্য করেন। সেইটাই হবে আমার ক্রিস্টাল ক্যাথিড্রাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

তরুণ ইঞ্জিনিয়াররা, সংখ্যায় ২৮০ জন, DRDL-এর গতি-প্রকৃতি বদলে দিলেন। আমাদের সকলের কাছেই সে এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। এইসব অল্প বয়স্কদের দলের সাহায্যে, একটি re-entry প্রযুক্তি ও কাঠামো, একটি মিলিমেট্রিক ওয়েভ রাডার, একটি phased array radar, কয়েকটি রকেট ব্যবস্থা এবং ওইরকম সব যন্ত্রপাতি নিজেরাই তৈরি করতে আমরা সক্ষম হলাম। এইসব কাজ প্রথম যখন আমরা ওই তরুণ বিজ্ঞানীদের দিয়েছিলাম, তাঁরা তাঁদের কাজের গুরুত্ব পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। যখন বুঝলেন, অত বড় বিরাট আস্থা তাঁদের ওপর স্থাপিত হওয়ায় তাঁরা অস্বস্তি বোধ করলেন। এখনও আমার মনে পড়ে, একজন তরুণ আমাকে বলেছিলেন, "আমাদের টিমে তো তেমন বড় মাপের মানুষ (big shot) কেউ নেই, এ কাজ আমরা কী করে করব?" আমি তাঁকে বললাম, বড় মাপের মানুষ হচ্ছেন একজন ক্ষুদ্রকায় মানুষ যিনি শুধু কথা বলেই যান। অতএব চেষ্টা করে যাও।" দেখে অবাক লাগত, কী করে সেই তরুণ বিজ্ঞানীদের পরিমণ্ডলে "হবে না", "পারব না" জাতীয় মনোভাব "হবে" "পারব"-তে পরিবর্তিত হয়ে যেত। যা আগে মনে হত অসাধ্য, তাই হতে থাকল। আমাদের তরুণদের দলে ঢুকে অনেক অধিক-বয়স্ক বিজ্ঞানীও তাঁদের তারুণ্য ফিরে পেলেন।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, কাজের প্রকৃত স্বাদ, আসল মজা পাওয়া যায় কাজ করে যাওয়ার মধ্যে, কাজ শেষ করে চুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে নয়। যাই হোক সাফল্য অর্জন করার জন্যে মৌলিক চারটি প্রয়োজনের কথায় আবার ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসি: লক্ষ্য স্থির করা, সদর্থক চিন্তা, ভবিষ্যৎ কল্পনা এবং বিশ্বাস।

এতদিনে আমরা বিস্তারিতভাবে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছি। তরুণ বিজ্ঞানীদের মনে সে সব লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছি। পর্যালোচনা বৈঠকে আমি তরুণতম বিজ্ঞানীদের দিয়েই তাঁদের টিমের কাজের বিবরণ পেশ করাতাম। তাতে মনশ্চক্ষে সমস্ত সিস্টেম দেখতে তাঁদের সুবিধে হত। ধীরে ধীরে একটা আস্থার আবহাওয়া সৃষ্টি হল। প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ভাল প্রশ্ন তরুণ বিজ্ঞানীরা তাঁদের বরিষ্ঠ সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন। তাঁরা কিছুকেই ভয় পেতেন না, তাই কখনওই পিছিয়েও যেতেন না। তাঁদের মনে যদি সন্দেহ জাগত, তাঁরা সে সন্দেহ অতিক্রম করতে পারতেন। সুতরাং অবিলম্বে তাঁরা শক্তিমান হয়ে উঠলেন। যার মনে বিশ্বাস আছে সে কখনও কারও কাছে নতজানু হয় না, কখনও নাকে কাঁদে না, বলে না, "অত পারব না"; বলে না, কেউ তার সহায় হচ্ছে না, তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। তার বদলে এমন লোক সমস্যার মুখোমুখি হলে, যা করবার সরাসরি করে, তারপর বলে "আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমার যাই ঘটুক না কেন, আমি সেই ঘটনার চেয়ে বড়।" বয়স্ক বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা আর তাঁদের তরুণতর সহকর্মীদের কর্মকুশলতার মিশ্রণ ঘটিয়ে আমি কাজের আবহাওয়াটিকে সজীব করে রাখতাম। বয়স্ক এবং তরুণদের এই পারস্পরিক নির্ভরতা DRDL-এ একটি উৎপাদনশীল এবং সদর্থক কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল।

AMARBOI.COM

ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের প্রথম উৎক্ষেপণটি হল ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, যখন শ্রীহরিকোটার পরীক্ষাস্থল থেকে "ত্রিশূল" ভূমিত্যাগ করল। সেই উড়ানের উদ্দেশ্য ছিল solid propellant rocket motor-এর উড়ানকালীন কাজ-কর্ম পরীক্ষা করা। ভূমি থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর নজর রাখবার জন্যে দুটি C-Band রাডার এবং Kalidieo-theodolite (KTLs) ব্যবহার করা হয়েছিল। পরীক্ষা সফল হল। উৎক্ষেপক, রকেট মোটর এবং টেলিমেট্রি ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করল। তবে, বায়ু-সুড়ঙ্গে পরীক্ষার (wind tunnel testing) ভিত্তিতে যা হিসাব করা গিয়েছিল ঊর্ধ্বগতির টান (aerodynamic drag) সে তুলনায় একটু বেশির দিকেই হল। প্রযুক্তিতে নতুন কিছু করা কিংবা অভিজ্ঞতায় নতুন কোনও মূল্যবান সংযোজনের দিক থেকে দেখলে এই পরীক্ষায় বিশেষ কিছু লাভ হল না, কিন্তু পরীক্ষাটির প্রকৃত অবদান এই হল যে, এর ফলে DRDL-এতে আমার তরুণ বন্ধুরা আবার জানালেন, অন্যদের পথ অনুসরণ না করে কিংবা বিপরীত প্রযুক্তিগত কৌশল (reverse engeneering) না করেও তাঁরা ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ পথে প্রেরণ করতে পারেন। এর ফলে, এক ঝটকায় DRDL-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানীদের চিত্তের নতুন বহুমাত্রিক বিস্তার ঘটল।

তারপর এল চালকবিহীন লক্ষ্যভেদকারী আকাশ যান (Pilotless Target Aircraft) (PTA)-র সফল পরীক্ষা-উড়ান। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারেরা PTA-র রকেট মোটর নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর নকশা প্রস্তুত করেছিল বাঙ্গালোরের Aeronautical Development Establishment (ADE)-এ-তে। DTD&P (Air) এর মোটরের নমুনা ছাড়পত্র দিয়েছিল। ক্ষেপণাস্ত্রের জন্যে ভারী-যন্ত্র (হার্ডওয়্যার) নির্মাণে সেটি একটি ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান পদক্ষেপ। সেটি শুধু যে কার্যকর তাই নয়, বিভিন্ন ব্যবহারকারী সংস্থা তাকে গ্রহণও করেছেন। একটি নির্ভরযোগ্য, আকাশ-উপযোগী, উচ্চ ঘাতের-চাপ গ্রহণযোগ্য ratio রকেট মোটর উৎপাদন করার জন্যে একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সামিল করা হল। তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হল DRDL-এর প্রযুক্তিগত উপকরণ সরবরাহ করে। আমরা ধীরে ধীরে একক গবেষণাগার প্রকল্প থেকে বহু গবেষণাগার কার্যক্রম, আর তার থেকে গবেষণাগার-শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নীত হতে থাকলাম। PTA নির্মাণ সম্ভব করে তোলাতে, তা চারটি বিভিন্ন সংস্থার একটি সম্মিলন ক্ষেত্রের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হল যেন আমি একটি মিলন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি, এবং ADE, DTD&P (Air) এবং ISRO থেকে তিনটি পথ এসে সেখানে মিশেছে। চতুর্থ পথটি DRDL। ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে জাতীয় স্বনির্ভরতায় পৌঁছবার লক্ষ্যে সেটি একটি রাজপথ বিশেষ।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্বে আরেক পা এগিয়ে গেল। ইন্ডিয়ান ইন্‌সটিটিউট অফ সায়েন্স এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্তভাবে Advanced Technology Programme আরম্ভ হল। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আমার বরাবরই ছিল, শিক্ষাজগতের শ্রেষ্ঠ মানুষদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুরোধ আগেই পাঠানো হয়েছিল এবং ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে ওইসব প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছ থেকে DRDL বিশেষ সাহায্য পেতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে যে অবদান এসেছিল তার কথা এবার বলি। "পৃথ্বী"র নকশা করা হয়েছিল inertially guided missile হিসাবে। সঠিকভাবে তার লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার জন্যে তার মস্তিকে অর্থাৎ তার মধ্যে অবস্থিত একটি কম্পিউটারে তার যাত্রাপথের parameters দিয়ে দিতে হয়। অধ্যাপক ঘোষালের নেতৃত্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক স্তরে একটি টিম, সে রকম একটি সহায়ক অ্যালগরিদম্ (robust guidance algorithm) প্রস্তুত করলেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা অধ্যাপক আই. জি.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্মার নেতৃত্বে "আকাশ"-এর জন্যে আকাশ প্রতিরক্ষা সফটওয়্যার প্রস্তুত করলেন, যার সাহায্যে একাধিক লক্ষ্যবস্তুকে একযোগে আঘাত করা যাবে। "অগ্নি-র জন্য re-entry vehicle system design করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল মাদ্রাজের IIT-তে একটি তরুণ গোষ্ঠী এবং DRDO-র বিজ্ঞানীদের দ্বারা। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Navigational Electronics Research and Traning Unit একটি অত্যাধুনিক সংকেত নির্ধারক অ্যালগরিদম (Signal procersing algorithm) প্রস্তুত করল "নাগ"-এর জন্যে। সহযোগিতার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। বস্তুত দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ব্যতিরেকে আমাদের প্রযুক্তিগত লক্ষ্য অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হত।

"অগ্নি"-র পেলোড সংক্রান্ত যে সাফল্যটি আমরা লাভ করেছিলাম তার কথাই ধরা যাক। "অগ্নি" একটি দুপর্যায়ের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং তাতে যে পুনঃপ্রবেশ প্রযুক্তি (re-entry technology) ব্যবহৃত হয় সেটি ভারতে সেই সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হল। এটিকে গতি-প্রদান করে SLV-3 থেকে উদ্ভূত একটি প্রথম পর্যায়ের solid rocket motor, এবং তার গতিবৃদ্ধি করা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে "পৃথ্বী"-র liquid rocket engine-এর সাহায্যে। "অগ্নি"র পেলোড লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছয় শব্দের গতির চেয়ে অধিক গতিতে। তার জন্য প্রয়োজন হয় একটি re-entry vehicle structure, সহায়ক বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাসহ এই পেলোড গ্রথিত থাকে re-entry vehicle structure-এ, যার মূল কারণ ভেতরকার ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পেলোড-এর কোনও ক্ষতি না-হয়, যখন বাইরের আবরণের তাপমাত্রা ২৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকে। একটি বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা সহ inertial guidance system নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছবার ক্ষেত্রে পেলোডটিকে সাহায্য করে। যে কোনও পুনঃপ্রবেশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার কার্বন-কার্বন নাসিকাগ্র, যা অত্যন্ত উচ্চতাপেও যথেষ্ট মজবুত থাকে, সেটি নির্মাণের জন্যে ত্রিমাত্রিক কর্মক্ষমতা একটি আদি উপাদান। DRDO এবং CSIR-এর চারটি ল্যাবরেটরি সে কাজ সম্পন্ন করল ১৮ মাসের মধ্যে, যা অন্য দেশের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অনেক দশকের গবেষণা ও বিকাশের পর।

আরেকটি কঠিন সমস্যা ছিল "অগ্নি"-র পেলোড-এর নকশার ব্যাপারে। প্রচণ্ড গতির সঙ্গে এই নকশার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাকে পুনঃপ্রবেশ করতে হত প্রচণ্ড গতিতে। বস্তুত বায়ুমণ্ডলে "অগ্নি" পুনঃপ্রবেশ করত শব্দের গতির ১২ গুণ অধিক গতিতে (বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে আমরা বলি, ১২ ম্যাক)। সেই সাংঘাতিক গতিবেগের মধ্যে বাহনটিকে কী করে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বিষয়ে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। একটি পরীক্ষা যে চালাব, তার জন্যে অত উচ্চগতি উৎপন্ন করতে পারে এমন কোনও বায়ু-সুড়ঙ্গ (wind-tunnel) আমাদের ছিল না। আমেরিকানদের কাছ থেকে যদি সাহায্য চাইতাম, তারা মনে করত আমরা এমন কিছু করতে চাইছি যা তাদেরই নিজস্ব অধিকারের মধ্যে পড়ে। আর সহযোগিতা যদি-বা করতে রাজি হত, তাদের বায়ু-সুড়ঙ্গ-এর জন্যে তারা এমন মূল্য চাইত যা আমাদের সমগ্র প্রকল্পের বাজেটের চেয়ে বেশি। এখন প্রশ্ন হল, এই ব্যবস্থাটাকে বাগে আনা যায় কী করে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধ্যাপক এস. এম. দেশপাণ্ডে চারজন অতিশয় মেধাবী তরুণ বিজ্ঞানীকে খুঁজে পেলেন যাঁরা তরল গতিবিদ্যার বিষয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা ছ-মাসের মধ্যে Hypersonic Regimes for Computational Fluid Dynamics-এর জন্যে সফটওয়্যার উদ্ভাবন করে ফেললেন। পৃথিবীতে যে রকম সফটওয়্যার সেইটাই একমাত্র।

আর একটি বড় প্রাপ্তি হল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধ্যাপক আই. জি. শর্মার ক্ষেপণাস্ত্র trajectory simulation সফটওয়্যার 'অনুকল্পনা' (ANUKALPANNA)-র বিকাশ। একটি "আকাশ" ধরনের অস্ত্র ব্যবস্থা বহু লক্ষ্য ভেদ করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিনা এটি তার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। কোনও দেশই এই ধরনের সফটওয়্যার আমাদের দিতে পারত না; তবে সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে আমরা এর উন্নতি সাধন করতে পেরেছিলাম।

ক্ষেপণাস্ত্রের আরও নানাবিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নির্মাণের কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, দিল্লির অধ্যাপক ভারতী ভাট-এর। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন সলিড ফিজিক্স ল্যাবরেটরি (SPL) এবং সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (CEL)। "আকাশ"-এর নিয়ন্ত্রণ, চালনা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী বহুগুণসম্পন্ন ferrite phasershifter, এবং বহু কার্য-সাধনকারী 3-D Phased সেনা রাডার-এর বিকাশ ও উদ্ভব ঘটিয়ে তাঁরা পাশ্চাত্য দেশসমূহের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে খর্ব করতে পেরেছিলেন। এছাড়াও খড়্গপুর IIT-র অধ্যাপক সরাফ এবং তাঁর সহযোগী যিনি RCI-এ আমার সহকর্মী ছিলেন, সেই বি. সি. মুখোপাধ্যায় একযোগে কাজ করে "নাগ" Seeker Head-এর জন্যে একটি মিলিমেট্রিক ওয়েভ (MMW) অ্যান্টেনা তৈরি করলেন দু-বছরের মধ্যে, যা এমনকী আন্তর্জাতিক মানের হিসেবেও রেকর্ড সময়ে নির্মিত। আরও উল্লেখ্য পিলানির Central Electrical and Electronic Research Institute (CEERI)। পিলানি SPL ও RCI-এর সঙ্গে সমবেতভাবে বিকাশ ঘটালেন এমন একটি Impatt Diode-এর যা MMW যন্ত্রের (device) হৃদয়স্বরূপ; এই ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকরণের সৃষ্টির ফলে প্রযুক্তিগত বিদেশি নির্ভরতাকে সহজে অতিক্রম করা যায়।

নানা জায়গায় প্রকল্পের কাজ যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কোথায় কাজ কী রকম হচ্ছে তার মূল্যায়ন তত কঠিন হতে থাকল। DRDO-র একটা নিজস্ব মূল্যায়ন-সংক্রান্ত নীতি ছিল। প্রায় ৫০০ বিজ্ঞানী আমার নেতৃত্বে কাজ করছিলেন। তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করে আমাকে বার্ষিক গোপন রিপোর্ট (ACR) তৈরি করতে হত। সে সব রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হত একটি মূল্যায়ন পর্ষদ-এর কাছে। তাতে থাকতেন বাইরের বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা সুপারিশ করতেন কার পদোন্নতি হবে ইত্যাদি। আমার দায়িত্বের এই অংশটি সম্পর্কে অনেকেরই একটা অন্যায় প্রতিকূলতা ছিল। একটি পদোন্নতি যিনি না পেলেন, তিনি মনে করতেন আমি তাঁকে পছন্দ করি না বলেই পেলেন না। অন্যদের পদোন্নতি হলে বা ঘটলে তিনি মনে করতেন সেই অন্যদের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব আছে। আমার দায়িত্ব ছিল কাজের মূল্যবিচার। আমাকে হতে হত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার সতর্ক বিচারক।

বিচারককে বুঝতে গেলে তুলাদণ্ডের ধাঁধাটা বুঝতে হবে। তার এক দিকে উঁচু হয়ে থাকে প্রত্যাশা আরেক দিকে চাপানো থাকে আশঙ্কা। আশঙ্কার দিকটা ভারী হলে সমুজ্জ্বল আশা রূপান্তরিত হয় নির্বাক আতঙ্কে।

একজন যখন নিজেকে দেখে, সে যা দেখে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সে দেখে তার উদ্দেশ্য কী ছিল। বেশির ভাগ লোকেরই উদ্দেশ্য ভাল থাকে এবং সেই কারণে তারা মনে করে, যা করছে ভালই করছে। কেউ যে তার নিজের কাজ-কর্মের খুব নৈর্ব্যক্তিক বিচার করবে তার সম্ভাবনা কম। সে কাজ তার উদ্দেশ্যের বিপরীত হতে পারে, প্রায় হয়েও থাকে। অধিকাংশ লোক যখন কাজ করতে আসে, কাজ করব মনে করেই আসে। তাদের অনেকেই যেমনভাবে সুবিধে তেমনিভাবে কাজ করে যায়, তার পর সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাবার সময়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি যায়। তারা শুধু তাদের উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করে। ধরে নেওয়া হয়, যেহেতু একজন সময় মতো কাজটা সম্পূর্ণ করবার সদুদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করেছে, অতএব কাজে যদি দেরি হয়ে থাকে, তার জন্যে সে দায়ী নয়। যে সব কারণে দেরি হয়েছে তাতে তার কোনও হাত ছিল না। দেরি করবার তার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তার কোনও কাজের জন্যে, কিংবা কোনও কাজ না করার জন্যে যদি দেরি হয়ে থাকে, সেটা কি ইচ্ছাকৃত নয়?

যখন আমি একজন তরুণ বিজ্ঞানী ছিলাম, তখনকার দিনগুলির দিকে আমি যখন ফিরে তাকাই, আমি বুঝতে পারি, সর্বক্ষণ আমার মনে যে আকাঙ্ক্ষা সবচাইতে

তখন প্রবল হয়ে থাকত সেটা হল, আমি যা ছিলাম তার চেয়ে বড় হব। আমি চাইতাম আরও বেশি অনুভব করতে, আরও বেশি শিখতে, আরও বেশি প্রকাশ করতে। আমি চাইতাম বেড়ে উঠতে, নিজেকে সংস্কৃত করতে, বিশুদ্ধ করতে, বিকশিত করতে। কর্মজীবনে আমার উন্নতির জন্যে কোনও প্রভাব খাটাবার মতো কেউ ছিল না। শুধু ছিল এরকম একটা তাগিদ যে, আমাকে আমার নিজের মধ্যে থেকেই অতিরিক্ত কিছু পেতে হবে। আমার প্রেরণা আসত, যখন সামনে তাকিয়ে দেখতাম কত দূর আমাকে যেতে হবে, কত দূর এসেছি, তা দেখে নয়। যত যাই হোক, সমাধান হয়নি এমন সমস্যা, দ্ব্যর্থবোধক সাফল্য এবং অস্পষ্ট আকার বিশিষ্ট পরাজয়ের মিশ্রণ ছাড়া জীবন আর কী?

মুশকিল হচ্ছে, আমরা জীবনকে যত ব্যবচ্ছেদ করি তত তার মোকাবিলা করি না। লোকে তাদের অসাফল্যের বিচার বিশ্লেষণ করে, তার কারণ কী, পরিণতি কী, তা বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা থেকে এমন অভিজ্ঞতা আহরণের চেষ্টা করে না যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয়। আমার বিশ্বাস দুঃখকষ্ট এবং সমস্যার ভিতর দিয়েই ঈশ্বর আমাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেন। কাজেই যখন দেখবে তোমার আশা, তোমার স্বপ্ন, তোমার জীবনের লক্ষ্য, সব ভেঙে পড়েছে, সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে দেখ, হয়তো দেখবে তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি সুবর্ণ সুযোগ।

নেতার কাছে এটা চিরকাল একটা চ্যালেঞ্জ যে, মানুষকে তাদের কাজ আরও ভাল করে করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, মনকে দমে যেতে দিলে চলবে না। সংগঠনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি জবরদস্তি ভারসাম্য ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, বিপরীতমুখী বলের একটি ক্ষেত্রে একটি কুণ্ডলিত স্প্রিং-এর পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি। এ ক্ষেত্রে কিছুটা বল পরিবর্তনে সহায়তা করে আর কিছুটা বল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। সহায়ক বলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে, যেমন পরিদর্শন সংক্রান্ত চাপ, জীবনে উন্নতির আশা ও আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি; কিংবা বিরুদ্ধগামী বলকে কমিয়ে দিয়ে, যেমন গোষ্ঠীর মধ্যেকার নিয়মনীতি, সামাজিক পুরস্কার, আর কর্ম-নিবৃত্তি ইত্যাদি। এই পরিস্থিতি অভীপ্স বলের লক্ষ্যেই কাজ করে—তবে খুব অল্প সময়ের জন্যে, আর তাও একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। কারণ এর কিছুপরেই বিরুদ্ধবাদী বল এমন আরও বিপুলবেগে ঠেলা দেবে যে তা আরও কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলবে। আর তাই সবচেয়ে ভাল পন্থা হল, বিরুদ্ধবাদী বল-কে এমন পদ্ধতিতে কমাতে হবে যে, সহায়ক ক্ষেত্রে যাতে কোনও আনুষঙ্গিক বৃদ্ধি না-ঘটে। এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাতে এবং তা বজায়

রাখতে খুব কম শক্তিই খরচ হবে।

বল-এর যে ফলাফলের কথা আমি ওপরে বললাম, তা হল উদ্দেশ্য। এটা এমনই একটা বল যা একজন ব্যক্তির অন্তরের বস্তু এবং এটিই কাজের পরিবেশে তার আচরণের ভিত্তি গড়ে তোলে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অধিকাংশ লোকের মধ্যেই বেড়ে ওঠার, সামর্থ্য অর্জন করার, নিজের মধ্যেকার সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলার একটা জোর তাগিদ থাকে। সমস্যা হয় তখন, যখন তার জন্যে এমন উপযুক্ত কর্ম পরিমণ্ডল থাকে না যেটি উদ্দীপনামূলক এবং তাঁদের এই তাগিদকে পূর্ণপ্রকাশের সহায়তা দেয়। সেই রকম সংগঠন, সেই রকম কাজের ধরন দিয়ে একজন নেতা তাদের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে তার সঙ্গে তাঁদের পরিশ্রমকেও স্বীকৃতি দিতে হবে, পুরস্কৃত করতে হবে।

১৯৮৩ সালে IGMPD-এর শুরুর সময়ে আমি এমনই একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। ওই প্রকল্প তখন নকশার পর্যায়ে ছিল। এখানে পুনরসংগঠনের ফল দাঁড়িয়েছিল অন্ততপক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ সক্রিয়তার মাত্রা বৃদ্ধি। এরপর এই বহু প্রকল্প বিকাশ ও উড়ান পরীক্ষার পর্যায়ে প্রবেশ করল। বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মাইলফলক অতিক্রম করতে পারার ফলে দেখতে পাওয়া গেল ভবিষ্যৎ কর্মসূচি আর সেই সঙ্গে তৈরি হল ধারাবাহিক দায়বদ্ধতা। তরুণতর বিজ্ঞানীদের একটি দলকে এখানে কাজে লাগানোর ফলে প্রকল্প কর্মীদের গড় বয়স ৪২ থেকে নেমে গেল ৩৩ বছরে। আমার ধারণায় সেটাই ছিল দ্বিতীয় পুনরসংগঠনের মোক্ষম সময়। কিন্তু কীভাবে আমার এগোনো উচিত? সেই সময়ে আমি প্রথমেই, প্রাপ্তব্য প্রেরণামূলক মানসিকতা (available motivational inventory) কতটা আছে তার হিসেবটা করে নিলাম। তবে আগে, প্রাপ্তব্য প্রেরণামূলক মানসিকতা বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি, তার ব্যাখ্যাটা একটু এখানে সেরে নিই। একজন নেতার প্রেরণামূলক মানসিকতা গঠিত হয় তিন ধরনের বোঝাপড়ার সাহায্যে: প্রয়োজনের জন্যে বোঝাপড়া যা মানুষ আশা করে তার কাজে; ফলের জন্যে বোঝাপড়া অর্থাৎ কাজের পরিকল্পনার তৈরির জন্যে যে প্রেরণা; এবং ক্ষমতার বোঝাপড়া যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে ইতিবাচক পুনরশক্তি সঞ্চার করে।

১৯৮৩-তে পুনরসংগঠিত করা হয়েছিল নতুনভাবে সাজানোর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে। এই অত্যন্ত জটিল কাজটি খুবই কুশলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন এ. ভি. রঙ্গ রাও এবং কর্নেল আর. স্বামীনাথন। নবনিযুক্ত তরুণ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে এক একটি টিম আমরা তৈরি করেছিলাম। এবং

একটি strapdown inertial guidance system, একটি on-board computer এবং একটি পুরশ্চালন ব্যবস্থার ram রকেট নির্মাণের চ্যালেঞ্জ এই টিমকে দেওয়া হল। এই ধরনের নির্মাণ প্রচেষ্টা এ-দেশে এই প্রথম সংঘটিত হল; এছাড়াও এর সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তির মান যে কোনও বিদেশি মানের সঙ্গে তুলনীয়। গাইরো (gyro) ও অ্যাক্সিলেরোমিটার প্যাকেজকে কেন্দ্র করে ছিল এই সহায়ক প্রযুক্তি আর sensor output প্রক্রিয়াকরণের জন্যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা। সংযুক্ত বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা ছিল অভিযান সংক্রান্ত গণনা ও উড়ানের অনুক্রম বিষয়ক কাজের দায়িত্বে। একটি বুস্টার রকেট সংযোজিত হওয়ার পর ram রকেট ব্যবস্থা তার দীর্ঘযাত্রায় বায়ু সঞ্চারিত করে উচ্চ বেগ ধরে রাখতে সাহায্য করে। এই তরুণ বিজ্ঞানীর দল শুধু যে এই সিসটেমের নকশা তৈরি করেছিলেন তাই নয়, তাঁরা এর কার্যকর আনুষঙ্গিক যন্ত্রেরও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। পরে "পৃথ্বী" এবং তারও পরে "অগ্নি"তে এই একই নিয়ন্ত্রণ রীতি ব্যবহার করা হয়েছিল যার ফল হয়েছিল অতি চমকপ্রদ। তরুণতর এইসব বিজ্ঞানীদের দলের আপ্রাণ প্রচেষ্টা, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশকে এক স্বনির্ভরতার পথে পৌঁছে দিয়েছিল। এটা ছিল "নবীকরণ বিষয়ের" একটি চমৎকার উপস্থাপনা। একদল নবীন মনের সান্নিধ্য পেয়ে আমাদের মেধাগত সামর্থ্য যেন পুনর্জীবন লাভ করল এবং এক অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করতে পারল।

এখন, কর্মীদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করা ছাড়াও প্রকল্প গোষ্ঠীর ক্ষমতা কতখানি ছিল সে-বিষয়েও একটু বলা দরকার। প্রায়শই মানুষ চায় তার সামাজিক, আত্ম-অহং-এর তৃপ্তি, আর তার কর্মক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজন হয় আত্ম-প্রত্যয়ের। একজন সু-নেতা অবশ্যই এই দু-ধরনের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যকে নির্ণয় করতে সক্ষম। একটি হল ব্যক্তির প্রয়োজনকে তৃপ্ত করা, এবং অন্যটি হল কর্মের মধ্যে যা অতৃপ্তির সৃষ্টি করে তাকে নির্ধারণ করা। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, সেইসব মানুষ তাদের কর্মক্ষেত্রে এরকম ধরনের বৈশিষ্ট্যকে খোঁজে, যার মধ্যে নিহিত থাকে মূল্যবোধ এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য—যাকে তারা মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে মহামূল্যবান। একটি কাজ যদি কর্মীর প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জন, স্বীকৃতি, দায়িত্ববোধ, বিকাশ বৃদ্ধি ও অগ্রগতির সঙ্গে মিলে যায় তাহলে তারা লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হয় না।

একবার কাজটি একজন কর্মীর কাছে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও অবস্থার দিকে নজর দেয়। সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে শুরু করে প্রশাসনের নীতি, তার নেতৃত্বের যোগ্যতা, নিশ্চয়তা, মর্যাদা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজের অবস্থা। এরপর সে এইসব উপাদানকে তার সহকর্মীদের সঙ্গে যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, তার সঙ্গে মেলাতে শুরু করে এবং এইসব উপাদানের আলোকেই তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে পরীক্ষা করে নেয়। এই সমস্ত দিকগুলি একত্রিত হয়ে একজন ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও তার কাজের সাফল্য নির্ধারণ করে।

১৯৮৩ সালে উদ্ভূত ম্যাট্রিক্স সংগঠন সমস্ত শর্তের সমন্বয়ের এক চমকপ্রদ প্রমাণ। সুতরাং, ল্যাবরেটরিতে এই ধারাটিকে ধরে রাখার সূত্রেই আমরা কর্মপ্রক্রিয়ার একটি নকশা তৈরি করে ফেললাম। প্রযুক্তিমন্ত্রকে কর্মরত সমস্ত বিজ্ঞানীরা এমন পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন যাতে প্রত্যেক ব্যবস্থাপক এক একটি প্রকল্পের কাজ দেখাশুনো করতে পারেন। দীর্ঘদিনের একজন উন্নয়নমূলক fabrication প্রযুক্তিবিদ, পি. কে. বিশ্বাসের নেতৃত্বে একটি বহিঃস্থ fabrication শাখা গঠন করা হল, যাঁরা, ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত ভারী যন্ত্রপাতির বিকাশের সঙ্গে যুক্ত যে-সব সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ, তাঁদের সঙ্গে লেনদেন চালাবে। আভ্যন্তরীণ fabrication বিষয়ের কর্মীদের ওপর চাপ তাতে অনেক কমে যায় এবং যে সব কাজ সাধারণত বাইরে করানো সম্ভব ছিল না, সেই সব কাজের প্রতি তারা পূর্ণ মনঃসংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়। এই সব কাজ হতে থাকল পুরো তিনটি শিফট জুড়েই।

AMARBOI.COM

১৯৮৮-র গোড়ার দিকে পৌঁছে "পৃথ্বী"-র কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এদেশে এই প্রথম একটি ক্ষেপণাস্ত্র পদ্ধতিতে মোট বেগ-এর প্রোগ্রামযোগ্য গুচ্ছাকার Liquid Propettent (LP) রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার হতে চলার মুখে, যাতে পেলোড পাল্লা সমন্বয়ের নমনীয়তা ধারণ করতে পারে। এবার নীতি সিদ্ধান্ত সমূহের গুণ ও সুযোগ সৃষ্টির বাইরে, সুন্দরম ও আমি "পৃথ্বী" টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। বস্তুত প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে সৃষ্টিশীল ভাবনার পরে, যে-ভাবনা পরিবর্তিত হয় কর্মযোগ্য উৎপাদ এবং টিম সদস্যদের অবদানের গুণ ও বিস্তৃতিতে। এ-ব্যাপারে পি. বেণুগোপালন এবং ওয়াই. জ্ঞানেশ্বর সহ সারস্বত একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন করলেন। গর্ব আর লক্ষ্য অর্জনের এক বোধ তাঁরা টিমের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এইসব রকেট ইঞ্জিনের গুরুত্ব শুধু "পৃথ্বী" প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—এটা ছিল একটা জাতীয় লক্ষ্য অর্জন। তাদের যৌথ নেতৃত্ব, এক বিশাল সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি সহায়তাকারী টিমের লক্ষ্য সমূহ, এবং কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য যা তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করার জন্যে দায়বদ্ধ ছিলেন, সে-ব্যাপারে নিজেদের অবহিত করা ও একই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

করাতে পেরেছিলেন। তাদের সমগ্র দলই এক ধরনের স্বতোপ্রণোদিত নির্দেশের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এছাড়াও তারা কিরকি-র অস্ত্র কারখানার সঙ্গে একযোগে কাজ করে, এই সব ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত প্রপেল্যান্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশি উপাদান সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন।

বাহনের বিকাশ সুন্দরম ও সারস্বতের দক্ষ, নির্ভরযোগ্য হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি "পৃথ্বী" অভিযানের অন্যান্য জটিল দিকগুলোর দিকে নজর দিতে শুরু করলাম। ক্ষেপণাস্ত্রের ওঠার শুরু যাতে মসৃণভাবে, নির্বিঘ্নে হয় সে জন্যে launch release mechamism (LRM)-এর বিকাশের ব্যাপারে সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে ফেলা হল। DRDL এবং বিস্ফোরক গবেষণা ও বিকাশ গবেষণাগার (ERDL)-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় উৎক্ষেপণের আগে LRM-কে সঠিক অবস্থানে ধরে রাখতে বিস্ফোরক খিলের (explosive bolts) বিকাশ বহু কর্মকেন্দ্রের সমন্বয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ।

উড়োজাহাজে করে উড়ে যাওয়ার সময়ে ভিতরে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকা সর্বদাই আমার একটা প্রিয় বিষয়। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এই প্রকৃতিকে দেখতে বড় সুন্দর, বড় সুশৃঙ্খল, বড় শান্তিপূর্ণ লাগে। কোনও সীমান্তরেখারই যেন কোনও অস্তিত্বই আর থাকে না—না কোনও জেলা, না রাজ্য, না দেশ—সব যেন মিলেমিশে একাকার। এরকম একটা দূরত্ব আর বিচ্ছিন্নতা বোধহয় কখনও কখনও আমাদের জীবনের সমস্ত কাজকর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্যেও দরকার হয়।

তখনও বালেশ্বরের অন্তবর্তীকালীন পরীক্ষা-অঞ্চল (Interim Test Range) সম্পূর্ণ হতে কম করেও বছরখানেক দেরি, সেই সময়ে আমরা "পৃথ্বী" উৎক্ষেপণের জন্যে SHAR-এ কিছু বিশেষ আয়োজন করলাম। এর মধ্যে ছিল একটা উৎক্ষেপণ মঞ্চ, ব্লক হাউস, নিয়ন্ত্রণ উপ-কক্ষ এবং চলমান টেলিমেট্রি স্টেশন। এই সূত্রে আমার পুরনো বন্ধু SHAR কেন্দ্রের অধিকর্তা এম. আর. কুরুপের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার ভীষণ আনন্দ হল। "পৃথ্বী" উৎক্ষেপণ অভিযানে কুরুপের সঙ্গে কাজ করায় আমার বিরাট সুখের কারণ ঘটেছিল। DRDO ও ISRO, DRDL ও SHAR-এর সংগঠনগত বিভাজন রেখার সীমা ভুলে গিয়ে একজন টিম সদস্য হিসেবে কুরুপ "পৃথ্বী"তে কাজ করেছিলেন। কুরুপ মাঝে মাঝেই উৎক্ষেপণ মঞ্চে আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি তাঁর রেঞ্জ টেস্টিং (range testing) ও রেঞ্জ সেফটির (range safety) অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে ব্যয় করে প্রকল্পের পূর্ণতা দানে সহায় হলেন। এছাড়া propellant filling-এর ক্ষেত্রে এমন

উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন যে, আমাদের মাত্র একটি "পৃথ্বী" উৎক্ষেপণের অভিযানকে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত করে তুলেছিলেন।

"পৃথ্বী" উৎক্ষিপ্ত হল ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ সকাল ১১:২৫-এ। এদেশে রকেট বিদ্যার ইতিহাসে সে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। 'পৃথ্বী" শুধু এমন একটি ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র ছিল না, যে শুধু ১০০০ কেজি বিস্ফোরক ১৫০ কিমি দূরে নিয়ে যেতে পারে, সে ছিল দেশের ভবিষ্যতের সমস্ত দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের জন্যে একটি আকর নমুনা মডিউল। দূরপাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, এবং ক্ষেপণাস্ত্র যাতে নৌবহর-এর ওপর স্থাপন করা যায়, তারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

একটি ক্ষেপণাস্ত্রের যথার্থতাকে প্রকাশ করা হয় এর Circular Error Probable (CEP)-এর মাধ্যমে। একে মাপা হয় একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের অন্তত ৫০ ভাগ ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকতে পারার শক্তি দিয়ে। অন্যভাবে বললে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় যে, একটি ক্ষেপণাস্ত্রের যদি ১ কিমির CEP থাকে (যেমন ইরাকি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র উপসাগরীয় যুদ্ধে ফেলা হয়েছিল) তাহলে তার অর্থ হল এই যে, ১ কিমি ব্যাসার্ধের লক্ষ্য-বস্তুর মধ্যে অর্ধেক-অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে। প্রচলিত উচ্চ-বিস্ফোরক যুদ্ধাস্ত্র এবং একটি ১ কিমির CEP-যুক্ত একটি ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণভাবে স্থির সাময়িক লক্ষ্য (fixed military targets) যেমন 'কমান্ড ও কন্ট্রোল ফেসিলিটি' কিংবা 'এয়ার বেস'-কে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। আসলে এটি কোনও অজানা লক্ষ্যের (যেমন একটি নগর) বিরুদ্ধে অনেক বেশি কার্যকর।

১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫-এর মার্চ-এর মধ্যে লন্ডনে আঘাতহানা জার্মান V-2 ক্ষেপণাস্ত্র ছিল প্রচলিত উচ্চ বিস্ফোরক যুদ্ধাস্ত্র এবং এটি খুবই বিশাল আকারের ছিল—প্রায় ১৭ কিমির CEP সম্পন্ন। এর পরে 500V-2 ক্ষেপণাস্ত্র লন্ডনে আঘাত হানায় বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল: ২১,০০০-এর মতো জীবনহানির ঘটনা ঘটেছিল এবং ২০,০০,০০০-এর মতো বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পাশ্চাত্য দেশগুলি যখন নিজেদের মধ্যে NPT (নিউক্লিয়ার পাওয়ায় টেস্ট) নিয়ে নাকি কান্না কাঁদছে সে-সময় আমরা আরও বেশি জোর দিচ্ছি core guidance ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তির ক্ষমতায় বলীয়ান হতে, যাতে নির্দিষ্টভাবে ৫০ মিটারের CEP-র লক্ষ্য অর্জন করা যায়। এমনকী পরমাণু যুদ্ধাস্ত্রহীন হয়েও, সম্ভাব্য কৌশলগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঘাতের কঠিন বাস্তব, "পৃথ্বী"র সফল পরীক্ষা, সমালোচকদের একটা সম্ভাব্য প্রযুক্তি ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে ফিসফিসানিকে একেবারে বন্ধ করে দিল।

"পৃথ্বী"র উৎক্ষেপণ যে সব প্রতিবেশী দেশ আমাদের বন্ধু নয়, তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, পাশ্চাত্য শক্তি সমূহ প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্রুদ্ধ হল। সাত মাসের জন্যে ভারতে কোনও প্রযুক্তি প্রেরণ নিষিদ্ধ হল। সহায়ক ক্ষেপণাস্ত্রের সঙ্গে যার সুদূরতম সম্পর্ক আছে এমন কোনও দ্রব্য ক্রয় ভারতের পক্ষে বারণ হয়ে গেল। সহায়ক ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে একটি আত্মনির্ভর জাতি হিসাবে ভারতের আত্মপ্রকাশে সমগ্র শিল্পোন্নত জগৎ অতিশয় বিচলিত হয়ে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

রকেট-বিদ্যায় ভারতের মৌলিক সক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। অসামরিক মহাকাশ শিল্প এবং স্বনির্ভর ক্ষেপণাস্ত্র-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা, ভারতকে, 'সুপার পাওয়ার' বলে যাঁরা নিজেদেরকে বর্ণনা করেন সেই স্বল্পসংখ্যক দেশের অন্যতম করে দিয়েছে। ভারতকে সর্বদা বলা হয় বুদ্ধ কিংবা গান্ধীর শিক্ষা অনুসরণ করতে। তবে কীভাবে এবং কেন ভারত ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত শক্তি হয়ে উঠল, এ প্রশ্নের উত্তর আগামী প্রজন্মের জন্যে দেওয়া দরকার।

দু-শতাব্দীর অধীনতা অত্যাচার ও বঞ্চনা ভারতের মানুষের সৃজন ক্ষমতা ও সামর্থ্য বিনষ্ট করতে পারেনি। সার্বভৌমতা ও স্বাধীনতার মোটে এক বছরের মধ্যে ভারতীয় মহাকাশ ও পারমাণবিক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয় শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের জন্যে অর্থও বরাদ্দ হয়নি, তার কোনও চাহিদাও ছিল না সামরিক বাহিনী সমূহের তরফ থেকে। তবু, ১৯৬২-র তিক্ত অভিজ্ঞতা ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের দিকে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমাদের বাধ্য করল।

তবে, একটি "পৃথ্বী"-ই কি যথেষ্ট? চার কিংবা পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র নিজের দেশে তৈরি করতে পারলে তাতেই কি ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে? কিংবা পারমাণবিক অস্ত্র হাতে পেলে আমাদের শক্তি কি আরও বাড়বে? ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র, এ সব একটি বৃহত্তর বস্তুর অংশ মাত্র। আমার মতে "পৃথ্বী"-র উদ্ভাবন উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতার প্রতীক। উচ্চ প্রযুক্তি মানেই প্রচুর অর্থ, বিরাট পরিকাঠামো। দুর্ভাগ্য এই দুয়ের কোনওটিই আমাদের হাতে যথেষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণে নেই। তাহলে আমরা কী করতে পারতাম? দেশের যাবতীয় সম্বল একত্র করে "অগ্নি" ক্ষেপণাস্ত্র যদি বা নির্মাণ করা যায় আমাদের প্রযুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, সে প্রশ্নের কী একটা উত্তর পাওয়া যেতে পারে?

প্রায় এক দশক আগে ISRO-তে REX নিয়ে আলোচনা করার সময়েই আমি যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলাম যে, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা একযোগে কাজ করলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই নতুন সাফল্য লাভ করতে পারবেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারত অবশ্যই করায়ত্ত করতে পারে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সমবেত প্রচেষ্টায়। ভারতীয় শিল্পকে যদি, এই যে তাদের নিজেদের সৃষ্ট ধারণা যে তারা কেবলমাত্র জোড়া-তালি দেওয়ার ওস্তাদ, এই ধারণা থেকে মুক্ত করা যায় তাহলে স্বদেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি তারা অবশ্যই কাজে লাগাতে পারবে এবং তাতে লাভবানও হবে। তার জন্যে আমাদের ত্রি-মুখী কৌশল দরকার, বহু শিল্পের অংশীদারিত্ব, সঠিক দিকনির্দেশ, সমবেত প্রচেষ্টার দিকে এগোনো এবং ক্ষমতাপ্রদ প্রযুক্তি—এই সব চকমকি পাথরের ঘর্ষণেই "অগ্নি"-র স্ফুলিঙ্গের জন্ম।

৫০০-র ও বেশি বৈজ্ঞানিকের সমন্বয় ঘটেছিল "অগ্নি" টিম-এ। বহু সংস্থা "অগ্নি" উৎক্ষেপণের বিশাল প্রচেষ্টাকে রূপায়ণের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। "অগ্নি" অভিযানের দুটি মূল দিক ছিল—কর্ম এবং কর্মী। প্রত্যেক সদস্যই তার টিমের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যের ওপর নির্ভর করত। বিরোধিতা ও বিশৃঙ্খলা হল এমন দুটি ব্যাপার যা এই ধরনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। বিভিন্ন নেতারা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে কর্মীদের কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে সহায়তা করতেন এবং এই ব্যাপারে সজাগ থাকতেন। কয়েকটি কর্মস্থানে কাজের ফল পাওয়ার জন্যে তাঁরা কর্মীদের সব ব্যাপারেই খেয়াল রাখতেন। কদাচ তাঁরা লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে কর্মীদের যন্ত্রবৎ ব্যবহার করতেন না। অনেকে আবার কাজকেও অতটা প্রাধান্য দিতেন না এবং সদা সচেষ্ট থাকতেন কর্মীদের সঙ্গে কাজ করার সময়ে যাতে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে হৃদ্যতা ও স্বাধীনতা বজায় থাকে। এর ফলে এই টিম কাজের গুণগত মান ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সম্ভাব্য সর্বোচ্চ একাত্মভূত অবস্থা অর্জন করতে পেরেছিল।

একাত্মবোধ, অংশগ্রহণ আর দায়বদ্ধতা কাজ চালাবার প্রধান চাবিকাঠি। প্রত্যেকটি টিম সদস্যই তার পছন্দ মতো কাজে লেগে থাকতেন। "অগ্নি" উৎক্ষেপণ তাই শুধু বিজ্ঞানীদের নয়, তাঁদের পরিবারের ক্ষেত্রেও এক সাধারণ পণ হয়ে উঠেছিল। ভি. আর. নাগরাজ ছিলেন বৈদ্যুতিক একীকরণ দলের নেতা। তিনি এমনই একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন যে, একীকরণের কাজ চলার সময়ে রোজকার জীবনের সাধারণ ব্যাপার—নাওয়া-খাওয়ার মতো বিষয়ও ভুলে যেতেন। তিনি যখন ITR-এ সে সময় তার শ্যালক মারা যান। তার পরিবারের লোকেরা নাগরাজকে এই সংবাদটি জানাননি যাতে তাঁর "অগ্নি" ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত কাজে কোনওরকম ব্যাঘাত না ঘটে।

"অগ্নি"-র উৎক্ষেপণের দিন নির্ধারিত ছিল ১৯৮৯-এর ২০ এপ্রিল। এমন ঘটনা তার আগে কখনও ঘটেনি। মহাকাশ-যান উৎক্ষেপণ আর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ এক জিনিস নয়। এতে বহু প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। শেষ মুহূর্তে কমপিউটার বলল, "Hold" অর্থাৎ একটি যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না তৎক্ষণাৎ তাকে মেরামত করা হল। এরকম "Hold" আরও অনেকবার দরকার হল। সুতরাং উৎক্ষেপণ মুলতুবী রাখতে হল।

দুটি রাডার, তিনটি টেলিমেট্রি স্টেশন, একটা টেলিকমান্ড স্টেশন এবং চারটি ইলেকট্রো-অপটিক্যাল ট্রাকিং ইনস্ট্রুমেন্ট স্থাপন করা হল ক্ষেপণাস্ত্র ট্রাজেকটরির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যে। এর সঙ্গে কার নিকোবরের টেলিমেট্রি স্টেশন (ISTRAC) এবং SHAR রাডার নিযুক্ত করা হল বাহনটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করার জন্যে। যে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারির মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং সিসটেম চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই শক্তিকে চালু রাখার জন্যে গতীয় নজরদারি (dynamic surveillance) ব্যবস্থা নিয়োজিত করা হল। ভোল্টেজ বা চাপ-এর কোনও ক্ষেত্রে যদি কোনও গোলমাল দেখা দেয় তাহলে বিশেষভাবে নকশা করা স্বয়ংক্রিয় উড়ান-চালু-করার ব্যবস্থা জানিয়ে দেবে "Hold"। ওই গোলমাল না শোধরানো পর্যন্ত উড়ান-কার্য আবার তার সঠিক ক্রমপর্যায়ে ফিরে আসবে না। উৎক্ষেপণ শুরুর প্রহর গোণা (count-down) শুরু হবে টি-৩৬ ঘণ্টায়। টি-৭.৫ মিনিট থেকে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সহায়তায় প্রহর গোণা নিয়ন্ত্রিত হবে।

উৎক্ষেপণের সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি নির্ধারিত সময় অনুযায়ী চলছিল। আমরা ঠিক করেছিলাম, উৎক্ষেপণের সময়ে সুরক্ষার স্বার্থে কাছাকাছি সব গ্রামের লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং ব্যাপারটা নিয়ে বেশ জল ঘোলাও হল। ১৯৮৯-এর ২০ এপ্রিল-এ পৌঁছানো পর্যন্ত সমগ্র জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমাদের ওপর। উড়ান পরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে কূটনৈতিক মহলের মাধ্যমে বিদেশি চাপ আসতে লাগল। কিন্তু ভারত সরকার স্থির-সংকল্প নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল এবং আমাদের কাজকে নিরস্ত করার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দিল। এরপর, যখন আমরা টি-১৪ সেকেন্ডে পৌঁছেছি সেই সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পিউটারে সংকেত ভেসে উঠল "Hold"; কোনও একটি যন্ত্র কোথাও ভুলভাবে কাজ করছে বলে বৈদুতিন যন্ত্র জানিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শোধরানো হল। ইতিমধ্যে down-range স্টেশন "Hold"-এর ব্যাপারে জানতে চাইল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই, অপরিবর্তনীয় আভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যয়ের ফল হিসেবে আমাদের আরও অনেক ব্যাপারে "Hold"-এর প্রয়োজন দেখা দিল। আর তাই, উৎক্ষেপণ বন্ধ করতে আমরা একপ্রকার বাধ্য হলাম। সংযুক্ত শক্তি যোগান (on-board power supply) বদলে ফেলার জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রটিকে আবার পুরো খুলে ফেলতে হবে। ইতিমধ্যে নাগরাজের বাড়ি থেকে কোনও পারিবারিক দুর্ঘটনার সংবাদ আসায়, ভারাক্রান্ত নাগরাজ আমার সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার কথা বললেন এবং এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, তিনদিনের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন। এইসব সাহসী মানুষের জীবন কথা কখনও কোনও ইতিহাসের বইয়ে লেখা হবে না ঠিকই কিন্তু এইসব নীরব মানুষই যে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে জাতির প্রগতিকে কয়েক প্রজন্ম এগিয়ে দিয়েছেন। নাগরাজকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি, দুঃখে-আঘাতে ভেঙে পড়া আমার টিমের সঙ্গে যোগ দিলাম। আমার SLV-3-র ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার কথা আমি তাদের সামনে তুলে ধরলাম। বললাম' "আমি আমার উৎক্ষেপণ যানকে সমুদ্রে হারিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ফিরেও এসেছিলাম আবার সাফল্যকেই সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের ক্ষেপণাস্ত্র তো তোমাদের সামনেই রয়েছে। কয়েক সপ্তাহের ফের পরিশ্রম ছাড়া তোমরা আসলে কিছুই হারাওনি।" এই কথাগুলোই তাদের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে একটা ঝাঁকুনির কাজ করল, আর তাদের আবারো ফিরিয়ে নিয়ে গেল সাব-সিসটেমটিকে পুনরায় শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে, নতুন করে সংগঠিত করার কাজে।

সংবাদ মাধ্যম হৈ হৈ করে নড়ে চড়ে বসল। উড়ান স্থগিত রাখার ব্যাপারে পাঠকদের "খাওয়াবার" উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র তাদের মনগড়া নানা কাহিনী হাজির করল। ব্যঙ্গচিত্রী সুধীর ধর আঁকলেন, এক দোকানী একটি উৎপাদিত দ্রব্য ফেরৎ দিচ্ছে একজন বিক্রয় প্রতিনিধিকে যে বলছে এর দশা "অগ্নি"র মতো হবে না। অন্য একজন ব্যঙ্গচিত্রী দেখালেন, একজন "অগ্নি" প্রকল্পের বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে, উৎক্ষেপণ স্থগিত রাখার কারণ চালু করার বোতামটি ঠিকমতো সংযোগ ঘটাতে পারছে না। *হিন্দুস্থান টাইমস*-এ দেখানো হল, একজন নেতা গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "আগাম সতর্কবার্তার কোনও প্রয়োজন নেই...এটা একটা বিশুদ্ধ শান্তিপূর্ণ, অহিংস ক্ষেপণাস্ত্র।"

পরের দশ দিন অনেক বিশ্লেষণের পর আমাদের বিজ্ঞানীরা ১ মে ১৯৮৯-এ উৎক্ষেপণের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রটিকে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু, আবার "Hold!" আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুলতুবী। উড়ান শুরু T10 সেকেন্ড আগে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা আবার "Hold" সংকেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেল, অন্যতম একটি নিয়ন্ত্রণ উপকরণ S1-TVC অভিযানের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করছে না। ফলে আবারো একবার স্থগিদ রাখতে হল উৎক্ষেপণ। তবে রকেট-ব্যবস্থায় এ-ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে। এমনকী বিদেশেও ঘটে এমন ঘটনা। কিন্তু এ-ব্যাপারে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা জাতির, আমাদের সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নেবার কোনও বাসনাই ছিল না। *হিন্দু* পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্রী কেশব এমন একটি চিত্র আঁকলেন, যাতে তিনি দেখালেন, এক গ্রামবাসী কিছু নোট গুণতে গুণতে অন্য আর একজনকে বলছে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরীক্ষা-অঞ্চল থেকে আমার কুঁড়েঘরটি সরিয়ে দেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদে পাওয়া গেছে এই টাকা—আর কয়েকটা এরকম 'স্থগিত' হলেই আমি নিজের জন্যে একটা পাকাবাড়ি ঠিক বানাতে পারব।" অন্য এক ব্যঙ্গচিত্রী "অগ্নি"কে এমনভাবে দেখালেন যে, "IDBM—Intermittently Delayed Ballistic Missile," যার অর্থ 'ক্রমাগত স্থগিত রাখা সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র'। আমুল মাখনের ব্যঙ্গচিত্র-য় দেখানো হল: "অগ্নি"-র উড়ার জন্যে যা চাই, তা হল আমুল মাখন!

www.amarboi.com

DRDL-RCI গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে ITR-এর আমার টিম থেকে খানিকটা সময় আমি বার করে নিলাম। ১৯৮৯-এর ৮ মে দিনের কাজের শেষে, গোটা DRDL-RCI গোষ্ঠীই একত্রে জড়ো হল। প্রায় দুহাজারেরও বেশি লোকের সেই জমায়েতের সামনে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। 'কোনও একটা ল্যাবরেটরি কিংবা গবেষণা ও বিকাশ সংস্থাকে এইরকম একটা সুযোগ কদাচিৎ দেওয়া হয়েছে যারা দেশের মধ্যে এই প্রথম "অগ্নি"-র মতো একটি ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে একটি বিরাট সুযোগ কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। বিশাল সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে, স্বভাবতই তার সমান মাপের বড় সমস্যা মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জও তো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমস্যাটিকে আমরা এড়িয়েও যাব না, কিংবা তাকে আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতেও দেব না। একমাত্র সাফল্য ছাড়া দেশ আমাদের কাছ থেকে আর কিছু আশা করে না। আসুন আমরা সবাই একযোগে ওই সাফল্যের লক্ষ্যেই এগোই।' যখন আমার বক্তৃতার প্রায় শেষের দিকে পৌঁছেছি, তখনই জমায়েতের উদ্দেশ্যে আমি নিজেই যেন নিজেকেই বলে উঠলাম: "আপনাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আবার আপনাদের সামনে ফিরে আসব এমাসের শেষ দিকে, অগ্নির সফল উৎক্ষেপণের পর।"

উড়ানের দ্বিতীয়বারের ব্যর্থতার খুঁটিনাটি কারণ বিশ্লেষণের পর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

ঢেলে সাজার বন্দোবস্ত করলাম। কাজটির দায়িত্ব দেওয়া হল DRDO-ISRO টিমকে। এই টিম ISRO-র Liquid Propellant System Complex (LPSC)-র প্রথম পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটি শোধরানোর কাজে হাত লাগাল। তারা তাদের নিবিড় মনঃসংযোগ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কাজটি শেষ করল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম সময়ে। যেভাবে প্রায় শ'খানেক বৈজ্ঞানিক ও কর্মচারী একটানা কাজ করে গেলেন, আর দশ দিনের মধ্যে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণ তৈরি করে ফেললেন—তা এক অভাবনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। শোধরানো নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সহ বায়ুযান উড়বে ত্রিবান্দ্রম থেকে এবং একাদশ দিনে ITR-এর কাছাকাছি নেমে আসবে। এবার আবার অন্য আর এক উপসর্গ—বিপর্যস্ত আবহাওয়ার অবস্থা উড়ানে বাদ সাধল। ঝড়ের তাণ্ডবের শাসানি আমাদের একরকম আচ্ছন্ন করে রাখল। উচ্চ-কম্পাঙ্ক সংযোগ (HF Links) ও উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছিল। দশ মিনিট অন্তর অন্তর আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর প্রচার করা হতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত উৎক্ষেপণের জন্যে নির্দিষ্ট হল ২২ মে ১৯৮৯। আগের দিন রাত্রে ড. অরুণাচলম, জেনারেল কে. এন. সিং ও আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে. সি. পন্থের সঙ্গে পায়চারি করছিলাম। শ্রীপন্থ ITR-এ এসেছিলেন এই উৎক্ষেপণের সাক্ষী হতে। সে-রাত ছিল পূর্ণিমার রাত। সমুদ্রে জোয়ার এসেছিল, আমরা ঢেউয়ের গর্জন শুনছিলাম, ঠিক যেন ঈশ্বরের মহিমা ও ক্ষমতার গান। কালকের উৎক্ষেপণ কি আমাদের সফল হবে? সকলের মনে সেই প্রশ্ন, কিন্তু সেই অপূর্ব রাত্রির মোহাবিষ্টতা ভাঙতে আমরা কেউই চাইছিলাম না। অনেকক্ষণ নীরবতার পরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কালাম, আগামী কাল অগ্নির সাফল্যের জন্যে উৎসব আমাকে কী ভাবে করতে বলেন?" সহজ প্রশ্ন, কিন্তু তার উত্তর আমি চট করে দিতে পারলাম না। আমার কী চাই? কী আমার নেই? কিসে আমি আরও খুশি হব? তখনই উত্তরটা আমার মনে এল: "আমরা ১,০০,০০০ গাছের চারা চাই RCI-এ লাগাবার জন্যে।" তাঁর মুখ প্রীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "আপনি অগ্নি-র জন্য মাতা বসুন্ধরার আশীর্বাদ চাইছেন," প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কে. সি. পন্থ বলে উঠলেন, "কাল আমরা সফল হব।"

পরদিন সকাল ৭:১০ মিনিটে "অগ্নি" ভূমি ত্যাগ করল। ঠিক যেমনটি যাওয়া উচিত, সেই পথ ধরল। উড়ানের সমস্ত যন্ত্র ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক ঠিক কাজটি করে চলেছে। মনে হল এক দুঃস্বপ্নের রাত্রির অবসানে সুন্দর প্রভাত দেখা দিয়েছে। একটি বহুমুখী কর্মকেন্দ্রে পাঁচ বছর ধরে একটানা কাজ করার পর আমরা উৎক্ষেপণ মঞ্চে পৌঁছেছিলাম। গত পাঁচটি সপ্তাহ আমাদের কেটেছে শরশয্যার উপর। চারদিক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপ এসেছে সব কিছু বন্ধ করে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পেরেছি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের সেটি অন্যতম। মোটে ৬০০ সেকেন্ডের একটি সুন্দর উড়ান মুহূর্তে আমাদের সব ক্লান্তি মুছে দিল। ভালবাসার শ্রমের কী সুন্দর পরিণাম। আমি পরদিন আমার ডায়েরিতে লিখলাম:

আকাশের পানে চালিত করার এক বস্তু,
কিংবা অশুভ শক্তির প্রতিরোধ হিসাবে
"অগ্নি"-র দিকে তাকিয়ে দেখো না।
এ হল এক ভারতীয় হৃদয়ের স্ফুলিঙ্গ,
না, ক্ষেপণাস্ত্রের রূপেও একে ভেবো না।
এ যেন ঘিরে আছে জাতির জ্বলন্ত গৌরবকে
আর সেই-ই তার একমাত্র উজ্জ্বলতা।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বললেন, "আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা আমাদের স্বনির্ভর প্রচেষ্টায় সুরক্ষিত রাখবার পথে একটি মস্ত বড় সাফল্য হল অগ্নি। আমরা স্বদেশে নিজেদের দেশের সুরক্ষার জন্যে যে উচ্চ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে চাই, অগ্নি তারই প্রতিফলন।" আমাকে তিনি বললেন, আপনাদের প্রচেষ্টার জন্যে দেশ গর্বিত। রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমন "অগ্নি"কে দেখলেন, তাঁর স্বপ্নের বাস্তবরূপ হিসাবে। সিমলা থেকে তিনি টেলিগ্রাম করলেন, "আপনাদের আত্মনিবেদন, কঠোর পরিশ্রম, আর প্রতিভা এতে সম্মানিত হল।"

এই প্রযুক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে অনেক অসত্য, অনেক ভুল তথ্য স্বার্থান্বেষী মহল প্রচার করেছে। "অগ্নি"-কে কখনও অস্ত্র হিসাবে আমরা দেখিনি। এর দ্বারা আমরা দূরে অ-পারমাণবিক অস্ত্র সঠিক জায়গায় নিক্ষেপ করবার সামর্থ্য অর্জন করেছি। 'অগ্নি" যে আমাদেরকে অ-পারমাণবিক বিকল্প দিয়েছে, সমসাময়িক সামরিক নীতিতে সেইটাই অতিশয় প্রাসঙ্গিক।

একটি সুপরিচিত মার্কিন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে "অগ্নি"র পরীক্ষা উৎক্ষেপণের ফলে সমধিক ক্রোধের সঞ্চয় হয়েছে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে কংগ্রেস সদস্যরা হুমকি দিয়েছেন ভারতে সমস্ত রকম ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত প্রযুক্তি পাঠানো বন্ধ করে দেবেন এবং বহুজাতিক সাহায্যও বন্ধ করবেন।

একজন তথাকথিত ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র বিশেষজ্ঞ গ্যারি মিলহোলিন *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে* বলেছেন, ভারত "অগ্নি" নির্মাণ করেছে পশ্চিম জার্মানির সাহায্যে। খুব

একচোট হেসে নিলাম যখন পড়লাম German Aerospace Research Establishment (DLR) "অগ্নি"র দূর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রথম পর্যায়ের রকেট এবং একটি composite নাসিকাগ্র তৈরি করে দিয়েছে, এবং অগ্নির বায়ুগতির মডেল পরীক্ষা করা হয়েছে DLR-এর বায়ু-সুড়ঙ্গে। DLR তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করল, এবং তারা আবার অনুমান করল, "অগ্নি"-কে সহায়ক বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা দিয়েছে ফ্রান্স। আমেরিকার সেনেটর জেফ বিংম্যান এতদূরও বললেন যে, ১৯৬২ সালে ওয়ালপ'স দ্বীপে চারমাস থাকবার সময়ে "অগ্নি"র জন্যে সব কিছু প্রয়োজনীয় সবই আমি শিখে নিয়েছি। ওয়ালপ'স দ্বীপে যে আমি ছিলাম পঁচিশ বছরেরও বেশি আগে, এবং "অগ্নি"তে ব্যবহৃত প্রযুক্তি তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছিল সম্পূর্ণ অজানা, সে কথা আর তিনি উল্লেখ করলেন না।

আজকের দুনিয়ায় প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা মানেই দাসত্ব। আমাদের স্বাধীনতা এই ভাবে খর্ব হতে কি আমরা দিতে পারি? এই রকম বিপদ থেকে আমাদের দেশের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের যে পূর্বপুরুষেরা সাম্রাজ্যবাদ থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা যে দায়িত্ব পেয়েছি, তার প্রতি কি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব? একমাত্র তখনই আমরা আমাদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে পারব, যখন আমরা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হব।

"অগ্নি"র উৎক্ষেপণের আগে পর্যন্ত আমাদের জাতীয় ঐক্য রক্ষা করবার জন্যে, আমাদের নিকটস্থ দেশগুলির যে অস্থিরতা তার থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে বাঁচাবার জন্যে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যাতে আক্রমণকারীর পক্ষে অতিমাত্রায় দুর্মূল্য হয়, সেটা সুনিশ্চিত করবার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে কেবলমাত্র রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করবার মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। "অগ্নি" উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে এমন যুদ্ধ সে নিবারণ করতে পারবে।

'অগ্নি'র সঙ্গে সঙ্গে IGMDP-র পাঁচ বছর পূর্ণ হল। "পৃথ্বী" এবং "ত্রিশূল"-এর পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণের পর "নাগ" এবং "আকাশ" আমাদেরকে সামর্থ্যের যে জায়গায় নিয়ে এল, সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সামান্যই ছিল কিংবা একেবারেই ছিল না। এই দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে এমন কিছু যা বড় বড় প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ সম্ভব করবে। এখন প্রয়োজন, এই ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টার দিকে আরও গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

১৯৮৯-এর সেপ্টেম্বরে মুম্বাই-এর মহারাষ্ট্র অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জওহরলাল নেহরু স্মৃতি বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করল। আমি সেই সুযোগে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের আমার স্বদেশি আকাশ-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র "অস্ত্র"-র পরিকল্পনার কথা বললাম, ভারতীয় হালকা যুদ্ধবিমান তৈরির [Indian Light Contral Aircraft (LCA)] সঙ্গে সেটা খাপ খাইয়ে দেওয়া হবে। আমি তাদের বললাম, ইমেজিং ইনফ্রা রেড (Imaging Infra Red) (IIR) এবং মিলিমেট্রিক ওয়েভ (MMW) রাডার প্রযুক্তি, "নাগ" ক্ষেপণাস্ত্রে আমরা যা ব্যবহার করেছি, তা আমাদেরকে তা আন্তর্জাতিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম সারিতে নিয়ে গেছে। পুনঃপ্রবেশ (re-entry) প্রযুক্তিতে কর্তৃত্বের ভূমিকা পালনে কার্বন-কার্বন ও অন্যান্য উন্নততর মিশ্রিত উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়েও আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। প্রযুক্তিগত অনুন্নতি থেকে ভারত যখন মুক্তি পেতে চাইল এবং সেইসঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলির কাছে ধামাধরা মনোভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যার শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টারই সফল পরিণতি "অগ্নি"।

১৯৮৮-র সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে "পৃথ্বী"-র দ্বিতীয় উড়ানও সম্পূর্ণ সফল হল। আজকের পৃথিবীতে 'পৃথ্বী'ই যে শ্রেষ্ঠ ভূমি-থেকে-ভূমি ক্ষেপণাস্ত্র, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। ১০০০ কেজি যুদ্ধাস্ত্র সে ২৫০ কিমি দূরে নিয়ে যেতে পারে, এবং ৫০মি ব্যাসার্ধ পরিমাণ লক্ষ্যস্থলে ফেলতে পারে। নকশার কাজে, স্থাপনে, সব দিক থেকে এটি পুরোপুরি স্বদেশি। বহুসংখ্যায় এগুলি নির্মাণ করা যেতে পারে কারণ BDL-এ উৎপাদনের ব্যবস্থারও একই সঙ্গে প্রসার করা হয়েছে ও কম্পিউটারের সাহায্যে পরিচালিত, প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র বহন এবং নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে পারার মতো দ্বিবিধ ক্ষমতাসম্পন্ন "পৃথ্বী" স্বল্পসময়েই পাল্টে দিতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা। স্থলবাহিনী এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বুঝতে দেরি করেনি, এবং CCPA-কে "পৃথ্বী" এবং "ত্রিশূল"-এর জন্যে বরাত দিয়েছে, যা আগে কোনও দিন হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পর্ব

মনন

[১৯৯১ -]

আমি সৃষ্টি করি, ধ্বংস করি, আবার
সৃষ্টি করি নতুন রূপ, যার কথা কেউ জানে না।

অল্-ওক্যুইয়াহ্
কোরান ৫৬ : ৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

১৯৯০-এর প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশ তার ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের সাফল্য সহর্ষে উদযাপন করল। ড. অরুণাচলমকে এবং আমাকে 'পদ্মবিভূষণ' প্রদান করা হল। 'পদ্মশ্রী' দিয়ে সম্মানিত হলেন আমার দু-জন সহকর্মীও, জে. সি. ভট্টাচার্য এবং আর. এন. আগরওয়াল। ভারতের ইতিহাসে সেই প্রথম একই সংস্থার এত জন বিজ্ঞানী সম্মান প্রাপকদের তালিকায় এলেন। এক দশক আগে 'পদ্মভূষণ' প্রাপ্তির স্মৃতি আমার মনে আবার জাগরুক হল। তখন আমার জীবনযাত্রা যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। বাস করি দশ ফুট চওড়া, বারো ফুট লম্বা একটি ঘরে, তার সাজসজ্জা বলতে আমার বই, কাগজপত্র আর কয়েকটি ভাড়া-করা আসবাব। তখন আমার ঘর ছিল ত্রিবান্দ্রমে, এখন হায়দ্রাবাদে। মেসের বেয়ারা আমাকে ইডলি আর মাখন তোলা দুধ দিতে এসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেইভাবেই সে আমাকে সম্মান-প্রাপ্তির জন্যে অভিনন্দিত করল। আমার দেশের লোক আমাকে যে স্বীকৃত দান করেছে, সেটা আমার অন্তর স্পর্শ করল। বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার প্রথম সুযোগেই দেশ ছেড়ে চলে যান, বিদেশে অর্থ উপার্জনের জন্যে। এ কথা ঠিক, বিদেশে তাঁরা অবশ্যই বেশি অর্থ উপার্জন করেন, তবে নিজের দেশের লোকের কাছ থেকে ভালবাসা ও সম্মান পাওয়া, তার দাম কি অন্য কিছুতে দিতে পারে?

একাকী বসে এক মনে অনেকক্ষণ ধ্যান করলাম। কত কথা মনে পড়ল। রামেশ্বরমের সমুদ্রতীরের বালি আর ঝিনুক, রামনাথপুরমে ইয়াদুরাই সলোমনের যত্ন, ত্রিচিতে রেভারেন্ড ফাদার সেক্যুইয়েরার এবং মাদ্রাজে অধ্যাপক পান্ডালাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথপ্রদর্শন, বাঙ্গালোরে ড. মেডিরাট্টার উৎসাহ প্রদান, অধ্যাপক মেননের সঙ্গে হোভারক্রাফটে আরোহণ, অধ্যাপক সারাভাইয়ের সঙ্গে প্রাক-প্রত্যুষ টিলপট অঞ্চল (Range) পরিদর্শন, SLV-3-র ব্যর্থতার দিনে ড. ব্রহ্মপ্রকাশের সান্ত্বনা, SLV-3 উৎক্ষেপণের দিন দেশব্যাপী উৎসব, শ্রীমতী গান্ধীর প্রসন্নতার হাসি, SLV-3-র পরে VSSC-তে চাপা অস্থিরতা, DRDO-তে ড. রামান্নার আমাকে আহ্বান করা এবং তদ্দ্বারা আমার ওপর বিশ্বাসের প্রকাশ, IGMDP, RCI সৃষ্টি, "পৃথ্বী", "অগ্নি"...নানা স্মৃতির একটা ঝোড়ো হাওয়া আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সে-সব মানুষ এখন কোথায়? আমার বাবা, অধ্যাপক সারাভাই, ড. ব্রহ্মপ্রকাশ? তাঁদের সঙ্গে কি আমার দেখা হবে? আমার আনন্দের ভাগ কি তাঁদের দিতে পারব? সেই অর্ধ-চেতন ধ্যানস্থ অবস্থায় আমার সত্তা যেন দু-ভাগ হয়ে গেল, স্বর্গের সন্তান এবং মর্ত্যের মানুষ। পিতৃ-রূপে স্বর্গ এবং মাতৃ-রূপে মর্ত্য আমাকে জড়িয়ে ধরল, অনেক দিনের হারানো ছেলেকে বাবা-মা যেমন জড়িয়ে ধরে। আমার ডায়রিতে খসখস করে লিখে গেলাম:

দূর হও, যত বৃথা চিন্তা, আমার
চিত্তকে উত্যক্ত কোরো না!
আমার নিদ্রাহীন রাত্রি, আমার ব্যস্ত দিবস
কাজেই নিয়োজিত ছিল, যদিও রামেশ্বরমের
তটভূমি আমার স্বপ্নে ফিরে আসত।

AMARBOI.COM

দু -সপ্তাহ পরে আয়ার এবং তাঁর টিম ক্ষেপণাস্ত্রের জন্যে সম্মান প্রাপ্তির উৎসব পালন করলেন, "নাগ"-এর প্রথম উৎক্ষেপণ দিয়ে। পরের দিনই তাঁরা আবার তাই করলেন। প্রথম ভারতীয় all composite airframe এবং propulsion system-এর এইভাবে দু-বার পরীক্ষা হল। ভারতীয় thermal battery-র গুণও এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল।

পাল্টা আঘাতের ক্ষমতাধারী ভারত এখন তৃতীয় প্রজন্মের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা-সম্পন্ন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী—যার জন্যে সে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থার অধিকারী অন্যান্য দেশের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত। আসলে দেশজ মিশ্র প্রযুক্তি এক বড় মাইলফলক অতিক্রম করতে পারল। "নাগ"-এর সাফল্য সহযোগিতামূলক মনোভাবের ধারণাকেও একটা দৃঢ়তা দান করেছে—যার ফলে "অগ্নি"-র সফল বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

"নাগ"-এ ব্যবহৃত দুটি মূল প্রযুক্তি—একটি ইমেজিং ইনফ্রা রেড (IIR) ব্যবস্থা

এবং তার নিয়ন্ত্রক চক্ষু হিসেবে একটি মিলেমেট্রিক ওয়েভ (MMW) seeker রাডার। দেশের কোনও ল্যাবরেটরির এই ধরনের অত্যন্ত উচ্চ উন্নততর ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর মতো যোগ্যতা নেই। কিন্তু সবার মধ্যে সাফল্যের আকাঙ্ক্ষাটুকু ছিল প্রবলভাবে—যার ফল এই অত্যন্ত কার্যকর এক যৌথ প্রচেষ্টা। চন্ডীগড়ের সেমি কন্ডাক্টর কমপ্লেক্স চার্জড কাপল্ড ডিভাইসেস (CCD) এর বিন্যাসের বিকাশ ঘটিয়েছে। দিল্লির সলিড ফিজিক্স ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিল মিল-খাওয়া মার্কারি-ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড (MCT) নির্ধারক। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান কেন্দ্র (DSC) জুল-টমসন নীতির ওপর ভিত্তি করে একটি দেশজ শীতলীকরণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়েছিল। দেরাদুনের প্রতিরক্ষা বৈদ্যুতিন প্রয়োগ ল্যাবরেটরি (DEAL) ট্রান্সমিটার গ্রাহকযন্ত্রের অগ্রভাগের শেষাংশের বিকাশ ঘটায়।

বিশেষ গ্যালিয়ম আর্সেনাইড গান (gun), সকেটি বেরিয়ার কম্পোজিট ডায়োড, অ্যান্টেনা ব্যবস্থার জন্যে কম্পাক্ট কম্পারেটর উচ্চ-প্রযুক্তির যে কোনও একটি যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু উদ্ভাবন তো কারও ক্ষেত্রে অভিশাপ হতে পারে না, বা এর ওপরেও তো বিধি-নিষেধ চাপানো যায় না।

AMARBOI.COM

সেই মাসেই আমি মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম সমাবর্তন ভাষণ দিতে। মাদুরাই পৌঁছে আমি আমার হাইস্কুল শিক্ষক ইয়াদুরাই সলোমনের খোঁজ করলাম। তিনি তখন রেভারেন্ড, ৮০ বছর বয়স। শুনলাম মাদুরাইয়ের এক শহরতলীতে তিনি থাকেন। ট্যাক্সি নিয়ে তাঁর বাড়ি খুঁজতে বেরোলাম। রেভারেন্ড সলোমন জানতেন আমি সেদিন সমাবর্তন ভাষণ দেব। কিন্তু তাঁর সেখানে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। শিক্ষক-ছাত্রের এক ভাবাবেগপূর্ণ পুনর্মিলন হল। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল ড. পি. সি. আলেকজান্ডার, যিনি সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন, সেই বৃদ্ধ শিক্ষক, তার অত দিন আগেকার ছাত্রকে ভুলে যাননি দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁকে তিনি মঞ্চে এসে বসতে অনুরোধ করলেন।

"প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সমাবর্তন যেন প্রাণশক্তির এক বিপুল জোয়ারের মুখে বাঁধ খুলে দেয়। সেই জোয়ারকে যখন নানা প্রতিষ্ঠানে, সংগঠনে, শিল্পে সংবৃত করে ঠিকভাবে পরিচালিত করে কাজে লাগানো হয়, তা তখন জাতি-গঠনে সহায়তা করে", আমি তরুণ স্নাতকদের বললাম। আমার যেন মনে হল প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগে রেভারেন্ড সলোমন আমাকে যা বলেছিলেন, আমি তার প্রতিধ্বনি করছি। ভাষণের পর আমি আমার শিক্ষককে নত হয়ে বন্দনা করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেভা. সলোমনকে আমি বললাম, "বড় স্বপ্নদর্শীর বড় স্বপ্ন চিরদিনই আমরা পেরিয়ে যাই।" আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আমায় বললেন, "তুমি আমার সমস্ত লক্ষ্য শুধু যে জয় করেছ, কালাম, তাই নয়, তুমি তার চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ।"

পরের মাসে আমি ত্রিচিতে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে সেন্ট জোসেফ কলেজে গেলাম। সেখানে রেভারেন্ড ফাদার সেক্যুইয়েরা, রেভারেন্ড ফাদার এরহারট, অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্যম, অধ্যাপক ইয়ামপেরুমল কোনার, কিংবা অধ্যাপক তোতাদ্রি আয়েঙ্গারকে সেখানে দেখতে পেলাম না, কিন্তু আমার মনে হল, সেন্ট জোসেফ কলেজ ভবনের প্রত্যেক পাথর যেন সেই সব মহৎ প্রাণের প্রজ্ঞার ছাপ বুকে ধরে রেখেছে। আমি তরুণ ছাত্রদের সামনে আমার সেন্ট জোসেফ-এর স্মৃতিচারণ করলাম এবং যে সব শিক্ষক আমাকে গড়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

দেশের ৪৪তম স্বাধীনতা দিবস আমরা উদযাপন করলাম "আকাশ"-এর পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ করে। কম্পোজিট মডিফায়েড ডাবল বেস প্রপেলান্ট-এর ওপর ভিত্তি করে প্রহ্লাদ এবং তাঁর টিম একটি নতুন সলিড প্রপেলান্ট বুস্টার ব্যবস্থার রূপদান করলেন। অস্বাভাবিক উচ্চ শক্তির ধর্ম-বিশিষ্ট এই প্রপেলান্ট দূরপাল্লার ভূমি-থেকে-আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে আশ্বস্ত করল আমাদের। শত্রু আঘাত হানতে পারে এমন সব এলাকায় ভূমি-কেন্দ্রিক আকাশ পথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেশ এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করল।

১৯৯০-এর শেষভাগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন-উৎসবে আমাকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি সম্মান দান করল। সেই সমাবর্তনে আরেক জন যিনি সম্মানিত হলেন, সেই প্রবাদ-প্রতিম ড. নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে আমার নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়াতে আমি একটু বিব্রত বোধ করলাম। ড. ম্যান্ডেলার সঙ্গে আমার মিল কোথায়? বোধ হয় নিজের জীবনের ব্রতে সংসক্ত থাকায়। আমার যে জীবনের ব্রত, দেশে রকেট-প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু, তাঁর বিপুল সংখ্যক মানুষকে মানবোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতের তুলনায় আমার হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের ভাবাবেগের তীব্রতায় কোনও পার্থক্য ছিল না। আমার তরুণ শ্রোতৃবৃন্দকে আমি এই পরামর্শ দিলাম: "সত্যিকারের বড় কাজে নিজেকে উৎসর্গ করো, যে সুখ দ্রুত লভ্য, কিন্তু কৃত্রিম, তার পিছনে দৌড়িও না।"

১৯৯১ সালকে ক্ষেপণাস্ত্র পর্ষদ DRDL ও RCI এর জন্যে 'উদ্যোগ গ্রহণের বছর' হিসাবে ঘোষণা করলে, IGMDP-তে আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন করব বলে ঠিক করলাম, আমাদের সে নির্বাচিত পথটি বড় সহজ ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পৃথ্বী" এবং "ত্রিশূল"-এর বিকাশ-এর পরীক্ষাগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর, আমি আমার সহকর্মীদের বললাম, সেই বছরের মধ্যেই সেগুলির ব্যবহারের পরীক্ষা আরম্ভ করতে, যদিও আমি জানতাম কাজটা সহজ হবে না, কিন্তু আমরা নিরস্ত হলাম না।

রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহন অবসর নিলেন। তাঁর সহকারী, কাপুর তার জায়গায় "ত্রিশূল"-এর দায়িত্বে আসবেন। মোহন ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপারটা যে রকম বুঝতেন আমি তার খুবই তারিফ করতাম। এই বিষয়টিতে সেই নাবিক শিক্ষক-বিজ্ঞানী দেশের অন্য যে কোনও বিজ্ঞানীর ওপর টেক্কা দিতে পারতেন। "ত্রিশূল" নিয়ে আমাদের যে সব বৈঠক হত, তাতে Command Line of Sight (CLOS) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর অকপট ব্যাখ্যা আমার চিরদিন মনে থাকবে। একবার তিনি তাঁর লেখা একটি কবিতা এনে দিলেন। কবিতাটিতে আছে IGMDP-র ডিরেকটরের নানাবিধ দুঃখ কষ্টের কথা। মনের ভার লাঘব করার সে একটি মন্দ উপায় নয়:

অসম্ভব কর্মসূচি, তার সঙ্গে আবার
PERT চার্ট আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।
তার ওপরে MC-র সমান প্রেজেন্টেশন।
তাতে কোনও কিছুর সমাধান হয় কী না ঈশ্বরই জানেন।
ছুটির দিনে মিটিং এমনকী রাত্রেও
পরিবার তিতিবিরক্ত, তাদের যুদ্ধং দেহি ভাব।

আমার হাত নিশপিশ করছে
মাথার চুল ছিঁড়বার জন্যে—
কিন্তু হায়! মাথায় চুল কোথায়!

আমি তাঁকে বললাম, "আমার যে সব সমস্যা তার সবই আমি DRDL, RCI এবং অন্য যে সব ল্যাবরেটরি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে তাদের দিয়ে দিয়েছি। তার ফলে আমার মাথায় চুল বেশ ভালই গজিয়েছে।"

১৯৯১ শুরু হল ঘোর অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগিয়ে। ১৫ জানুয়ারি রাত্রে ইরাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। সে সময়ে ভারতের আকাশে উপগ্রহ-দূরদর্শনের প্রবল উপস্থিতির কল্যাণে সমগ্র জাতি দেখল রকেট আর ক্ষেপণাস্ত্রের কেরামতি, আর সে-সব দেখে তাদের কল্পনাশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশমার্গে ধাবমান হল। কফি হাউসে, চায়ের দোকানে "স্কাড"-এর, "পেট্রিয়ট"-এর কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। ছেলেমেয়েরা ক্ষেপণাস্ত্রের আকারের কাগজের ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, আমেরিকার টেলিভিশন নেটওয়ার্কে যা দেখছে তার দেখাদেখি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে! উপসাগরীয় যুদ্ধ চলার সময়ে "ত্রিশূল" এবং 'পৃথ্বী"-র সফল উৎক্ষেপণ জাতিকে ভরসা দিল। মাইক্রোওয়েভ কম্পাংক বিশিষ্ট এবং বাধার সৃষ্টি না-করতে পারে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যান্ড ব্যবহারকারী "পৃথ্বী" ও "ত্রিশূল", নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রোগ্রামেবল ট্রাজেকটরির ক্ষমতাসম্পন্নতার কথা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ার ফলে চারদিকে ভীতির সঞ্চার ঘটল। অবশ্য দেশ খুব দ্রুত উপসাগরীয় যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র বহনকারী যানের মধ্যে সমান্তরাল দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করল। অনেকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, "পৃথ্বী" কি "স্কাড"-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট? "আকাশ" কি "পেট্রিয়ট"-এর মতো কাজ করতে পারবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি যখন বলতাম, "হ্যাঁ পারবে।" "কেন পারবে না?" লোকের মন গর্বে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

মিত্রশক্তির একটা মস্ত বড় সুবিধা ছিল প্রযুক্তিতে। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়োজিত করেছিল আশি এবং নব্বই দশকের প্রযুক্তি, আর ইরাক যুদ্ধ করছিল বেশির ভাগই ষাট-সত্তর দশকের প্রায়-অচল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

এখন, আধুনিক জগতের চাবিকাঠিটি আছে ওইখানেই—প্রযুক্তির জোরে প্রাধান্য। যে তোমার প্রতিপক্ষ, কিংবা তোমার প্রতিপক্ষ হতে পারে সে যেন প্রযুক্তি হাতে না পায়, তারপর অসম যুদ্ধে তোমার কথা সে মানতে বাধ্য। ২০০০ বছরেরও বেশি দিন আগে চীনা যুদ্ধ-দার্শনিক সান জু যখন বলেছিলেন, যুদ্ধে শত্রুকে শারীরিকভাবে খতম করাই বড় কথা নয়, তার মনোবল ভেঙে দেওয়াই আসল কথা। যাতে মনে মনে সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। এ কথা তিনি যখন বলেছিলেন, মনে হয় বিংশ শতাব্দীর রণাঙ্গনে প্রযুক্তির প্রাধান্য তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। উপসাগরীয় যুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র-শক্তি এবং বৈদ্যুতিন-যুদ্ধ মিলে সমরকৌশল বিশেষজ্ঞদের জন্যে এক মহাভোজের আয়োজন করেছিল। একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধক্ষেত্রের যবনিকা তখন উন্মোচিত হবে, যে যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নেবে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত যুদ্ধাস্ত্র।

ভারতে আজও প্রযুক্তি বলতে অধিকাংশ লোক বোঝে কল-কারখানার ধোঁয়া, কলকব্জার খটখটানি। আসলে প্রযুক্তি শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে এতে যথেষ্ট ধারণা হয় না। মধ্যযুগে ঘোড়ার জোয়াল (collar) আবিষ্কারের ফলে কৃষিকাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল। তার কয়েক শতাব্দী পরে বিসিমার (Bessemer) চুল্লীর আবিষ্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন প্রযুক্তিতে এক অগ্রগতি, সেও তেমনি ছিল। তা ছাড়া প্রযুক্তি, বা টেকনলজি বলতে শুধু যন্ত্রপাতি বোঝায় না, কলা-কৌশল বা টেকনিক-ও বোঝায়। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া কী করে ঘটানো হবে, মাছের চাষ কী করে হবে, আগাছা নির্মূল করা, থিয়েটারের আলোকসম্পাত, রোগীর চিকিৎসা, ইতিহাস শেখানো, যুদ্ধ করা, এমনকী যুদ্ধ নিবারণ করা, সবই তার মধ্যে পড়ে।

আজকের দিনে অধিকাংশ প্রাগ্রসর, প্রযুক্তিগত রীতি-পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় কল-কারখানা ইত্যাদি থেকে অনেক দূরে। ইলেকট্রনিক্স-এ, মহাকাশ প্রযুক্তিতে, অধিকাংশ নতুন শিল্পে আওয়াজ কম, পরিচ্ছন্নতা বেশি থাকাটাই নিয়ম, কিংবা বলা উচিত থাকতেই হবে। যাকে বলে সমবেত-রেখা অর্থাৎ এক ছাতের নীচে জড়ো হওয়া, যেখানে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, সেটা আজকাল অতীতকালের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তি যাকে বলে তার নিজের মধ্যেই যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে ফেলতে হবে। ভুললে চলবে না, প্রযুক্তি থেকেই প্রযুক্তি তার নিজের রসদ সংগ্রহ করে। প্রযুক্তিই অধিকতর প্রযুক্তি সম্ভব করে। বস্তুত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে তিনটি পর্যায় মিলে একটি বৃত্ত তৈরি হয়, সে বৃত্ত নিজেকেই নিজে এগিয়ে নিয়ে চলে। প্রথমে সৃজনশীলতার পর্যায়, যাতে সম্ভবপর কোনও ধারণার নকশা প্রস্তুত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে এটি বাস্তব রূপ ধারণ করে, এবং তারপরে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। তখন বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল। নতুন ধারণা সম্বলিত প্রযুক্তির আবার তখন পালা আসে নতুন সৃজনাত্মক ধারণার জন্ম দেওয়ার। আজ, সমগ্র উন্নত পৃথিবীতে এই বৃত্তের দুটি পদক্ষেপের মধ্যে অতিবাহিত কাল সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ভারতে আমরা সবে সেই অবস্থার দিকে এগোতে আরম্ভ করেছি।

উপসাগরীয় যুদ্ধ যখন প্রযুক্তিতে উন্নততর মিত্রশক্তি সমূহের জয়ে সমাপ্ত হল, DRDL এবং RCI-এর ৫০০-র অধিক বিজ্ঞানী সেই যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যে মিলিত হলেন। আমি সভা শুরুর আগেই একটি প্রশ্ন রাখলাম, প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রে অন্য দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন কি সম্ভব? তা যদি হয়, তার জন্যে কি চেষ্টা করা উচিত? আলোচনা থেকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেরিয়ে এল; যেমন, যুদ্ধে কার্যকরভাবে বৈদ্যুতিন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়? LCA-এর মতো সমপরিমাণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খুবই দ্রুততার সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়; আর কোন কোনটি হতে পারে সেই মূল জায়গা যেখানে ধাক্কা দিলে প্রগতি আপনিই হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন ঘণ্টা ব্যাপী জোরালো আলোচনার পর সবাই সহমত হলেন যে, সামরিক বলের অসামঞ্জস্য দূর করা সম্ভব নয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষমতায় প্রতিপক্ষের সমকক্ষ না হতে পারলে। বছরের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা সংকল্প করলেন "পৃথ্বী"-র উৎক্ষেপণ নির্ভুলভাবে করার জন্যে CEP-কমাতে পারার ক্ষমতা, "ত্রিশূলে"র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথ করতে ka ব্যান্ড সংযোজনা এবং "অগ্নি"র বহির-আবরণে সমস্ত কার্বন-কার্বন পুনঃপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। কিছুকাল পরে তাদের সেই সংকল্প সার্থক হয়েছিল। ওই একই বছরে দেখা গেল টিউব থেকে উৎক্ষেপিত "নাগ" উড়ান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত মিটার ওপর দিয়ে শব্দের চেয়ে তিনগুণ গতিতে "ত্রিশূল"-এর পরিচালনা কৌশল। এই শেষোক্ত ঘটনাটি জাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা সমুদ্রে ভাসমান বস্তু বিধ্বংসী দেশজ ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অগ্রগতি।

সেই বছর আমি IIT বোম্বাই থেকে সাম্মানিক ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি পেলাম। সে উপলক্ষে প্রদত্ত বিবরণে অধ্যাপক বি. নাগ আমার সম্পর্কে একবিংশ শতাব্দীর নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে বললেন, "এঁরই প্রেরণায় মজবুত প্রযুক্তিগত ভিত্তিভূমিটি স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে ভবিষ্যতে মহাকাশ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হবে।" অবশ্য অধ্যাপক নাগ অতিশয় সৌজন্যের পরিচয় দিলেন, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যখন ভারত আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবে, তার থাকবে মহাকাশে ৩৬,০০০ কিমি দূরের কক্ষপথে স্থাপিত নিজস্ব উপগ্রহ—তার নিজস্ব প্রক্ষেপণ বাহন দ্বারা উপনীত। এবং ভারত হবে ক্ষেপণাস্ত্র-সজ্জিত শক্তি। প্রচণ্ড ভারতের জীবনীশক্তি। সে যে কী করতে পারে, কী হতে পারে, পৃথিবী হয়তো এখনও তা জানে না, কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করবে এমন ক্ষমতা এখন কারও নেই।

১৫ অক্টোবর আমার ষাট বছর পূর্ণ হল। আমি অবসর গ্রহণের প্রতীক্ষা করছি, ভেবে রেখেছি আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত, অথচ মেধাসম্পন্ন, এমন ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় খুলব। আমার বন্ধু অধ্যাপক পি. রামা রাও, যিনি ছিলেন ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ (Department of Science and Technology)-এর প্রধান, আমার সঙ্গে একটি অংশীদারী ব্যবস্থায় এলেন—একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, যার নাম তিনি প্রস্তাব করলেন, রাও-কালাম স্কুল। একটা বিষয়ে আমরা দু-জন একমত ছিলাম যে, লক্ষ্য পূরণ করা, অগ্রগতির পথে এক-একটা মাইল-ফলক পেরিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি দিয়ে যতই তাক লাগানো যাক, এ সবই জীবনের সব নয়। কিন্তু সে পরিকল্পনা আমাদের ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হল, কেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত সরকার আমাদের কাউকেই ছাড়ল না।

এই সময়েই আমি ঠিক করলাম আমার যে সব স্মৃতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমার বক্তব্য ও মতামত, লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ভারতের যুবসমাজের সব চাইতে বড় ঘাটতি, আমার মনে হল, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব। তখনই আমি মনস্থ করলাম, যে সমস্ত অবস্থা এবং যে সব ব্যক্তি, আমি এখন যা হয়েছি তার জন্যে দায়ী, তাদের কথা লিখে রাখব। এ শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে নয়, কিংবা আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর আলোক সম্পাতের উদ্দেশ্যে নয়। আমি যা বলতে চাইছিলাম তা হল একজন যতই দরিদ্র হোক, বঞ্চিত হোক, সামান্য হোক, জীবন সম্পর্কে তার হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই, নানাবিধ সমস্যা জীবনেরই অঙ্গ। দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সাফল্য আসে না। একজন যেমন বলেছেন:

ঈশ্বর এমন কথা দেননি
যে আকাশ সর্বদা নীল হবে,
সারা জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে।
ঈশ্বর কথা দেননি সর্বদা রোদ থাকবে,
বৃষ্টি কখনও পড়বে না।

AMARBOI.COM

এ কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই যে, আমার জীবন কারও অনুসরণ করবার মতো আদর্শ, কিন্তু নিয়তি আমার জীবনকে যেভাবে গড়েছে, তা দেখে কোনও অখ্যাত নগণ্য গ্রামের বঞ্চিত সমাজের দরিদ্র সন্তান হয়তো আশ্বাস লাভ করতে পারে, ভরসা পেতে পারে। তাদের অনগ্রসরতা, তাদের হতাশ্বাসের দাসত্বের দুঃস্বপ্ন থেকে তারা হয়তো মুক্তি লাভ করতে পারে। এখন তারা যাই হোক না কেন, তাদের মনে রাখতে হবে ঈশ্বর তাদের সঙ্গেই আছেন এবং তিনি যখন তাদের পাশে, তখন তাদের শত্রু হয়ে কে দাঁড়াবে?

তবে ঈশ্বর কথা দিয়েছেন,
দিনের কাজের জন্যে শক্তি থাকবে,
পরিশ্রমের পর বিশ্রাম থাকবে,
চলার পথে আলো থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অধিকাংশ ভারতীয় সারাজীবন অকারণে যে দুঃখ ভোগ করে তার কারণ—তারা নিজেদের ভাবাবেগ সামলাতে পারে না। কী একটা মানসিক জাড্য তাদেরকে পঙ্গু করে রাখে। "এ ছাড়া আর কোনও পথ নেই", "যত দিন অবস্থার পরিবর্তন না হচ্ছে..." ইত্যাদি ধরনের কথা আমাদের ব্যবসায়িক কথাবার্তায় প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। চরিত্রের এইসব দৃঢ়মূল বৈশিষ্ট্য, যার আত্মপ্রকাশ ঘটে এইরকম চিন্তা-ভাবনায়, আত্ম-ধিক্কারের ভাবনার মধ্যে দিয়ে, নেতিবাচক কাজকর্মে, তার কথা লিখি না কেন? আমি এমন অনেক ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছি, নিজেদের বিবিধ খর্বতা সম্পর্কে তাঁরা এতই সচেতন যে, নিজেদের কদর বোঝাবার জন্যে তাদের ওপরে লাঠি ঘোরানো ছাড়া তাঁদের আর কোনও উপায় ছিল না। ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে নিজস্ব মার্কা, কিংবা মানুষকে এমন ফাঁদে ফেলা যাতে তাকে কাবু করা যায়, তার কথা লিখি না কেন? লিখি না কেন কোন পথে সংগঠন সাফল্য লাভ করতে পারে? প্রত্যেক ভারতীয়ের মনের মধ্যে আগুন লুকিয়ে আছে। সেই আগুন পক্ষ বিস্তার করুক, এই মহান দেশের দ্যুতিতে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ১৯৯www.amarboi.com ~

১৬

বিজ্ঞানের মতো নয়, প্রযুক্তি হল যৌথ কর্ম। তার নির্ভরতা ব্যক্তির মেধাশক্তির ওপর নয়, অনেকের মেধার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর। আমার মতে নজীরবিহীন দ্রুততায় পাঁচটি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র-শৃঙ্খলা উদ্ভাবনই IGMDP-র সবচেয়ে বড় সাফল্যের পরিচয় নয়, সে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের যে কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট গোষ্ঠী যে গড়ে তুলেছিলেন সেটাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন ভারতীয় রকেট-বিদ্যায় আমার নিজের কী অবদান, আমি বলব, আমি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম যে, তরুণদের বিভিন্ন গোষ্ঠী মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল তাদের ব্রতে।

প্রাথমিক পর্যায়ে একটি গোষ্ঠী বাড়ন্ত বয়সের একটি শিশুর মতো। তখন তারা উত্তেজনাপ্রবণ, প্রাণশক্তিতে, উৎসাহ-উদ্দীপনায়, কৌতূহলে ভরপুর, তখন তারা খুশি করতে, ভাল কাজ করে দেখাতে আগ্রহী। কিন্তু ছোট-ছেলেমেয়েদের বেলায় যেমন, এঁদেরও তাই—বাবা-মার ভুলে এইসব সদ্‌গুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গোষ্ঠী যাতে কৃতকার্য হয়, তার জন্যে প্রয়োজন উদ্ভাবনের সুযোগ। আমি ওরকম অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলাম DTD&P (Air)-এ ISRO-তে, DRDO-তে এবং অন্যত্র কাজ করবার সময়ে, কিন্তু সব সময়ে আমি দেখতাম যেন আমার টিম এমন একটা বাতাবরণ পায়, যাতে উদ্ভাবনের এবং ঝুঁকি নেওয়ার সুযোগ আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম যখন আমরা SLV-3 প্রকল্পে এবং IGMDP-তে কাজ করবার জন্যে কর্মীগোষ্ঠী তৈরি করতে আরম্ভ করি, তাঁরা দেখলেন তাঁদের সংস্থার বিবিধ উচ্চাভিলাষ পূরণের কাজে তাঁরাই সামনের সারিতে অবস্থিত, সকলের নজর তাঁদেরই ওপর, আক্রমণ এলে তাদেরই ওপর আসে। সাফল্যের গৌরবের অংশীদার সবাই হবেন, কিন্তু তার জন্যে তাঁদেরকেই কাজ করতে হবে অন্যদের অনুপাতে অনেক বেশি।

আমি জানতাম, বিভিন্ন কর্মীগোষ্ঠী গড়ে তাদের দিয়ে কাজ করাবার যে পদ্ধতি তাতে ফললাভ সম্ভব হবে না, সংস্থার দিক থেকে যদি তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা না দেওয়া হয়, তাহলে সে সব টিম অন্য পাঁচটা কর্মীগোষ্ঠীর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াবে, সে অবস্থায় তারা যে কাজ করবে তাতে তাদের সম্পর্কে যে উচ্চ প্রত্যাশা তা পূরণ করতে তারা ব্যর্থ হবে। বেশ কয়েকবার আমি দেখেছি, সংস্থাটি ভয় পেয়ে গেছে, বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে। টিম হিসাবে কাজ করার অনেক জটিলতা, অনেক অনিশ্চয়তা; সতর্ক না হলে তার ফাঁদে পা পড়ে যেতে পারে, কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

SLV-3 প্রকল্পের প্রথম দিকে প্রায়ই আমি দেখতাম, আপাতদৃষ্টিতে অগ্রগতি হচ্ছে না বলে মনে হওয়াতে উচ্চতর মহল বিচলিত হয়ে পড়ছেন, তখন আমাকে তাঁদের আশ্বস্ত করতে হত। অনেকের মনে হত SLV-3-র ওপর সংস্থার নিয়ন্ত্রণ নেই। কর্মীগোষ্ঠী নিজেদের খুশিমতো কাজ করে যাবে, তার ফলে গোলমাল হবে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যেত ওসব আশঙ্কা অবাস্তব। বিভিন্ন সংস্থায়, যেমন VSSC-তে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাবান ব্যক্তি এমন অনেক ছিলেন যাঁরা সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আমাদের টিম কতটা দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল সেটা বুঝতে পারতেন না। আমাদের কাজের একটা বড় অংশ ছিল এইসব প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলা করা, যে কাজে ড. ব্রহ্মপ্রকাশ ছিলেন অতিশয় দক্ষ।

AMARBOI.COM

কোনও প্রকল্পের জন্যে গঠিত টিম হিসাবে কাজ করবার সময়ে সাফল্যের মাপকাঠির ব্যাপারটি একটু জটিল হয়ে পড়ে। টিম যে কাজ করবে তার সম্পর্কে নানা ধরনের প্রত্যাশা থাকে, এবং বিবিধ প্রত্যাশাগুচ্ছের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতাও থাকে। তারপর, প্রায়ই এমন হয় যে, সংস্থার বাইরে যে সব সাব কনট্রাকটার থাকে এবং সংস্থার মধ্যেই যে সব বিশেষ বিশেষ কাজের বিভাগ থাকে, তাদের নানা প্রয়োজন, নানা বাধ্য-বাধকতার জন্যে ব্যবস্থা রাখতে গিয়ে

প্রকল্প কর্মীগোষ্ঠীগুলো সেই টানা-হেঁচড়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই হিমসিম খেয়ে যায়। সাফল্যের বিচারে কোন মানদণ্ড প্রয়োগ করা হবে, সে বিষয়ে কথা বার্তা যাঁদের সঙ্গে বলা দরকার, সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একটি ভাল প্রকল্প কর্মীগোষ্ঠী দ্রুত চিনে নিতে পারে। একজন টিম-লিডারের প্রধান একটি কর্তব্য সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রভাবিত করা, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো, যাতে নিজেদের যা যা প্রয়োজন তা পাওয়া যায়। এবং সে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত, পরিস্থিতির যেমন যেমন পরিবর্তন হয়, বা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাইরের লোকেরা একটি জিনিস খুবই অপছন্দ করেন, এমন কিছুর সম্মুখীন হওয়া যা তাঁরা প্রত্যাশা করেননি। ভাল কর্মীগোষ্ঠী তা হতে দেবে না।

SLV-3 টিম তাঁদের নিজেদের সাফল্যের পরিমাপ করবার মাপকাঠি নিজেরাই তৈরি করে নিলেন। আমাদের মান, প্রত্যাশা, লক্ষ্য আমরা নিজেরাই ব্যক্ত করলাম। আমাদের সফল হতে গেলে কী ঘটা দরকার, কী করে আমরা সাফল্যের পরিমাপ করব, তা ঠিক করবার আমাদের নিজেদের পদ্ধতি ছিল। যেমন ধরুন, আমাদের কাজ আমরা কীভাবে সম্পন্ন করব, কে কী কাজ করবেন, কোন মান অনুযায়ী কাজ করবেন, সময়-সীমা কী হবে, সংস্থার অন্যদের প্রতি কী রকম আচরণ করবেন?

একটি কর্মীগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাফল্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করা দুরূহ এবং তাতে বিশেষ কুশলতার প্রয়োজন, কারণ অনেক কিছু ঘটে, যা চোখে দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যপূরণের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি বারে বারে দেখেছি অনেকেই কী চান তা মুখ ফুটে ঠিকমতো বলতে পারেন না, যতক্ষণ না তাঁরা দেখেন কোনও একটি কর্মকেন্দ্রে এমন কাজ হচ্ছে যা তাঁরা চান না। বস্তুত কোনও প্রকল্প কর্মীগোষ্ঠীর সদস্যদের কাজ অনেকটা গোয়েন্দার কাজের মতো। প্রকল্প কীভাবে এগোচ্ছে তা জানবার জন্যে তাঁকে সূত্র খুঁজতে হবে, তারপর সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্র করে ভাল করে বুঝে নিতে হবে সেই প্রকল্পের জন্যে কী কী প্রয়োজন।

আরেকটি স্তরে, প্রকল্প কর্মীগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রের সম্পর্ক-স্থাপনে প্রকল্পের নেতাকে উৎসাহ দিতে হবে, সেই সম্পর্ককে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হবে। দু-পক্ষকেই পরিষ্কার বুঝতে হবে তাদের পরস্পর-নির্ভরতা, বুঝতে হবে তাদের ভাল-মন্দ সেই প্রকল্পের ভাল-মন্দের সঙ্গে যুক্ত। আবার আরও এক অন্য স্তরে, দুই পক্ষকেই একে অপরের সামর্থ্য বুঝতে হবে, কার কোথায় জোর, কোথায় দুর্বলতা জানতে হবে, যাতে পরিকল্পনা করা যায় কী করতে হবে, কীভাবে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। আসলে, সমস্ত ব্যাপারটিই ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানোর মতো। পরস্পর পরস্পরের কাছে কী প্রত্যাশা করে, সেটা জেনে তা নিয়ে মতৈক্য পৌঁছনো দরকার, অন্য পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা, বাধ্য-বাধকতার বাস্তবতা উপলব্ধি করা দরকার, সাফল্যের মাপকাঠি কী হবে তা পরস্পরকে জানানো দরকার, পারস্পরিক সম্পর্ক কীরকম ভাবে কার্যকর হবে তার কিছু সরল নিয়মকানুন থাকা দরকার। সর্বোপরি, প্রযুক্তিগত এবং ব্যক্তিগত, উভয় ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্পর্কে স্বচ্ছতা আনয়নের সেটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এর ফলে ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিতভাবে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা নির্মূল হয়। IGMDP-তে শিবথানু পিল্লাই এবং তাঁর টিম নিজেদের উদ্ভাবিত উপায়ে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু ভাল কাজ করেছিলেন! তাঁদের পদ্ধতিটির নাম, PACE, অর্থাৎ কর্মসূচির বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন (Programme Analysis, Control and Evaluation)। প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে একটার মধ্যে কোনও একটি কর্মকেন্দ্রের কোনও একটি প্রকল্প টিমের সঙ্গে তারা বসতেন তাঁদের দুরূহ সমস্যাগুলি নিয়ে এবং তাঁরা তাঁদের সমস্যার সমাধান করে সাফল্যের মাত্রাকে আরও উচ্চস্তরে তুলে নিয়ে যাওয়ার শক্তি দান করতেন। এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে কীভাবে সাফল্য আসবে এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যকে দেখতে পাওয়ার দৃষ্টিলাভ করা যাবে, সেইরকম প্রেরণাদায়ক পরিকল্পনা, আমি দেখেছি, সর্বদাই কর্মকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করে থাকে।

AMARBOI.COM

প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার ধারণা নিহিত বিকাশশীল ব্যবস্থাপনার আদর্শের ওপর—যা ষাটের দশকের প্রথমদিকে সমন্বয়-সাধন এবং উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনার কাঠামোর মধ্যেকার একটি বিরোধের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছিল। মূলত দু-ধরনের উৎপাদনমুখীনতা দেখা যায়: প্রথমটিকে বলা যায় ব্যবহার সংক্রান্ত, যা একটি আর্থিক-আনুকূল্যের ওপর ভিত্তি করে কর্মীর মূল্য নির্ধারণ করে; এবং দ্বিতীয়টি হল বিচার-বুদ্ধিসংক্রান্ত (rational) যা সাংগঠনিক কর্মীকে অনেক বেশি মূল্য দেয়। আমার মধ্যে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে ধারণার উদ্ভব হয়েছিল তা হল, একজন কর্মচারী, যে একজন প্রযুক্তি-বিশারদও বটে তাকে ঘিরে। যেখানে ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজের স্বীকৃতি জানায় এবং বিচারবুদ্ধি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা—তাদের যে নির্ভরতা তাকে স্বীকার করে নেয়, সেখানে আমি গুরুত্ব দিয়েছি তাদের আন্তঃনির্ভরতা—অর্থাৎ একই সঙ্গে একের অপরের ওপর নির্ভরতার ওপর। ব্যবহার-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপক যেখানে স্বাধীন-উদ্যোগের ক্ষেত্রে একেবারে শীর্ষে এবং যুক্তিবুদ্ধি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে থাকে সহযোগিতার ওপর, সেখানে আমি পক্ষ নিয়েছি যৌথ-উদ্যোগের আন্তঃনির্ভরতার ওপর যেমন সমগ্র শক্তিকে সম্মিলিত করা, মানুষ, সম্পদ, সম্পদ-নির্ধারণ, ব্যয়ভার এবং আরও অন্যান্য জিনিসের আন্তঃ-সম্পর্কের বিষয়ও একত্র করে বিস্তার ঘটিয়েছি।

আব্রাহাম মাস্‌লোই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ধারণাগত স্তরে আত্ম-প্রত্যয়ের নতুন মানসিকতার সপক্ষে প্রচার করেছেন। ইউরোপে রুডলফ স্টেইনার ও রেগ রেভালস এই ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে শেখা ও সাংগঠনিক নবীকরণের মাধ্যমে। ইঙ্গ-জার্মান ব্যবস্থাপক-দার্শনিক ফ্রিট্‌জ শুমাখার বৌদ্ধ-অর্থনীতির ধারণাকে তুলে নিয়ে এসেছেন এবং "ক্ষুদ্রই সুন্দর"-এর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধী জোর দিয়েছিলেন তৃণমূল স্তরের প্রযুক্তির ওপর এবং ক্রেতাকে সমগ্র ব্যবসায়িক ক্রিয়াকর্মের কেন্দ্রে স্থাপন করেছিলেন। জে. আর. ডি. টাটা প্রগতি-চালিত পরিকাঠামোর ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা এবং অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই শুরু করেছিলেন আরও বড় একটি বিষয়: প্রযুক্তিভিত্তিক পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ কর্মসূচি। এর জন্যে তাঁরা নির্বিচারে জোর দিয়েছিলেন সামগ্রিকতা ও প্রবাহের প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর। ড. ভাবা ও অধ্যাপক সারাভাইয়ের উন্নয়নমূলক দর্শনকে আরও উন্নততর করতে ড. এম. এস. স্বামীনাথন, ভারতে একতার জন্য আর এক প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর যে কাজটি করেছেন, তা হল সবুজ বিপ্লবের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো। ড. কুরিয়ান ভার্গিস দুগ্ধজাত শিল্পে বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে তুলে ধরেছেন এক শক্তিশালী সমবায় আন্দোলনের রূপরেখা। মহাকাশ গবেষণায় অভিযান-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান।

ড. ব্রহ্মপ্রকাশের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চ-প্রযুক্তি স্থাপন করার কাজের মাধ্যমে আমি IGMDP-তে অধ্যাপক সারাভাইয়ের দূরদৃষ্টি ও অধ্যাপক ধাওয়ানের লক্ষ্যকে একাত্মীভূতকরণের চেষ্টা করেছি। সম্পূর্ণভাবে দেশজ ধরনের প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে ভারতীয় দূর-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিকে রূপ দিতে আমি 'সুপ্ততার প্রাকৃতিক নিয়ম'-কে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়েছি। আরও স্পষ্ট করে আমার ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে এবার আমি একটু উপমার আশ্রয় নেব।

প্রয়োজন, নবীকরণ, আন্তঃনির্ভরতা এবং প্রাকৃতিক প্রবাহের প্রবল আত্মপ্রত্যয় যখন থাকে একমাত্র তখনই প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার বৃক্ষটি শিকড় গেড়ে বসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। বৃদ্ধির ধারা হল বিবর্তন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত, যার অর্থ হল এই যে, ধীরগতির পরিবর্তন ও হঠাৎ রূপান্তরকরণের সম্মিলনে কোনও বস্তু গতি লাভ করে। প্রতিটি রূপান্তরকরণের কারণ একটি সম্পূর্ণ নতুন, আরও জটিল কোনও স্তরে পদক্ষেপ ফেলা অথবা তুলনায় আগের স্তরের সঙ্গে একটি বিধ্বংসী সংঘর্ষের ফল; প্রভাব বিস্তারকারী আদর্শ সাফল্যের একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠতে পারে যখন তারা অসুবিধার মধ্যে পড়ে; এবং এর ফলে পরিবর্তনের হারে সর্বদাই গতি বৃদ্ধি হয়।

এই বৃক্ষের কাণ্ডটি হল আণবিক কাঠামো যার মধ্যে সমস্ত ক্রিয়াই গঠনমূলক, সমস্ত নীতিই আদর্শমূলক এবং সমস্ত সিদ্ধান্তই একাত্মমূলক। এই গাছের সমস্ত শাখা-প্রশাখা হল সম্পদ, সম্পত্তি, ক্রিয়াকর্ম ও উৎপাদ—যাকে ধারাবাহিক কর্মদক্ষতার বিবর্তন এবং ত্রুটি শুধরে আধুনিক করে তোলার মাধ্যমে কাণ্ড পরিচর্যা করে থাকে।

যদি সতর্কতার সঙ্গে এই প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার গাছটির প্রতি যত্নবান হওয়া যায় তাহলে এই বৃক্ষে উপযোগী পরিকাঠামোর যে ফল ধারণ করে তাকে বলা যায়: প্রতিষ্ঠানটিকে শক্তিবৃদ্ধি করার প্রযুক্তি, মানুষের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার শক্তিবৃদ্ধি, এবং সবশেষে জাতীয় স্বনির্ভরতা এবং দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি।

১৯৮৩-তে যখন IGMPD মঞ্জুর করা হয়েছিল সে-সময় পর্যাপ্ত প্রযুক্তির ভিত্তি আমাদের ছিল না। অল্প কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা ছিল, কিন্তু ওই বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করার মতো সক্ষমতার অধিকারীও আমরা ছিলাম না। কর্মকেন্দ্রের বহু প্রকল্প বিশিষ্ট পরিবেশ, পাঁচটি উন্নততর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা একযোগে বিকাশ ঘটানোর একটা চ্যালেঞ্জের সামনে আমাদের ফেলে দিয়েছিল। এর ফলে আমাদের নজর দিতে হল সম্পদের সূক্ষ্ম ভাগাভাগি, অগ্রাধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমশক্তির উন্নততর প্রগতিমূলক ফল উৎপাদনের দিকে। ঘটনাক্রমে IGMDP-র ছিল ৭৮টি অংশীদার যার অন্তর্গত ৩৬টি প্রযুক্তি কেন্দ্র ও ৪১টি উৎপাদন কেন্দ্র। যাদের মধ্যে আবার ছড়িয়ে ছিল সরকারি অধিগৃহীত সংস্থা, অস্ত্র কারখানা, ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ, এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতি, এছাড়াও ছিল একটি ঠাসবুনোট সরকারি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। যতটা সম্ভব প্রযুক্তির উপকরণ সরবরাহ করে কর্মকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় আমরা একটা আদর্শ নমুনা বিকাশের প্রয়াস নিলাম যেটি আমাদের নিজস্ব-নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও তা তৈরির যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্ভুল, চালু কথায় যাকে বলা যায় একেবারে মাপে মাপ। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেইসব ধারণা ধার করে নিয়ে এসেছি যা অন্যত্র বিকশিত হয়েছে, তবে সেই ধারণাকে আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমার এবং আমাদের জানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যে কাজ করতে বাধ্য ছিলাম, সেই পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে কাজে লাগাতে পেরেছিলাম। সর্বোপরি, যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এটাই প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিল যে, কী বিপুল পরিমাণ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা আমাদের গবেষণা ল্যাবরেটরিতে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যক্তিগত শিল্পে লুকিয়ে ছিল।

IGMDP-র প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার দর্শন শুধু ক্ষেপণাস্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সাফল্যের জন্যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এবং শুধু পেশীশক্তি বা আর্থিক শক্তির নির্দেশেই যাতে ভবিষ্যৎ-বিশ্ব আর চালিত না হয় সে-বিষয়ে সতর্কতার প্রকাশ এই প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা। বস্তুত প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমেই প্রবাহিত হয় এই পেশীশক্তি ও আর্থিক শক্তি। যে জাতি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন করেছে একমাত্র তারাই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতাকে ভোগ করার অধিকারী। প্রযুক্তি একমাত্র প্রযুক্তিকেই সম্মান করে। এবং যা আমি শুরুতেই বলেছিলাম, প্রযুক্তি হল একটি যৌথ ক্রিয়া, তা ঠিক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মতো নয়। এটি ব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তার ওপর বেড়ে ওঠে না, বরং ওই বুদ্ধিমত্তা একে অপরের ওপর প্রতিক্রিয়া করে এবং নির্বিচারে তার মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর ঠিক এই কাজটিই আমি IGMDP-তে করার চেষ্টা করেছিলাম: ৭৮টি শক্তিশালী ভারতীয় "পরিবার"-কে নিয়ে—যারা নির্মাণ করেছিল একটি সম্পূর্ণ দেশজ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা।

বিজ্ঞানীদের জীবন এবং তাঁদের কাল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অনেক হয়েছে, কিন্তু তাঁদের জীবনের লক্ষ্য কী ছিল, কোথায় তাঁরা উপনীত হতে চেয়েছিলেন, সেখানে কী করে তাঁরা পৌঁছলেন, তা নিয়ে অনুসন্ধান বিশেষ হয়নি। যে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আমি, আমি হয়েছি তার ইতিহাস আপনাদের কাছে বিবৃত করে, আমি সেই যাত্রার প্রকৃত স্বরূপটি আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমার আশা, আমাদের সমাজের যে কর্তৃত্বপরায়ণতা তার সামনে উঠে দাঁড়াবার জন্যে অধিকতর ক্ষমতা অন্তত কয়েকজন তরুণ-তরুণী এই কাহিনী পড়ে লাভ করবে। এই সামাজিক কর্তৃত্বপরায়ণতার একটি দিক হল মানুষকে অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পদোন্নতি, নিজের জীবনযাত্রার দ্বারা অন্যদের কাছ থেকে খাতির পাওয়া, সাড়ম্বরে সম্মানলাভ, নানা ধরনের "স্টেটাস সিম্বল" লাভ, ইত্যাদির দিকে আকৃষ্ট করা।

এইসব লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে তাদেরকে নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আদবকায়দা শিখতে হয়। আজকের যুব সম্প্রদায়কে এই জীবন যাত্রার প্রণালী ভুলতে হবে, এতে কাম্যবস্তু লাভ হয় না। এইসব স্থূল, বাহ্যিক সম্মান, সাফল্যের জন্যে কাজ করার যে সংস্কৃতি, তাকে ত্যাগ করতে হবে। এইসব ধনবান, ক্ষমতাবান, বিদ্বান ব্যক্তিদের আমি যখন দেখি একটু শান্তির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আমার মনে পড়ে যায় আহমেদ জালালুদ্দিন, ইয়াদুরাই সলোমনের মতো মানুষদের কথা। পার্থিব ধনসম্পদ বলতে প্রায় কিছুই তাঁদের ছিল না, কিন্তু তারা কত সুখী ছিলেন।

করোমন্ডল উপকূলে, যেখানে সমুদ্র
শঙ্খ ধ্বনিত হয়, বালুকার মধ্যে
থাকতেন কয়েকটি প্রকৃতই
উন্নত মানবাত্মা। একটি সুতির লুঙ্গি,
আধখানা মোমবাতি, একটি পুরনো
হাতলবিহীন জগ, এই ছিল বালুতটের
সেই রাজাদের সম্বল।

AMARBOI.COM

অসময়ের জন্যে কোনও সঞ্চয় তাঁদের ছিল না, জীবিকার অন্য কোনও সংস্থান ছিল না, তবু তাঁরা অত নিশ্চিন্ত কী করে থাকতেন? আমার বিশ্বাস তাঁরা বেঁচে থাকার অবলম্বন পেতেন ভিতর থেকে। তাঁরা বেশি ভরসা করতেন ভিতর থেকে যে সংকেত আসত তার ওপর, বাইরে থেকে আসা বার্তার ওপর নয়। আপনারা কি মনের ভিতর থেকে আসা সংকেতের কথা জানেন? তার ওপর ভরসা করেন? নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু কি আপনি নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন? আমার কথা বিশ্বাস করুন, বাইরের চাপ শুধু আপনাকে তার নিজের মতলব মতো চালাবে, কাজ করতে দেবে না। তাকে আপনি যত পরিহার করবেন, তাকে অগ্রাহ্য করে কর্তব্য নিবারণ করবেন, তত ভাল হবে আপনার জীবন। জাতিও উপকৃত হবে সে-রকম নেতাদের পেলে, যাঁরা সফল, যাঁরা অন্তর থেকে আগত নির্দেশ মেনে চলেন। যে নাগরিকবৃন্দ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, যে দেশে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে নিজেদেরকে জানে, নিজেদের ওপর ভরসা করে, তাদেরকে কোনও কায়েমী স্বার্থ, কোনও অবিবেকী কর্তৃপক্ষ যে নিজেদের মতলব মতো ব্যবহার করবে, তার সম্ভাবনা খুবই কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অন্তরে নিহিত শক্তি যদি মানুষ ব্যবহার করে, তাই দিয়ে নিজের জীবনকে, নিজের কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, তাতে সাফল্য আসে। কোনও কাজ যখন একজন তার নিজস্ব অবস্থানে দাঁড়িয়ে হাতে নেয়, সেই-ই একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর আপনাকে, আমাকে, সবাইকে স্বাধীন করে এই গ্রহে পাঠিয়েছেন, আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত সৃজনীশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করে তুলবার জন্যে। কে কোন্ পথ বেছে নেবে, কোন্ পথে নিজের নিয়তির বিধান পূর্ণ করবে, সে-বিষয়ে প্রত্যেকে অন্যদের থেকে পৃথক। জীবনের খেলা সহজ নয়। সে খেলায় জিততে হলে ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত যে অধিকার তাকে খোয়ালে চলবে না। এবং সে অধিকার বজায় রাখতে গেলে, অন্যদের দিক থেকে যে চাপ আসবে তারা যেভাবে চায় সেভাবে কাজ করবার জন্যে, তাকে অগ্রাহ্য করবার জন্যে প্রয়োজন হলে সামাজিক জীবনে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিব সুব্রহ্মণম আয়ার যে তাঁর রান্নাঘরে বসে আমাকে আহার করতে নিমন্ত্রণ করলেন, আমার বোন জোহ্‌রা যে তার বালা, তার গলার হার বাঁধা দিল আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করাবার জন্যে, অধ্যাপক স্পনডার যে আমাকে বললেন, গ্রুপ ফোটো তোলবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে সামনের সারিতে বসতেই হবে, এসবকে আপনি কী বলবেন? মোটর গ্যারেজের মধ্যে হোভারক্রাফট্ নির্মাণ? সুধাকরের সাইস? ড. ব্রহ্মপ্রকাশের সমর্থন? নারায়ণনের ব্যবস্থাপনা? ভেঙ্কটরমনের ভবিষ্যৎদৃষ্টি? অরুণাচলমের কর্মোদ্যোগ? এর প্রত্যেকটি অন্তর্নিহিত শক্তি ও উদ্যোগের নিদর্শন। আড়াই হাজার বছর আগে পিথাগোরাস বলে গেছেন, "সবার ওপরে নিজেকে সম্মান করো।"

আমি দার্শনিক নই, প্রযুক্তিবিদ মাত্র। সারা জীবন আমি রকেট-বিজ্ঞানের চর্চা করে কাটিয়েছি। কিন্তু বিভিন্ন সংস্থায় নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে কাজ করার দরুন, পেশাগত জীবনের জটিলতা উপলব্ধি করবার আমার সুযোগ হয়েছে। এ পর্যন্ত যা বলেছি তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আমার যা হচ্ছে, আমার বক্তব্যগুলো এমনভাবে আমি ব্যক্ত করেছি যাতে মনে হতে পারে সে সব অভ্রান্ত বেদবাক্য। আসলে কিন্তু সেগুলি আমার নিজের পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আমার সহকর্মী, সহযোগী, নেতা, আমার জীবন-রূপ নাটকের যাঁরা ছিলেন প্রকৃত নায়ক, তাঁদের কথা, জটিল রকেট-বিজ্ঞানের কথা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ সবই আমি এমনভাবে লিখেছি, যেন আমি যা বলছি তার সবই শাস্ত্রের বচন। আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, যার স্থান-কাল আলাদা আলাদা ছিল, পটভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৯৯ ~ www.amarboi.com ~

আলাদা-আলাদা ছিল, সবই এসেছে এক সঙ্গে, দল বেঁধে।

উড়োজাহাজ থেকে নীচের দিকে তাকালে মানুষজন, ঘরবাড়ি, পর্বত-প্রান্তর, গাছ-পালা সবই মনে হয় একাকার। একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা কঠিন। আপনারা সদ্য যা পড়লেন, সেও অনেক দূর থেকে দেখা আমার জীবনের একটা মোটামুটি ধারণা।

আমার মধ্যে যা কিছু ভাল তা ওই দ্বিধা সন্দেহ—
তাঁর গুণ—আমার সমস্ত ভয়,
তবু তার সঙ্গে তুলনায় আমার যা কিছু গুণ নজরে পড়ে।

"অগ্নি"-র প্রথম উৎক্ষেপণে এসে এ কাহিনীর সমাপ্তি। জীবন এগিয়ে যাবে। এই মহান দেশ সব ক্ষেত্রে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যাবে, যদি আমরা ৯০ কোটি মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে চিন্তা করতে পারি। আমার কাহিনী, জয়নুলআবেদিন, যিনি রামেশ্বরম দ্বীপের মস্ক স্ট্রিটে একশ-রও বেশি বছর জীবন ধারণ করে সেখানেই মারা যান, তাঁর পুত্রের কাহিনী; যে ছাত্রকে শিবসুব্রহ্মণম আয়ার এবং ইয়াদুরাই সলোমন বড় করে তুলেছিলেন, পান্ডালাইয়ের মতো শিক্ষকেরা শিক্ষা দান করেছেন, তার কাহিনী; একজন ইঞ্জিনিয়ার যাকে এম. জি. কে. মেনন বেছে নিয়েছিলেন, প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক সারাভাই তৈরি করেছিলেন, তার পরীক্ষা করবার জন্যে জীবনে ব্যর্থতা এসেছে পিছিয়ে পড়া এসেছে, তার কাহিনী; একজন নেতা, যাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন একদল অতি উজ্জ্বল, নিজের নিজের পেশায় আত্মনিয়োজিত একদল মানুষ, তার কাহিনী। আমার সঙ্গে সঙ্গেই এই কাহিনীর সমাপ্তি, কেন না পার্থিব অর্থে আমি কোনও উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি না। আমি কিছু সংগ্রহ করিনি, দালান-কোঠা বানাইনি, নিজের বলতে কিছুই নেই—না পরিবার, না পুত্র-কন্যা।

এই মহান দেশে আমি একটি কূপ
তাকিয়ে আছি দেশের অগণিত ছেলেমেয়েদের দিকে,
যারা আমার থেকে আহরণ করবে
অফুরন্ত দৈব করুণা,
সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে তাঁর করুণা,
যেমন ছড়িয়ে যায় কূপের জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অন্যদের কাছে নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরতে চাই না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কয়েকজন মানুষ অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন, জীবনে যে আনন্দ একমাত্র চিত্তের উপলব্ধি থেকে লাভ করা যায়, সেই চরম আনন্দের মূল্য বুঝতে পারবেন। বিধাতার বিধানই একমাত্র উত্তরাধিকার। আমার বৃদ্ধ-পিতামহ আবুল, আমার পিতামহ পাকির, আমার পিতা জয়নুলআবেদিন হয়ে বংশের যে ধারা চলে আসছে, হয়তো আবদুল কালামে এসে সে ধারা লুপ্ত হবে, কিন্তু তাঁর করুণা কোনওদিন লুপ্ত হবে না, কারণ তা চিরন্তন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

ভারতের প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান SLV-3, এবং "অগ্নি", এই যে দুই প্রকল্প, যার সঙ্গে আমি গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম, এই বইটির সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি নিবিড়। সেই কাজের সূত্রেই আমি ১৯৯৮ সালের মে মাসের পারমাণবিক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। মহাকাশ, প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং পারমাণবিক শক্তি, এই তিনটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ এবং সম্মান আমি লাভ করেছিলাম। ওই সব সংস্থায় কাজ করবার সময়ে আমি দেখেছিলাম, সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ এবং সর্বাপেক্ষা উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্কের আমাদের দেশে অভাব নেই। তিনটি জায়গাতেই আমি দেখেছি, কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থতা এলে তাতে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা ভয় পেতেন না। ব্যর্থতার মধ্যেই নিহিত থাকত ভবিষ্যতের অধিকতর শিক্ষার বীজ, যার ফলে পাওয়া যেত উন্নততর প্রযুক্তি এবং উচ্চতর স্তরের সাফল্য। এইসব মানুষেরা স্বপ্নদর্শী ছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় নানা মহান কীর্তি। আমার বোধ হয়, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থার সম্মিলিত প্রযুক্তিগত শক্তি, উন্নত দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিগত শক্তির সমকক্ষ। সর্বোপরি, দেশের মহত্তম স্বপ্নদর্শী মানুষদের, অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই, অধ্যাপক সতীশ ধাওয়ান, ড. ব্রহ্মপ্রকাশের সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাঁরা সবাই আমার জীবনকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

একটি জাতির উন্নতির জন্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা, দুই-ই প্রয়োজন। আমাদের *Self Reliance Mission in Defence System 1995-2005*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক বাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দান করবে। *Technology Vision—2020* পরিকল্পনা জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তুত করবে। এই দুটি পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে আমাদের জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমার আন্তরিক আশা এই দুটি পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ করবে, "উন্নত" দেশে পরিণত করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~